কাব্যজীবন : কবিতা সংকলন-গ্রন্থ

সম্পাদক

শান্তনু দাস · রুদ্রেন্দু সরকার

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

ভূমিকা

বর্তমান কালের বাঙালী কবিদের স্বনির্বাচিত কবিতার এই সংকলন-গ্রন্থের পরিকল্পনা দেখে বেশ ভালো লাগলো। এ পরিকল্পনা অভিনব। বইখানি হাতে পেয়ে আমার ভালোই লেগেছে। আমাদের আজকালকার কবি আর কবিতার সম্বন্ধে নোতুন অনেক কথা, যা আমার জানা ছিল না, তা জানতে পেরেছি। বইখানির দ্বারা উপকৃত হয়েছি। সেইজন্য আমার কয়েকজন মিত্রের সনির্বন্ধ অনুরোধে বইখানির উপযোগিতা সম্বন্ধে লিখতে রাজী হয়েছি। রাজী হয়েছি, কিন্তু একটু ভয়ে-ভয়ে। আমি চিরদিনই ভাষাতত্ত্বের 'কচ্চায়ন' নিয়েই ব্যাপৃত, সাহিত্যের চর্চা আমার ধাতে সয়নি—উপর-উপর যেটুকু পড়া-শুনা করেছি, আর সাহিত্য থেকে যেটুকু আনন্দ পেয়েছি, তা নিয়ে, সুসাহিত্যিকদের (বিশেষ ক'রে সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের) মজলিসে অন্তরঙ্গভাবে যোগ দেবার শক্তি আর অধিকার আমার আছে ব'লে মনে করি না। বিশেষভাবে কবিতার ক্ষেত্রে। কবিতা, বিশেষতঃ আধুনিক আর অতি-আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে—প্রতীকবাদ, ছায়াবাদ, প্রগতি-বাদ, বস্তুবাদ, সমাজবাদ, শান্তিপন্থী অথবা নরহত্যাপন্থী, বিপ্লববাদ, হেঁয়ালীবাদ, দেহধর্মবাদ, স্মরতাবাদ, যৌনবাদ, অসংযমবাদ, উদ্দামতাবাদ, সহজিয়াবাদ, মরমিয়াবাদ, ভাঙ্গানিয়াবাদ, দলস্বার্থবাদ ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি প্রকটিত, ধ্বনিত অথবা অপ্রকটিত মতবাদের চাপে, বহুস্থলে কবিতার সহজ গুণ, তার ছন্দোময় সুষমাময় সুভাষিত সুবোধ্য রসাত্মকতা, যা মানবচিত্তের মধ্যে নিহিত নিখিল রসের অনুভূতির আনন্দ পাঠক বা শ্রোতার কাছে এনে দেয়—তাকে ক্ষুণ্ণ ক'রে দেয়—আজকালকার বহু কবিতায় সে আনন্দ পাওয়া যায় না। অন্ততঃ আমি পাই না। "সর্বং বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ" বলে বাণভট্টের বিশ্বন্ধর বর্ণনা-শক্তির প্রশস্তি করা হয়েছে। অনুরূপ কথা শেকস্পিয়র, গ্যোটে প্রমুখ বিশ্বকবির সম্বন্ধেও বলা হয়েছে। আমার কাছে, কাব্য আর সৎ চিন্তার ক্ষেত্রে "সর্বং রবীন্দ্রোচ্ছিষ্টং জগৎ"—কবিতায় বিশেষতঃ, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া প্রায় আর কাউকেই ভালো লাগে না। বহুশত বৎসর ধ'রে যে সাহিত্য বিশ্বের প্রায় সব দেশের সব শ্রেণীর সমস্ত বিভিন্ন রুচির মানুষের প্রজ্ঞাচিত্তের আর আনন্দানুভূতির পক্ষে রসায়ন-স্বরূপ হ'য়ে আছে, বাস্তবের বাইরে অতীন্দ্রিয় জগতের আভাস এনে দিয়েছে, সেই সব জ্ঞাতনামা বা অজ্ঞাতনামা যুগন্ধর কবির

আর অন্য লেখকের রচনাতেই প্রধানতঃ কাব্যামৃত-রসাস্বাদ ক'রে থাকি। দু-চারজন বিশিষ্ট, চিন্তাশীল, জীবনবেদের আলোক-অনুভবী, সত্যদ্রষ্টা, কবি-মনীষী ভিন্ন, আর সকলের লেখা যেন ফিকা লাগে—গাঢ়তা, গভীরতা, অন্তরাত্মাকে নাড়া দেবার শক্তি তাতে যেন পাই না। যেমন পাই বেদ উপনিষদের মহাভারতের মধ্যে, হোমর আর গ্রীক ট্রাজিক কবিদের হিব্রু বাইবেলের, শেকস্পিয়র, গ্যোটের কবিতাময় জ্ঞানময় রুচিময় সূক্তিতে, যেমন পাই রবীন্দ্র-নাথের জীবনদর্শনে আর সদ্‌বস্তুর অনুভূতির মধ্যে, আর কিছুটা কবীর, শেলি, কীট্‌স্‌, সুইন্‌বার্ন্‌ প্রভৃতি অল্প কয়েকজনের কবিতায়। এটা হ'ল আমার নিজের ব্যক্তিগত শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, ভাবপ্রবণতা, চিন্তা, আর সর্বোপরি রুচির কথা।

কিন্তু তা ব'লে আধুনিক কবিতা, আধুনিক লেখকদের রচনা—এ সবকে "ন-স্যাৎ" ক'রে উড়িয়ে দিতে পারি না। যদিও সব ক্ষেত্রে ভারতের প্রাচীন ঋষিদের মত, গ্রীক কবিদের মত, ইহুদী ভাববাদীদের মত, শেকস্পিয়রের মত, রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট্‌ ভূমাস্পর্শী কল্পনা বা অভিজ্ঞতা এঁদের মধ্যে দুর্লভ —তবুও একথা মানতেই হবে, এঁরা "আধুনিক", এঁদের পিছনে আছে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্বজ আর পথিকৃৎদের অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি ধ্যান-ধারণা চিন্তা-বিচার, যার একটা বিশ্বজনীনতা একটা চিরন্তনতা আছে ব'লেই মনে করি। আর এই চিরন্তনতা, এই শাশ্বত মূল্য সম্বন্ধে একটা সাম্প্রতিক তথাকথিত "অনীহা",—কেবল পঞ্চভূতনির্মিত দেহকেই আঁকড়ে থাকে আর তার বাইরের কোন কিছুর সম্বন্ধে উদাসীন অথবা অবজ্ঞাপূর্ণ, উপরন্তু যাঁরা আধুনিক কালের নানা মানসিক অস্থিরতার প্রকাশকে সাহিত্যক্ষেত্রে দেখে সেইটাকেই আধুনিক সাহিত্যের প্রাণবস্তু ভেবে, চিরন্তনকে ত্যাগ ক'রে বা অস্বীকার ক'রে নিজেদেরই বিড়ম্বিত ক'রছেন, যাঁদের দৃষ্টি বা মনন এই ধরনের, তাঁদের মধ্যেই সীমিত। মানব-সমাজের ক্ষণিকের রীতিনীতি ধন-সম্পদ্‌, উদ্দাম উদ্দেশ্যহীন "প্রগতি" আর সুখদুঃখের মধ্যেই বিশ্ব-প্রপঞ্চের গতিরেখা নিহিত,—তার বাইরে স্থিতিশীল বা গতিশীল আর কিছুই নেই, একথা কি ক'রে বলি? গোঁড়া নাস্তিকতা, আর গোঁড়া যুক্তিহীন শাস্ত্রনিবদ্ধ আস্তিকতা—এই দুইয়ের মাঝে, জিজ্ঞাসার দ্বারা আলোকিত, আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রদীপ্ত যে অজ্ঞেয়বাদিতা আছে, সেটিই হ'চ্ছে জিজ্ঞাসু মানুষের পক্ষে একমাত্র পথ;—অন্তত যতদিন না তার নিজের কাছে সমস্ত সংশয়চ্ছেদী আর অপরের বোধ-বিচারের অগম্য কোনও উপলব্ধি বা অনুভূতি আস্‌ছে।

যাই হোক্‌, রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর মতন প্রাচীন আর আধুনিক মনীষী কবি,

উপস্থিত অবস্থায়, আমার পক্ষে সব-চেয়ে মনোজ্ঞ, তৃপ্তিপ্রদ। কিন্তু সমস্ত মানব-সন্তানের সমবায়ে গঠিত বিশ্বমানব তো সৃষ্টির আদিযুগ থেকেই পূর্ণতা পেয়ে আস্‌ছে, সে ক্রমাগত ফুটেই চলেছে, "ফুটি-ফুটি ও তার ফোটার না হয় শেষ"; মানবের শক্তিসাধনার অন্ত কোথায়, তার ভিতরের উদ্দেশ্যই বা কি, কেউ তো ব'লতে পারে নি, পারে না, পারবেও না। সেই জন্য অনাগত কালে, যে কাল এখন থেকে শুরু হয়েছে ব'লতে হয়, কাব্যময় আত্মপ্রকাশ আরও কোন্ উচ্চতর স্তরে উঠবে তা কে ব'লবে? কোনও একজন মহাপুরুষ বা বিরাট্ মনীষী বা মহামানব বা পূর্ণ-মানবেই দাঁড়ি টানা যায় না। সুতরাং এ বিষয়ে বেশী কিছু না ব'লে, যদি মানুষ তার অতি-প্রজনন, আর উদ্দেশ্যময় হৃদয়হীন নিষ্করুণ কর্তাদের সৃষ্ট তার মূর্খতা আর অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে নোতুন ধরনের ক্রীতদাস ক'রে ফেলা—এই দুই অভিশাপ থেকে সে বেঁচে উঠতে পারে, তা হ'লেই তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল; তার আর সমস্ত কৃতিত্বের মধ্যে বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য শিল্প আর কবিতাও। "বাঙলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান" প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুশীল রায় তাঁর মন্তব্যে যে কথা ব'লেছেন—সেটি অতি খাঁটি কথা—"চিরকালই একটি ক'রে আধুনিক কাল থাকে; সেই কালের সেই লেখা সেই কালে চিরকালই আধুনিক।" কিন্তু শুধু তাই নয়। যদি সেই "আধুনিক" কালের কবিতাতে সার বস্তু, সত্য বস্তু কিছু থাকে, তা হ'লেই তো তা হবে চিরকালের আধুনিক, চিরন্তন। আস্তিকতা-নাস্তিকতা, কমিউনিস্ট-বুর্ঝোয়া, শ্লীল-অশ্লীল, ভব্য-অভব্য প্রভৃতি ক্ষুদ্র ভেদ-বিভেদের পার্থক্যকে অতিক্রম করে মানব-চিত্তের শ্রেষ্ঠ রস-সর্জনারূপে বিরাজ ক'রবে। তার নির্বৈয়ক্তিক সত্য মূল্যায়ন হবে মহাকালের হাতে। আজ যা আধুনিক আর প্রগতিশীল হ'য়ে দেখা দিচ্ছে, আগামী কাল তা পুরাতন আর প্রতিক্রিয়াশীল হ'য়ে প'ড়বে,—মানুষের মন আর সমাজের গতি এত তাড়াতাড়ি বদলাচ্ছে। এই আধুনিক কালের মধ্যেই আমরা র'য়েছি, এই হেতু এর সম্বন্ধে চরম-বিচার, সাহিত্য আদালতের ডিক্রি-ডিসমিস ক'রে মত্ দেওয়া, আমাদের শক্তির বাইরে। আধুনিক বাঙলা কবিতা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা হবে। শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু স্পষ্ট ভাষায় যা বলেছেন আমিও তার সঙ্গে একমত—মহাকালের দরবারে ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াবে আমরা তার কি জানি? অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা, স্বাধীন চিন্তার আর দর্শনের শক্তি, এইসব পারিপার্শ্বিকের উপরই অতীতের মতই বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

বইখানির পরিকল্পনা যে ভাবে করা হ'য়েছে—কবিদেরই কাছ থেকে তাঁদের

কবিতার উদ্দেশ্য আর সার্থকতা, তাঁদের আঙ্গিক আর ভাবের ভিতরের কথা সম্বন্ধে মন্তব্য চাওয়া হ'য়েছে,—তাতে তাঁদের চিন্তার, প্রসার, পরিধি, আর গভীরতা কিছুটা অনুধাবন করা যাবে। তাঁদের কেউ-কেউ বিশেষ বাচংযমতা দেখিয়েছেন (মনে হয় যেন একটু এড়িয়েই গিয়েছেন)। সব সময়ে আমাদের মতন অবসরহীন মানুষের পক্ষে, ইচ্ছা থাকলেও, ভালো জিনিস দেখবার সময়-সুযোগ হয় না। এই প্রামাণ্য গ্রন্থটির সাহায্যে তবুও আধুনিক বাঙলাদেশের—পশ্চিম এবং পূর্ববাঙলার ৬৬ জন নামী কবির নিজের নিজের বাছা তাঁদের কবিতা পড়বার সুবিধা হ'চ্ছে—তাঁদের মন্তব্য থেকে, আর এই কবিতা-চয়ন থেকে, তাদের বিচার-বিবেচনার থেকে বেশ কিছুটা হদিস ধ'রতে পারা যাবে। সেই জন্য সংকলন-কর্তাদের ধন্যবাদ দিই, আর আশা করি, জিজ্ঞাসু আর কাব্য-রসিক মহলে এই বইয়ের যোগ্য সমাদর হবে॥

"সুধর্মা"
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭০

গ্রন্থনা

সাম্প্রতিক কবিতার রাজ্যে আমার প্রবেশাধিকার খুব স্বচ্ছন্দ নয়, কবিদের সঙ্গে পরিচয়ও নৈমিত্তিক। তবে সাময়িকপত্রে বা সংকলনগ্রন্থে অকস্মাৎ এক-একটি কবিতা মনকে আকর্ষণ করেছে। কোনোটা গভীর প্রত্যয়ে মুক্তা-বিন্দুর মতো ঝলমল করে উঠেছে; কোনোটা শব্দঝঙ্কারে কানকে তো তৃপ্ত করেইছে, অন্তরকেও অনুরণিত করেছে। কোনো সময়ে একটি আপাত-অকিঞ্চিৎকর কবিতার এক একটি উদ্বেল পংক্তি তরঙ্গের মতো হৃদয়ের তটভূমিকে অভিষিক্ত করেছে। বুঝতে পেরেছি, সাম্প্রতিক বাংলাকাব্যের জগৎ দিক্‌পাল পরিবৃত না হলেও, নিষ্ঠাবান্‌ কবিকুলে সমাকীর্ণ। সৃষ্টির পরিমাণগত বিচারে ক্ষুদ্র হলেও এক একজন কবি মাঝে মাঝে প্রতীতির গভীরতম প্রদেশকে স্পর্শ করেছেন।

সাম্প্রতিক কবিতা সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং সাময়িক ভালো লাগা নিয়ে বেশ পরিতৃপ্ত হয়েই ছিলাম। এমন সময় বয়সের ব্যবধান ডিঙিয়ে এই কবিযুগলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল। তাঁদের মনে অনেক আকাঙ্ক্ষা, চোখে অনেক স্বপ্ন। একটি আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেবার প্রচেষ্টায় তাঁরাই আমাকে শরিক করে নিয়েছেন। তাঁদের হয়ে তাঁদের কথাটা আমাকে বলবার ভার দিয়েছেন।

আমার এই তরুণ বন্ধুযুগলের সম্পাদনায় প্রকাশিত এই কবিতা সংকলনটি অনেকদিক থেকে অভিনব। একটি অভিনবত্ব গ্রন্থের নামের মধ্যেই আছে। স্বনির্বাচিত একক কবির সংকলন এর পূর্বেও প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু বহু কবির একটি করে স্বনির্বাচিত কবিতার সংকলন এর পূর্বে আর বেরিয়েছে বলে আমার জানা নেই। প্রত্যেক কবিকেই তাঁর বিবেচনায় নিজের শ্রেষ্ঠ কবিতাটি নির্বাচন করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কবির মানসিকতাটি পাঠকের কাছে স্পষ্ট হবে। উপরন্তু কবিরা তাঁদের যে আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে যেমন একদিকে তাঁদের বহিরঙ্গ পরিচয় আছে, তেমনি অন্তরঙ্গ পরিচয়ও আছে। জন্ম সময় এবং স্থান থেকে আরম্ভ করে কবিতা রচনার প্রেরণা, অন্য কবির প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে কবির নিজের জবানিতে আমরা অনেক কথা শুনতে পাব। তাঁর ভালো লাগা, মন্দ লাগার জগতেরও পরিচয় পাব। সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা এবং বর্তমান বাংলাসাহিত্যে কবিদের

বিশিষ্ট দান সম্বন্ধে তাঁদের মতামতও সংগৃহীত হয়েছে। এই মতামত প্রকাশে কেউ বা স্বল্পবাক্, কেউ আবার বাক্‌বিস্তারে কার্পণ্য করেন নি। এরকম করে কবিদের মনকে পাঠক সাধারণের কাছে উন্মোচিত করে দেবার প্রয়াস এর আগের কোনো সংকলনে হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। কবিদের একটি করে প্রতিকৃতিও গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। সে প্রতিকৃতিটি কবির কোনো অসতর্ক মুহূর্তের ছবি বা কবির ভালো লাগার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। এ সকলের মধ্য দিয়েই কবির আচার-ব্যবহার এবং মননের ধারাকে বোঝা যাবে। কবিসত্তাকে বুঝলে যদি কোনো বিশেষ কবির কবিতা বোঝার সহায়তা হয় তবে এই সংকলনটি বাংলাসাহিত্যে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে আমার বিশ্বাস।

কবিদের নির্বাচন করেছেন সম্পাদকদ্বয়। এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন। কিন্তু তাঁদের বিবেচনাই এ সংকলনের মূলসূত্র। যাঁরা স্থান পাননি তাঁদের প্রতি এঁদের কোনো বিরূপতা নেই। যদি অনবধানতাবশতঃ কেউ বাদ পড়ে থাকেন তবে এঁরা আন্তরিক দুঃখিত।

সংকলনের পুরোভাগে যে-কয়জন কীর্তিমান সুপ্রতিষ্ঠিত কবিকে স্থান দেওয়া হয়েছে 'সাম্প্রতিক' আখ্যার মধ্যে তাঁদের অনেককেই ধরা যাবে কিনা সন্দেহ, তবুও সংকলকদের ভাবনা অনুযায়ী এঁরাই সাম্প্রতিক কবিতার পথপ্রদর্শক।

পূর্ব বাংলা থেকে কয়েকটি খ্যাতিমান্ তরুণ কবিকেও এই সংকলনে রচনা পাঠাবার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। সে আহ্বানে প্রচুর পরিমাণে সাড়া পাওয়া গিয়েছে। কবিতাগুলি পড়ে মনে হল বিভক্ত বাংলার দুই অংশের তরুণ কবিরা একই তীর্থপথের যাত্রী। তাঁদের মনন এবং বাচনভঙ্গির সাদৃশ্য বিস্ময়কর। বিভক্ত দেশ মনকে বিভক্ত করেনি।

মোটামুটি গত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের কাব্যসাধনাকে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কালের পরিমাণের মধ্যেই সংকলকদের সাম্প্রতিক যুগ সম্বন্ধে অভিপ্রায়টি বোঝা যাবে।

এই সংকলনটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমার পরম লাভ হয়েছে। বহু অল্পপরিচিত এমনকি অপরিচিত কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ ঘটেছে। তাঁদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং সাধনার কিছু কিছু পরিচয় তাঁদের আত্মকাহিনী থেকে উদ্ধার করতে পেরেছি। বহুবিধ কর্মের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও একই সাধনায় ব্রতী এই কবিকুলের প্রচেষ্টার মধ্যে আমাদের যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদান নিহিত হয়ে আছে। এঁদের কেউ কেউ প্রেমকে নূতনতর

চিন্তার নিকষে যাচাই করে নিতে চান, কারও দৃষ্টিতে প্রকৃতির চিরন্তন রূপ নূতনতর মূর্তিতে ধরা পড়েছে। কেউ রাজনৈতিক চেতনাকে কবির ভাষা দিয়েছেন, কেউ আবার মানুষের অন্তরের গভীরে সীমাহীন অজ্ঞাত রাজ্যের রহস্য সন্ধানের প্রয়াসী। কোনো কবি বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টায় বিদ্রোহী, কেউ নূতন পৃথিবীর কল্পনায় বিভোর। সব মিলিয়ে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক সমাজ-ব্যবস্থা, অশান্ত পৃথিবীর বহুবিধ চিন্তার অভিঘাত, ব্যক্তিগত সূক্ষ্ম মনন ইত্যাদির প্রভাব সম্বলিত একটি সাম্প্রতিক অথচ সমগ্র রূপ এই সংকলনে ধরা পড়েছে।

এঁদের ভাষা ও ব্যঞ্জনায়ও বৈচিত্র্য আছে। কেউ তৎসম শব্দের নিগূঢ় মাধুর্যটিকে নূতন শব্দ-পরিবেশের মধ্যে খাপ খাইয়ে নিতে চান; কেউ অতি-প্রাকৃত দৈনন্দিন শব্দগুলির ধ্বনিকে ভাবগাম্ভীর্যে নিষিক্ত করে পরিবেষণ করেছেন; কেউ দুইয়ের সংমিশ্রণে একটি নূতন পথের সন্ধানে উন্মুখ। কেউ হৃদয়ের পথে বুদ্ধিতে পৌঁছুতে চান, কারও আবেদন বুদ্ধির কাছেই, বুদ্ধির পথেই তাঁরা হৃদয়ের দিকে পাড়ি জমিয়েছেন। নূতন ধরনের ছন্দবিন্যাস এবং চিত্রকল্প উদ্ভাবনেও অনেকে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। কেউ কিছু পরিমাণে দুরূহ, কেউ বা স্বভাবতই সরল। তবে একদা যে অস্পষ্টতাকেই সাম্প্রতিক কবিতার বিশেষ লক্ষণ বলে ধরা হত, তার থেকে এখনকার কবিকুল অনেক পরিমাণে মুক্ত। কারও চিন্তার মধ্যে যদি অসংগতি থেকে থাকে তবে তাকে ভঙ্গি বলে ভুল করার প্রয়োজন নেই। অসংলগ্নতা থেকে একদিন পরিচ্ছন্ন বিন্যাসে এঁদের কবিতা মুক্তি পাবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

সব মিলিয়ে এই সংকলনটিকে আমার একটি শোভাযাত্রার মতো মনে হয়েছে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে যাঁরা আছেন, তাঁরা নিজস্ব স্বতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। অন্যদের স্বকীয়তার আদলটি তেমন পরিস্ফুট নয়। এই পরবর্তী কবিরা যেন শোভাযাত্রার মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি করে আছেন, দূর থেকে তাঁদের স্বকীয়তা তেমন করে চোখে পড়েনা। হয়তো অচিরেই তাঁদের অনেকে নিজস্ব মহিমায় শোভাযাত্রার পুরো-ভাগে অগ্রবর্তী হয়ে আসবেন।

শ্রাবণ—১৩৭৩
বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন
বোলপুর

সবিনয় নিবেদন

এমন এক সময় ছিলো যখন বাংলা কবিতা-সংকলন প্রকাশে কেউ সাহসী হ'ত না। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেলো বাংলাসাহিত্যের অন্যান্য শাখার চেয়ে কবিতা সংকলনই বেশী সংখ্যায় প্রকাশ হচ্ছে নানাধরনের অভিনবত্ব নিয়ে। বেশ কিছু কবিতা ও কবিকে জড়ো করে পরিপাটি বাঁধাইয়ের সংকলন প্রকাশ হওয়াটা আজকের দিনে আমরা নতুন কিছু বলে মনে করি না। এ ধরনের সংকলন ইতি-পূর্বে হয়েছে, আরও হয়তো হবে। তাই আমরা উপলব্ধি করলাম—আজকের দিনে এমন একটি সংকলন-গ্রন্থের প্রয়োজন, যে গ্রন্থে কবির শুধু কবিতামাত্র নয়, যাতে থাকবে কবির ব্যক্তিগত জীবন, দর্শন, মনন, কাব্যবোধ, কাব্যবিচার, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের চিন্তাধারা। যে তথ্যবলী শুধু আজকে নয়, আগামী কালের জন্যেও প্রয়োজন।

ঃ আমরা প্রত্যেক কবির কাছেই কতগুলো নির্দিষ্ট প্রশ্ন তুলে ধরেছি: যার ভেতর দিয়ে জানা যাবে তাঁদের জীবিকা, জীবনের প্রথম সোপানে তিনি কোন্ কবির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর প্রিয় বিদেশী কবি কারা, সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা কি? আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর মতা-মত। তথ্যের দিক দিয়ে জন্ম-তারিখ, কবে কোথায় প্রকাশিত প্রথম কবিতা, এগুলো নিশ্চয়ই সাহিত্যের প্রতিটি রসিকের কাছে প্রয়োজন। বাংলাসাহিত্যের প্রতিটি ছাত্র এবং কবিতা-প্রিয় পাঠকের কাছে কবির অবয়বও একটি কৌতূহলেব বিষয় বৈকি তাই আমরা নির্বাচিত সব কবিদের এমন একটি ফটো তুলে ধরলুম যে ছবি এতদিন তাঁদের ব্যক্তিগত এ্যালবামে লুকনো ছিল।

সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কবিরা প্রত্যেকেই আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন। যা উত্তর দিয়েছেন আমরা পাঠকের কাছে তার বিন্দুমাত্র এদিক ওদিক না করে হুবহু উপস্থাপনা করলুম। অনেক উপযুক্ত কবিকেই স্থানাভাবে আমরা আমাদের এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করতে পারলুম না এর জন্যে তাঁদের পাঠকদের চেয়ে আমরাও কম মর্মাহত নই। কিন্তু উভয় বাংলার একই সময়ে বিভিন্ন সুরে কতো কবি কবিতা লিখছেন এই সল্প পরিসরে তারই মধ্য থেকে আমাদের পছন্দ মত কবিদের বেছে

নিয়েছি দলমতনির্বিশেষে। এর সাথে যুক্ত করেছি 'স্মরণ' পর্যায়—যাতে পরলোকগত কবিরা অলংকৃত করেছেন। এপার-ওপার বাংলার কবিদের এই সংকলনটি তামাম বিশ্বের যত বাংলা ভাষার পাঠক আছেন সকলের কাছে যাতে তুলে দেওয়া যায় তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে, অর্থনৈতিক লাভের দিকটা না ভেবে এই প্রামাণ্য গ্রন্থটিকে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী করার চেষ্টা করেছি। আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও নজর এড়িয়ে কিছু ত্রুটি হয়তো থেকে গেলো। তবু যদি কবিদের এই 'স্বনির্বাচিত সংকলন রুচিশীল পাঠকের মনো-জগতের খানিকটা খোরাক মেটাতে পারে, যদি কৌতূহলী পাঠকদের তৃপ্তি দিতে পারে—যদি কিছু কবিতার পাঠককে আরো উৎসাহী করতে পারে, তবেই ভাববো আমাদের দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। গ্রন্থপ্রকাশে শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত, জীবপ্রিয় গুহ ও বন্ধুবর মিহির দাসকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

ক'লকাতা
১৬ই সেপ্টেম্বর '৭০

সূচীপত্র

স্মরণ

এপার বাংলা

ওপার বাংলা

ভ্রম সংশোধন

৩৪ পৃষ্ঠায় ৩য় লাইনে বালার স্থানে বাংলা। নেতা—নেতার
৩৬ পৃষ্ঠায় ১ম লাইনে চেতনার—চেতনায়
৪৮ পৃষ্ঠায় ৪র্থ লাইনে জানালার—জানালায়
৯৮ পৃষ্ঠায় ৪র্থ লাইনে আকুতিতে—আকৃতিকে
১০৬ পৃষ্ঠায় ৫ম লাইনে সরকারে—সরকারের
১৬৩ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ লাইনে ফ্লাটফর্ম—প্লাটফর্ম

বয়ঃক্রম অনুসারে : বিনয় মজুমদার (১৯৩৪) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আগে
রত্নেশ্বর হাজরা (১৯৩৬) মলয়শঙ্কর দাশগুপ্তের আগে আসবে।

স্মরণী

জীবনানন্দ দাশ

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা-কবিতার পাঠকদের সবচেয়ে বেশী অভিভূত করেছেন জীবনানন্দ দাশ। তাঁর কবিতাবলী একদিকে আমাদের ব্যক্তিগত অসুখের শুশ্রূষার খনি অপরদিকে মহাজাগতিক চেতনায় দেদীপ্যমান। দেশ মাটি জল নিসর্গ এতকাল তন্ময় হয়ে একজন কবির জন্যে অপেক্ষা করছিল। শব্দ রূপ চিত্র বর্ণ সবকিছুকেই সম্পূর্ণ নতুনভাবে ব্যবহার করে তিনি বাংলা কবিতার প্রতিমাকে উজ্জ্বলতম করে গড়ে তুলেছেন—বিষণ্ণ অপ্রেমের মধ্যেও যিনি বিশ্ব-মানুষের নিরপরাধ প্রেমচেতনাকে কবিতার বিষয় করে গেলেন, তাঁর আসন আমাদের নিজেদের বুকের মধ্যে।

জন্মস্থান, জন্মসাল: বরিশাল শহর, ১৮৯৯। ৬ই ফাল্গুন ১৩০৫। **মৃত্যু:** ১৪ই অক্টোবর, ১৯৫৪ কলকাতায় রাসবিহারী এভিনিউতে রাস্তা পার হবার সময়

ট্রামের ধাক্কায় মারাত্মক আহত হয়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন—১৯৫৪, ২২শে রাত্রি ১১-৩৫ মিনিটে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

জীবিকা: অধ্যাপনা। এতেই কর্মজীবন সুরু এবং শেষ। মাঝখানে কিছুদিনের জন্যে কলকাতায় একটি দৈনিক পত্রিকায় সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদনায় নিযুক্ত ছিলেন। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা**: বর্ষ আবাহন, **প্রকাশ সন**: ১৩২৬, বৈশাখ। **কবিতাটি কোন্ পত্রিকায় মুদ্রিত**: 'ব্রহ্মবাদী' ২০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। ১৩২৬, বৈশাখ সংখ্যায় ১ম পৃষ্ঠা। নামের আগে 'শ্রী' ছিল এবং সূচীপত্রে কবিতাটির পাশে জীবনানন্দ দাশ, বি. এ. উল্লেখ ছিল। **সবচেয়ে প্রিয় বিদেশী কবি**: কেউ কেউ বলেন ইয়েট্স কেউ বা এলিয়ট। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: আমি বলতে চাই না যে, কবিতা সমাজ বা জাতি বা মানুষের সমস্যাখচিত অভিব্যক্ত সৌন্দর্য হবে না। তা হতে বাধা নেই। অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যই তা হয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত চিন্তা, ধারণা, মতবাদ, মীমাংসা কবির মনে প্রাক্‌কল্পিত হয়ে কবিতার কল্পলোকে যদি দেহ দিতে চায় কিংবা সেই দেহকে দিতে চায় যদি আভা তাহলে কবিতা সৃষ্ট হয় না—গদ্য লিখিত হয় মাত্র—ঠিক বলতে গেলে গদ্যের আকারে সিদ্ধান্ত, মতবাদ ও চিন্তার প্রক্রিয়া পাওয়া যায় শুধু। কিন্তু আমি আগেই বলেছি কবির প্রণালী অন্যরকম, কোনো প্রাক্‌নির্দিষ্ট চিন্তা বা মত-বাদের জমাট দানা থাকে না কবির মনে—কিংবা থাকলেও সেগুলোকে সম্পূর্ণ নিরস্ত করে থাকে কল্পনার আলো ও আবেগ; কাজেই চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ প্রকৃত কবিতার ভিতর সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা-উপশিরা ও রক্তের কণিকার মত লুকিয়ে থাকে যেন। লুকিয়ে থাকে; কিন্তু নির্দিষ্ট পাঠক তাদের সে সংস্থান অনুভব করে, বুঝতে পারে যে তারা সঙ্গতির ভিতরে রয়েছে, অসংস্থিত পীড়া দিচ্ছে না; কবিতার ভিতরে আনন্দ পাওয়া যায়; জীবনের সমস্যা ঘোলাজলের মূষিকাঞ্জলির ভিতর শালিকের মত স্নান না করে বরং যেন করে আসন্ন নদীর ভিতর বিকেলেব সাদা রৌদের মত,—সৌন্দর্য ও নিরাবরণের স্বাদ পায়। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: আমার জিজ্ঞাসা ও চিন্তার জন্যে কেন পতঞ্জলির কাছে যাব না, ষড়দর্শনের কাছে যাব না, বেদান্তের কাছে যাব না, মাঘ ও ভারবির কাছে না গিয়ে? জীবনের ও সমাজের ও জাতির সমস্যার সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট আলোক চাই। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলালের নিকট যাব না কেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের নিকট না গিয়ে? দার্শনিক বার্গস'র কাছে যাওয়া উচিত, ইংলন্ডের বা রুশিয়ার অর্থনীতি ও সমাজনীতিবিদ সুধী ও কর্মীদের নিকট যাওয়া উচিত—ইয়েটসের কাব্যের নিকট এমনকি এলিয়ট ইত্যাদির কাব্য প্রচেষ্টার নিকটে নয়।......কাব্যের ভিতর লোকশিক্ষা ইত্যাদি

অর্ধনারীশ্বরের মত। **সংকলনভুক্ত কবিতাটি:** বনলতা সেন। **কবে, কোথায় কবিতাটি রচিত, কোথায় প্রকাশিত:** 'কবিতা', ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত। পৌষ, ১৩৪২।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: ঝরা পালক (১৯২৮), ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৯), রূপসী বাংলা (১৯৫৭), বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)। শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রথম পর্যায় (১৯৫৪), শ্রেষ্ঠ কবিতা দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৬৮)।

বনলতা সেন

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকার মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকেব ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের পর
হালভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ দুটি তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ জীবনের সব লেন দেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

নিখিল নাস্তি চেতনায় নীত হওয়ার আগে সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে অনেকগুলো দ্বান্দ্বিক পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছিলো। পাণ্ডিত্য ও কাব্যচেতনাকে সমাহারে বেঁধে দেয়ার জন্যে তাঁর পরিশ্রম বাংলাদেশে কিংবদন্তী হয়ে আছে। প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই পুরুষের কবিতাকে চোখের জলে ভেসে যাওয়ার ঐতিহ্য থেকে মুক্ত করার অকম্প্র পণ ছিল তাঁর। সুধীন্দ্রনাথের কাছে কবিতা ভাস্কর্য।

জন্মস্থান, জন্মসাল, ঠিকানা: কলকাতা, হাতীবাগান। ১৯০১ অক্টোবর। পরবর্তী কালে ৬নং রাসেল স্ট্রীটের তিনতলায়। মৃত্যু: ১৯৬০, ২০শে জুন। ভোর রাতে মাথায় রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যু। **জীবিকা:** ইংরাজীতে এম.এ. তারপর

ল' পড়েন কিন্তু পরীক্ষা দেন নি। পিতার সলিসিটর্স ফার্মে (এইচ. এন. দত্ত এন্ড কোং) শিক্ষানবিশী ছিলেন বহুকাল কিন্তু বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন নি। তারপর লাইট অব এশিয়ার ইন্সিওরেন্স-এ কিছুকাল কাজ করেন। শরৎচন্দ্র বসুর 'লিটারারি' কাগজে কিছুকাল সাংবাদিকতা। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের প্রচার-বিভাগের প্রধান। কিছুদিন 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন, সবার শেষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা**: কুক্কুট (ক্রন্দসী কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত) **কবিতাটি কোন্ পত্রিকায় মুদ্রিত**: প্রবাসী। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আছে—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুদ্ধপরবর্তী আধুনিক ইংরেজী কবিতার ফর্ম বিষয় ও বৈচিত্র্য নিয়ে সুধীন্দ্র দত্তের সঙ্গে দীর্ঘ বিতর্ক উপস্থিত হয়। বিষয় গৌরবের মূল্য কবিতার ক্ষেত্রে গৌণ এমন অভিমত প্রকাশ করায় রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে সুধীন্দ্রনাথকে বললেন—তাহলে মোরগের ওপর কবিতা লেখতো, দেখা যাক কি রকম উৎরোয়! সুধীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন হ্যাঁ, কবিতা তো হবেই এবং সে কবিতা আপনার বিচারে উত্তীর্ণ হবে এমন আশা রাখি। কয়েকদিন বাদে সুধীন্দ্রনাথ 'কুক্কুট' নামে একটি কবিতা লিখে রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে হাজির হলেন। ......কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পেশ করে তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলেন। গুরুদেব কবিতাটি পড়লেন......আবার পড়লেন। প্রশান্ত হাসিতে তাঁর মুখ ভরে উঠল তারপর বলে উঠলেন—'না, তুমি জিতেছো।' রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন এবং নিজেই 'প্রবাসী' পত্রিকায় কবিতাটি পাঠিয়ে দিলেন। প্রবাসীতে 'কুক্কুট' নামে প্রকাশিত হল—যতদূর জানা যায় এটাই তাঁর সর্বপ্রথম প্রকাশিত কবিতা। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: হতে পারে কবিতা জীবনের নানারকম সমস্যার উদ্ঘাটন; কিন্তু উদ্ঘাটন দার্শনিকের মত নয়: যা উদ্ঘাটিত হল তা যে কোনো জঠরের যেভাবেই হোক আসবে সৌন্দর্যের রূপে, আমার কল্পনাকে তৃপ্তি দেবে। যদি তা না দেয় তাহলে উদ্ঘাটিত সিদ্ধান্ত হয়তো পুরনো চিন্তার নতুন আবৃত্তি কিংবা হয়তো নতুন কোন চিন্তাও যা হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে কিন্তু তবু তা কবিতা হল না; হল কেবলমাত্র মনোবীজরাশি। কিন্তু সেই উদ্ঘাটন পুরনোর ভিতরে সেই নতুন কিংবা সেই সজীব নতুন যদি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করতে পারে, আমার সৌন্দর্যবোধকে আনন্দ দিতে পারে তাহলে তার কবিতাগত মূল্য পাওয়া গেল; আরো নানারকম মূল্য। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: কবিতা মুখ্যত লোকশিক্ষা নয়,—কিংবা লোকশিক্ষাকে রসমণ্ডিত করে পরিবেশন, না তাও নয়; কবির সে রকম কোনো উদ্দেশ্য নেই। কিঙ্ লিয়ার কিংবা বলাকার

কবিতায় এবং পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যেই কবির কল্পনা প্রতিভার বিচ্ছুরণে কিংবা তার সৃষ্ট কবিতার ভিতর সে রকম কোনো লক্ষ্যের প্রাধান্য নেই। কবিতা হচ্ছে স্বতন্ত্র একটা রসাস্বাদ কিন্তু তবু কবিতার সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ অন্তত দুই রকম। প্রথমত শ্রেষ্ঠ কবিতার ভিতর একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সংকলনভুক্ত স্বরচিত কবিতাটি: ঊটপাখি। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** আসল প্রশ্ন হচ্ছে ভিড়ের সময় পরিবর্তিত হওয়া দরকার কিন্তু সেই পরিবর্তন আনবে কে? সেই পরিবর্তন হবে কি কোনদিন? যাতে তিন হাজার বছর আগের জনসাধারণ কিংবা আজকের এই বিলোল ভিড়ের মত জনসাধারণ থাকবে না আর? যাতে এলিজাবেথের সময়ে ইংলন্ডে কিংবা ধরা যাক ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে-সব শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হয়েছে গণপাঠকও সে সবের গভীর বোদ্ধা হয়ে দাঁড়াবে? ভাবতে গেলেও হাসি পায়। কিন্তু তামাশার জিনিস নয় হয়তো। যখন দেখি শুধু তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গীতশিল্পী ও চিত্রশিল্পীরাই শুধু নয়, একাধিকবার উচ্চতর শিল্পীরাও দিকে দিকে স্বীকৃত হচ্ছে তখন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় প্রথম শ্রেণীর কবিরা নির্বাসিত হয়ে রয়েছে কেন? কিন্তু যখন দেখি তথাকথিত সভ্যতা কোনো এক দারুণ হস্তী জননীর মত যেন বুদ্ধিস্খালিত দাঁতাল সন্তানদের প্রসবে প্রসবে পৃথিবীর ফুটপাত ও ময়দান ভরে ফেলছে তখন মনে হয় যে কোন সূক্ষ্মতা পুরানো মেদ ও ইন্দ্রলুপ্তির বিরুদ্ধে যা পুরানো প্রদীপকে যে অদৃশ্য হাত নতুন সংস্থানের ভিতর নিয়ে গিয়ে প্রদীপকেই যেন পরিবর্তন করে ফেলে: তার এই সাময়িকতা ও সময়হীনতার গভীর ব্যবহার যেন মুষ্টিমেয় দীক্ষিতের জন্য শুধু—সকলের জন্য নয় অনেকের জন্য নয়। কিন্তু তবুও সকলের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে কি? কবে? কে আনবে? কবিকে শিক্ষিত অধিনায়ক সাজাতে হবে? সৌন্দর্যপ্রবাহে স্পন্দিত করে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করতে হবে? প্রপ্যাগান্ডা করতে হবে? ক্রিকেটর সাজতে হবে? জীবনের সঙ্গতি ও সুষমার সাধনায় উন্মুখ হবে? যদি কোনো শেষ বৈকালিক ইন্দ্রজালে আজকের এই সভ্যতার মোড় ঘুরে যায় তাহলে কবিকে কিছু করতে হবে না আর; তার নিজের প্রতিভার নিকট যাকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে শুধু কতিপয়ের হাতে তার কবিতার দাম অর্পণ করে; যে কবিতায় হয়তো ক্রমে ক্রমে বেড়েও যেতে পারে। মানুষের হৃদয় তার পুরনো আলোক আলোকের ভিতর আর থাকতে পারছে না বলে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** সম্প্রতি বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি সন্দিহান হয়েছি। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলুম। কিন্তু সেকালের যে-সব তরুণ কবিদের মধ্যে আমরা অনেক সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেছিলুম তাঁদের অধিকাংশই

অন্ততঃ আমার আশাভঙ্গ ঘটিয়েছেন। তবে এই অভিযোগ শুধু বাঙালী কবিদের সম্পর্কে খাটে না, আজকালকার পাশ্চাত্ত্য লেখকেরাও কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন। একমাত্র এলিয়টই পরিণতির দিকে প্রাগ্রসর।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: তন্বী (১৯৩০), অর্কেষ্ট্রা (১৯৩৫), উত্তর ফাল্গুনী (১৯৪০), ক্রন্দসী (১৯৩৭), সংবর্ত (১৯৫৩), দশমী (১৯৫৬), প্রতিধ্বনি।
সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা: পরিচয়।

উটপাখী

আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি?
কেন মুখ গুঁজে আছ তবে মিছে ছলে?
কোথায় লুকাবে? ধু ধু করে মরুভূমি:
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই;
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।
নিষাদের মন মায়ামৃগে ম'জে নেই;
তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ।
কোথায় পালাবে? ছুটবে বা আর কত?
উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা।
প্রাক্ পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা॥

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।
তার চেয়ে আজ আমার যুক্তি মানো,
সিকতাসাগরে সাধের তরণী হও;
মরুদ্বীপের খবর তুমিই জানো,
তুমি তো কখনো বিপদপ্রাজ্ঞ নও।
নব সংসার পাতিগে আবার চলো
যে-কোনো নিভৃত কণ্টকাবৃত বনে।
মিলবে সেখানে অন্তত নোনা জলও,
খসবে খেজুর মাটির আকর্ষণে॥

কল্‌পলতার বেড়ার আড়ালে সেথা
গ'ড়ে তুলব না লোহার চিঁড়িয়াখানা;
ডেকে আনব না হাজার হাজার ক্রেতা
ছাঁটতে তোমার অনাবশ্যক ডানা।
ভূমিতে ছড়ালে অকারী পালকগুলি
শ্রমনশোভন বীজন বানাব তাতে;
উধাও তারার উড্ডীন পদধূলি
পুঙ্খে পুঙ্খে খুঁজব না অমারাতে।
তোমার নিবিদে বাজাব না ঝুমঝুমি,
নির্বোধ লোভে যাবে না ভাবনা মিশে;
সে-পাড়াজুড়ানো বুলবুলি নও তুমি
বগীর্রি ধান খায় যে ঊনতিরিশে॥

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দুজনে সমান অংশীদার;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের পরে দেনা শোধবার ভার।
তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি।
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই ক্ষতি।
ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।
অতএব এসো আমরা সন্ধি ক'রে
প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি ঃ
তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে,
তোমাকে, বন্ধু, আমি লোকায়তে বাঁধি॥

সঞ্জয় ভট্টাচার্য
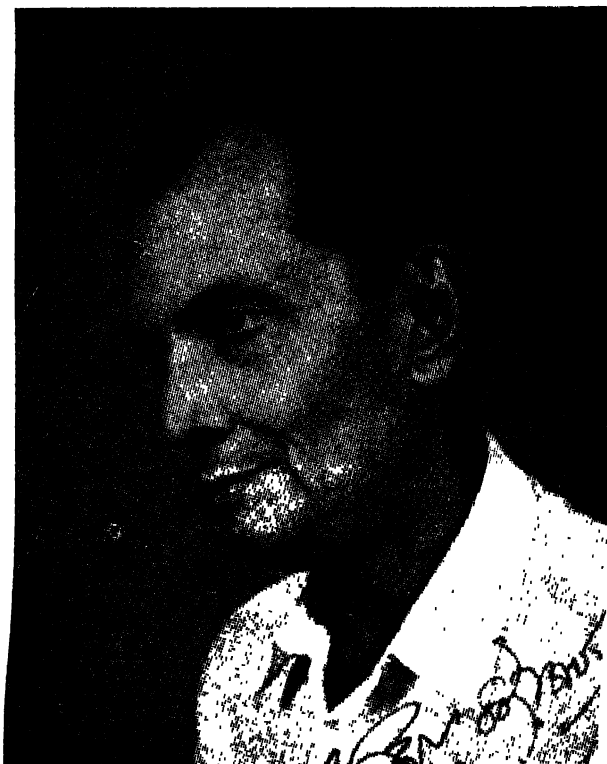
আজীবন কবিতায় অটল ও সংগ্রামী মনোভাবের জন্যে কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য আজও শ্রদ্ধেয়। সঞ্জয় ভট্টাচার্য যখন কথা বলেছেন তখন তিনি মেরুদণ্ড সোজা রেখেই কথা বলেছেন, এবং সাহিত্যেও আপোষহীন এই কবি কখনো মাথা নিচু করেননি। কবিতার দীর্ঘ সড়কে কখনো তিনি দুঃখে কাতর, কখনো রাজনীতিতে উদ্বেলিত হয়েছেন; কখনো আবার প্রেম, প্রকৃতিতে নিমগ্ন থেকেছেন। মেজাজে লিরিকধর্মী অগ্রজ এই কবি, শুধু কবিতায় নয় কবি গড়ার কারিগর হিসেবেও নিজেকে স্মরণীয় করে রেখেছেন। শব্দ চয়নে অনন্য এবং সাতরঙা তুলির আঁচড়ে নিপুণ শিল্পীর মতো ক্যানভাস বিচিত্র রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন।

জন্মস্থান, জন্মসাল, ঠিকানা: ত্রিপুরা বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত, কুমিল্লা জেলায় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। **জীবিকা:** দাস্যবৃত্তি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ধাতে সইতো না। তাই কোথায় কোনো চাকুরী নেননি। যদিও বহু উচ্চতর মহলে তাঁর যাতায়াত ছিল। ব্যবসায়ে নামলেন। 'মডার্ন ফার্ম' স্থাপন করলেন, অনেক জমি নিয়ে যশোহর জেলায়, কিছু যন্ত্রপাতি কেনা হল। একদিকে সাহিত্যচর্চা অপর-দিকে কৃষিচর্চা যেন সুমেরু আর কুমেরু। খামারে কাজ চলছিল ভালই, সম্ভাবনাও ছিল প্রচুর। 'পূর্বাশা' প্রকাশ ও মডার্ন ফার্ম-এর প্রধান দপ্তর একই বাড়িতে গণেশ এভিনিউর উপর। এই বাড়িটি হয়েছিল যেন সাহিত্যিকদের তীর্থক্ষেত্র। চারিপাশে ব্যস্ততা, লোকজনের আসা-যাওয়া, চা ওমলেট, কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। ব্যবচ্ছেদের বিনিময়ে অর্জিত হল ভারতের স্বাধীনতা। যশোহর জেলার তিনচতুর্থাংশ পড়ে গেল পূর্ব-পাকিস্তানে। মডার্ন ফার্ম হাতছাড়া হয়ে গেল। আঘাত প্রচণ্ড, প্রায় যেন বিনামেঘে বজ্রপাত। সব ভণ্ডুল হয়ে গেল, রইলো শুধু পূর্বাশা প্রকাশন ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অমোঘ আত্মপ্রত্যয়। তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী সৃজন করতে লাগল একের পর এক গদ্যে এবং পদ্যে এবং মৃত্যু অবধি ছিল এ ধারা অক্ষুণ্ন। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** 'জ্যোৎস্নায়' **প্রকাশ সন:** ১৯৩২। **কবিতাটি কোন্ পত্রিকায় মুদ্রিত:** 'পরিচয়', ২য় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, মাঘ, ১৩৩৯। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** চেতনার ফলিত চিত্র স্বপ্নে বা মত্তাবস্থায় ভোজবাজি দেখায়—কিন্তু শিল্পীর এলাকায় যখন তা বিবেচিত হয় তখন পরাবাস্তবতায় তা সুসমন্বিত রূপ ধারণ করে। পরাবাস্তবতায় অতীতে পলায়িত মানবিক বা মানসিক জীবন। সে জীবন যে ম্যাজিসিয়ানের ম্যাজিকের মতোই কতকগুলো অনুভূতির ছবি কুড়িয়ে এনে কবি জোড়াতাড়া দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন। কবির নিকট অতীতের একটি দেশের নাম নামমাত্রে পর্যবসিত নয়—সে নামে সে দেশ জীবন্ত তাঁর চিত্তে। এই জীবন্ততার কারকশক্তি ইতিহাস-চেতনা। মানুষের সুদীর্ঘ ইতিহাস যাঁর জানা নেই তাঁর নিকট কবির অতীতচরণ 'ম্যাজিক' বলে প্রতীত হতে পারে। কিন্তু যিনি অতীতচারী তাঁর দৃষ্টিতে পরা বাস্তবসেবী কবি অত্যন্ত বেশী মানব—প্রগাঢ় ব্যক্তিসত্তা কিন্তু কবিকে এ আদর্শে জানা হয়ত আমাদের দেশের নবীন রীতি নয়। যদি তাই সত্য হয়, তাহলে অতি-দ্রুত সে রীতির সংস্কার দরকার। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** সৎ কবি, সৎ ব্যক্তি, মনকে তিনি আবৃত রাখতে নারাজ। বিশ্বপ্রকৃতির তাঁর ইন্দ্রিয়ের দ্বারপথে মানসিক দ্বারকায় পৌঁছোতে পারলে যে কাণ্ডকীর্তি-কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দেয়—অহংবোধে যে পৌরুষ জাগে তাঁর চেতনায় এবং শেষটায় বিনয়বোধে যে নম্রতায় শায়িত হয় তাঁর শরীর, তার রেখাপাত করে যাওয়াই সৎ ব্যক্তির স্বরূপ, সৎ

কবির কাব্য। তিনি অভিনেতা নন—এটুকু জানলেই তাঁকে সৎ ভাবা যায়। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: কবিতা পড়ে ভাল লাগার ভাবটি হয়ত অনেক পাঠক লাভ করে থাকেন, কিন্তু তা থেকে এমন কথা বলা যায় না যে তেমন পাঠকই সৎ সমালোচক। সমালোচক ও পাঠক উভয়ে আত্মবোধই নিবেদন করেন সত্য কিন্তু নিবেদনের ভঙ্গিটি হয় পৃথক।

......যে রচনা কবির মনঃপূত হচ্ছে না, অনেকক্ষেত্রে সে কবিতা কবিকে যশস্বী করেও তোলে দেখা যায়। ধ্বনির স্বকীয় গুণের দরুনই তা হয়ে থাকে। তাই আমাদের মনে হয়, কবিতা ভাষান্তরিতা হতে পারে না। ভাষান্তরিতা হয়ে যে কবিতা কাব্যগুণ বজায় রাখে সে কবিতায় কতকটা স্থায়ী ভাব রস আছে বলা যায় কিন্তু ভাষা-শিল্পে ধ্বনি অবান্তর এবং স্থায়ী ভাব ও রসই সর্বস্ব, তাতো নয়। গুণী কাব্যরসিকদের চোখ আর কান সমান সজাগ থাকে। কাব্য ছটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গী হয়ে তবে অন্তরেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে। চিত্রগীতি বেদনায় যে রঙ ফলায় তা-ই কাব্যের আস্বাদিত রঙ। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: তাহলে বলতে হয় যে চোখ-কান খোলা থাকলেই কাব্যের চিক্কণ রূপ দর্শন হয় না চাই চেতনার আচ্ছাদ-সরসী। সৎ কবি এই মানস-সরসীর মালিক। যদি দ্রুত সংস্কারকে আমরা বিপ্লব আখ্যা দিই। অবশ্য বিপ্লবী সমালোচকের আবির্ভাবের আগেই বিপ্লবী কবির আবির্ভাব হচ্ছে বাংলায়, তা-ই জেনে আমরা সুখী।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: অপ্রেম ও প্রেম (১৯৫২), নতুন দিন। পত্রাবলী (১৯৫৩), পৃথিবী (১৯৩৯), প্রাচীন প্রাচী (১৯৪৮), যৌবনোত্তর (১৯৪৬), সঙ্কলিতা (১৯৪৭), সবিতা (১৯৫৮), সাগর ও অন্যান্য কবিতা (১৯৪৬), স্বনির্বাচিত কবিতা (১৯৫৫), উত্তর পঞ্চাশ (১৯৬৩)।

সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা: নিরুক্ত, পূর্বাশা। পূর্বাশা (নবপর্যায়)।

নীলিমাকে

রাত্রিতে জেগে ওঠে যে সাগর
অন্ধকারের সাগর—
তুমি তাতে স্নান ক'রে এসো, নীলিমা,
তোমার চোখ হোক আরো নীল
চুল হোক ধূসর ফুলের মঞ্জরীর মতো।

আর যদি রাত্রিকে বিদীর্ণ করে' ওঠে চাঁদ
তোমার আঁচলে লেগে থাকে যেন সিক্ত জ্যোৎস্না

তোমার বুকে পাই যেন জ্যোৎস্নার গন্ধ;
বলতে পারো, সে জ্যোৎস্না কি নীল হবে নীলিমা,
নীল পাখির পালকের মতো?

জানি, তুমি আমায় ডাকবে—
(নীল বন কি কথা ক'য়ে উঠলো—
আর মেঘের গায়ে-গায়ে নেমে এলো স্বপ্নরা?)
আমার চোখ নরম হ'য়ে আসবে ঘুমে, নীলিমা,
তোমাকে নয়, তোমার স্বপ্নকে পেয়ে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে সুকান্তকে বলা যায় ফ্লাওয়ার অ্যান্ড ফায়ার অব্ রে'নেসাঁ। মাত্র চোদ্দ পনেরো বছর বয়স থেকেই সুকান্তর প্রকৃত কাব্যজীবন শুরু। মাত্র অল্প কয়েক বছরের কাব্য-সাধনায় এভাবে বাংলার তরুণ সমাজের মন আর কেউ কেড়ে নিতে পারেননি। এই বিস্ময়কর প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের একটি কিংবদন্তী। 'যুগসন্ধিকালের কবি সুকান্তর কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হবার আগে যুদ্ধ বন্যা দুর্ভিক্ষ ঝড় তাঁর কবি-মনকে মথিত করে গেছে। ১৯৪৫/৪৬ সাল জুড়ে ক'লকাতার বুকে প্রতিটি গণ-আন্দোলনে সংগ্রামী মানুষদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন সুকান্ত। সুকান্ত কেবল ভাববাদী কবি নয়, বিপ্লবী কবি। তবু 'মৃত্যুর আগের দিন পড়ন্ত রোদের দিকে তাকিয়ে কি ভেবেছিল সুকান্ত? রোদের একটা ঝলক যদি সুকান্তর অন্ধকার অন্ত্র আর ফুশফুশে ঢুকতে পারতো।' সুকান্ত কি সত্যি কালোরাত্রির বৃন্ত থেকে ছিনিয়ে আনতে পেরেছিলো প্রস্ফুটিত সকাল?

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: কলকাতা, কালীঘাট মাতামহের বাড়িতে ৪২, মহিম হালদার স্ট্রীট। ৩১শে শ্রাবণ, ১৩৩৩ সাল। বাসস্থান ছিল।—বাগবাজার নিবেদিতা লেন-এর দোতলা বাড়ি, পরবর্তীকালে যথাক্রমে—বেলেঘাটা—ঐ রাস্তায়ই অন্য ভাড়াটে বাড়ি, ৩৪, হরমোহন ঘোষ লেন এবং বেলেঘাটা বিশ্বাস নার্সারী লেনের একতলা বাড়ি। পৈত্রিক নিবাস—ফরিদপুর, কোটালীপাড়া। মৃত্যু: যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে (কুমুদশংকর রায়) ২৯শে বৈশাখ, ১৩৫৪। **জীবিকা:** ছাত্রাবস্থায়ই মৃত্যু ঘটে, নিয়মিত জীবিকা গ্রহণের আগে। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শিখা'য় (শিশুদের জন্য) ছাপা হয়। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা প্রথম জীবনে ভাল লেগেছিল। এছাড়া কবি অরুণাচল বসুর এবং অরুণাচল বসুর মা সরলা বসুর ('জলবনের'র কাব্যের লেখিকা) প্রভাব সুকান্তর জীবনে কম নয়। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** বাইরের পৃথিবীকে আমি জানি না, চিনি না—আমার পৃথিবী আমার কলকাতার মধ্যেই সম্পূর্ণ। একদিন হয়তো এই পৃথিবীতে থাকবো না, কিন্তু এই মুহূর্ত পর্যন্ত যে আমি কলকাতায় বসে কলকাতাকে উপভোগ করছি......বড় ভাল লেগেছিল পৃথিবীর স্নেহ, আমার ছোট্ট পৃথিবীর করুণা। বাঁচতে ইচ্ছা করে কিন্তু নিশ্চিত জানি কলকাতার মৃত্যুর সঙ্গে আমিও নিশ্চিহ্ন হবো। মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে কিন্তু মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে প্রতিদিন। সে ষড়যন্ত্র করেছে সভ্যতার সঙ্গে। তবু একটা বিরাট পরিবর্তনের মূল্য যে দিতেই হবে। আবার পৃথিবীতে বসন্ত আসবে। গাছে ফুল ফুটবে; শুধু তখন থাকবো না আমি; থাকবে না আমার ক্ষীণতম পরিচয়। তবুতো জীবন দিয়ে এক নতুনকে সার্থক করে গেলাম......এই আমার আজকের সান্ত্বনা। কবি বলে নির্জনতা প্রিয় হবো, আমি কি সেই ধরনের কবি? আমি যে জনগণের কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে? তাছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজকারবার জনতা নিয়েই। বাংলাদেশের আধুনিক কবিতা কি চিত্তে ও চিন্তায় ধ্যানে ও জ্ঞানে; প্রকাশে ও প্রেরণায় জনসাধারণের অভাব অনাহার পীড়াপীড়ন আর মৃত্যু মন্বন্তরকে প্রবলভাবে উপলব্ধি করেন? **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** কবিরা কি নিজেকে মনে করেন দুর্গতজনের মুখপাত্র? তাঁদের অনুক্ত ভাষাকে কি করেন? এককথায় তাঁরা কি জনগণের কবি? তাঁরা নিজেদের না পারুন, কবিতাকে দুর্ভিক্ষের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** প্রকৃত কবির মতো স্বদেশবৎসলের মতো পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের বিভ্রান্ত

জনমনকে দিলেন সান্ত্বনা, অন্ধকারে বসে গাইলেন সূর্যোদয়ের **গান তাঁরা** আমাদের অভিনন্দনীয়।......তেরশো একান্ন সালে সবচেয়ে দুঃখের কথা **হচ্ছে** এই যে, আমরা আমাদের স্বজনবিয়োগের ক্ষোভ, অক্ষমতার জ্বালাকে কত তাড়াতাড়ি ভুলতে পারছি। এতবড় লোকসানকে স্বীকার করতে পারছি কত সহজে এক বছর পূর্ণ হবার বহু আগেই ভাবতে সুরু করেছি। এইতো সেদিন তবু সে কাহিনী হয়ে গেছে একান্ত প্রাচীন। গত দুঃসহ স্মৃতিকে এবং বর্তমানের অনুত্তীর্ণ সংকটকে আমাদের মনে জাগিয়ে রাখার কাজে এতটুকু সহায়তা করতে পারে, তাহলে কবিদের উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হবে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** আর মনে করো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র/নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ/অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা/আর আছে পৃথিবীর চিরকাল আবর্তন।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: অভিযান (১৯৫৩), ঘুম নেই (১৯৪৮), ছাড়পত্র (১৯৪৯), পূর্বাভাষ (১৯৫৫), মিঠে কড়া (১৯৫১) সূর্য প্রণাম।

একটি মোরগের কাহিনী

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে
ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায়—
আরো দু'তিনটি মুরগীর সঙ্গে।

আশ্রয় যদিও মিললো,
উপযুক্ত আহার মিললো না।
সুতীক্ষ্ন চিৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে
গলা ফাটালো সেই মোরগ,
ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত—
তবুও সহানুভূতি জানালো না সেই বড় শক্ত ইমারত।
তারপর শুরু হ'লো তার আঁস্তাকুড় আনাগোনা।

আশ্চর্য! সেখানে প্রতিদিন মিলতে লাগলো
ফেলে দেওয়া ভাত-রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার।
তারপর শুরু হ'লো তার আঁস্তাকুড় আনাগোনা।
ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা দু'তিনটে মানুষ;
কাজেই দুর্বলতর মোরগের খাবার গেল বন্ধ হ'য়ে।

২

খাবার! খাবার! খানিকটা খাবার!
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বারবার চেষ্টা করলো প্রাসাদে ঢুকতে,
প্রত্যেকবারেই তাড়া খেলো প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু ক'রে স্বপ্ন দেখে—
প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবারের।

তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেলো,
একেবারে সোজা চ'লে এলো
ধবধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে,
অবশ্য খাবার খেতে নয়
খাবার হিসেবে।

এপার বাংলা

অমিয় চক্রবর্তী

বিংশ শতাব্দীর অস্থির পদকম্পনের যুগে রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরাধিকার বহন করে পদযাত্রা করেছেন কবি অমিয় চক্রবর্তী। উদার অর্থে মানবতা শব্দটির ব্যঞ্জনা তাঁর দীর্ঘকালীন কাব্য-রচনায় ইতিহাস-চিহ্নিত। সময়ের সমস্ত ক্লেদ, লাঞ্ছনা ও আবর্জনার উপরে দাঁড়িয়ে তাই তিনি প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে আশ্চর্যভাবে বলতে পারেন—'প্রক্ষালন ধাপে ধাপে। দ্যাখো, ধুয়ে রেখেছি পাথর।'

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: শ্রীরামপুর। ১০ই এপ্রিল, ১৯০১। নুাইয়র্ক য়ুনিভার্সিটি, ন্যু-পলজ, নুাইয়র্ক, ১২৫৬১, ইউ. এস. এ। **জীবিকা**: সাহিত্য দর্শনের অধ্যাপক। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা**: ঠিক নাম মনে পড়ছে না, কিন্তু একটি সনেট। আমার কৈশোরে 'সবুজপত্রে' বেরিয়েছিল। **প্রকাশ সন**: সবুজপত্রের প্রথম দিকের কোন এক সংখ্যা। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত**: সবুজ পত্র। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: রবীন্দ্রনাথের

কাব্য। **প্রিয় বিদেশী কবি:** কীটস। এই যুগের বিদেশী কবিদের মধ্যে—য়েট্‌স, ফ্রস্ট, রিল্কে এবং এজরা পাউন্ড। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** ভূমিকা বলতে কি বোঝায় ঠিক বুঝলাম না। কবি, চিত্রী, জ্ঞানসাধক, ধ্যানী, সমাজকর্মী সকলেই মানবজাতির উৎকর্ষের ভূমিকা প্রস্তুত করেছেন, বরাবরই করবেন। যদি তাঁরা যথার্থই সৃষ্টিশীল মানসের অধিকারী হন। বিশেষভাবে একমাত্র কবিই যে অগ্রগতির নায়ক তা আমার মনে হয় না: ঔপনিষদিক অর্থে কবি—মনীষী। দ্রষ্টা বা ঋষির সমতুল্য কিন্তু কবিতা না লিখেও [বা কবিতা রচনা ক'রেও] তাঁরা সমস্ত জনসমাজের পথ উন্মুখ, আলোকিত করে দেন। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** অন্যান্য চরম সাধনার মতো শ্রেষ্ঠ কবিতায় সংস্কৃতির উৎস নিহিত এবং প্রকাশিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সচেষ্টভাবে সংস্কৃতির বা অগ্রগতির চেষ্টা করলে কবিতার বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। চরম প্রেরণা আসে অন্তর্লীন জীবনের প্রবাহ থেকে, সজ্ঞানে সেই প্রবাহ ঠিক করা যায় না। এর অর্থ এ নয় যে সংস্কৃতি বা সমাজচেতনার প্রভাব কবির কবিতায় স্বল্প বা অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু যা কোনো সৃষ্টি সাধনায় সমগ্রের প্রেরণা এসে পৌঁছোয়, সেই সমগ্রকে কোন বিশেষ কাব্যিক সংজ্ঞায় ধরা যায় ব'লে মনে করি না। কবিতার দাবী 'সামান্য' নয়, অসামান্যও নয়। প্রাণের সর্ববিধ কোমল, মর্মগত এবং শক্তিময় প্রকাশের মতো কাব্য-রচনার মূল্যও অসীম। যদি কোনো সমাজে জীবনীশক্তির কমতি ঘটে, যা নিভৃত অথচ সত্য, যা আনন্দে বেদনায় মহীয়ান সেই শিল্প অনাদৃত হয় তাহলে সৃষ্টিশীল শক্তি সৌন্দর্যে স্বপক্ষে আন্দোলন অনিবার্য। যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রতিকারের চেষ্টা সমাজে, রাষ্ট্রে, ভাষা সংস্কারে ক্রমাগতই দেখা দেয়। কিন্তু এই আন্দোলনে কবি যখন যোগ দেন তখন সেটা অনেকটা সামাজিক মূল্য-বোধের পরিচায়ক, গভীরতম কাব্যসাধনার স্থলাভিষিক্ত নয়। বাহির মহলের: যদিও প্রয়োজনীয় ঘটনার অন্তর্গত। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, কবিতাটি রচিত। কোথায় প্রকাশিত.** 'চিন্তিত মানুষ'। তারিখ মনে নেই তবে এখানে বসেই লেখা এবং প্রকাশ হয়েছিল 'কবি ও কবিতা'য়। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** শিখর স্থানীয়। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** অত্যুজ্জ্বল। যে প্রাণধারা নতুন যুগের কবিতায় প্রবাহিত হয়েছে তার প্রেতি বহুদূর ভবিষ্যতেও প্রশমিত হবে না। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি, তারপরে বহু দিক্‌ দেশান্তরে উজ্জীবন শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মূল প্রভাব এখনো বিদ্যমান। সমস্তকে গ্রহণ ক'রে, নব নব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বাংলা কবিতা এগিয়ে চলেছে। মধ্যে মধ্যে মন্দা পড়ে না তা নয়। ঠিক এখন হয়তো দৃঢ়তার এবং সৃজন-উদ্দীপনার কিছু অভাব

সংশয়াপন্ন বিশ্বসাহিত্যের সর্বত্রই চোখে পড়বে, কিন্তু আধুনিক বাংলা কাব্যের জোয়ারের লক্ষণাক্রান্ত। কীভাবে পূর্ণতর পালা আবার দেখা দেবে, আঙ্গিক ও অন্তর্লীন ভাবের গভীরতর মিলন ঘটবে। কোন্ সেই লেখক বাংলা কবিতাকে চৈতন্যের প্রকল্পে তুলে ধরবেন কেউ তা জানি না।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ কাল: খসড়া (১৯৩৮), এক মুঠো (১৯৩৯), মাটির দেয়াল (১৯৪২), অভিজ্ঞান বসন্ত (১৯৪৩), দুরযানী (১৯৪৪), পারাপার (১৯৫৩), পালাবদল (১৯৫৫), ঘরে ফেরার দিন (১৯৫৫)।

চিন্তিত মানুষ

"এবারের দিনচক্র প্রতিহত মাধুরীর ভারে
যখন একলা বুকে শেষ হয় আহ্নিক সন্ধ্যায়,
আকাশ বলে না কথা, সোনার গম্বুজে
গলির কোনার বাড়ি উদ্ভাসিত ডাকে না বন্ধুকে,
সবুজ দরজা নিরুত্তর—
মাথা নেড়ে বলি, এই, এই তো হয়েছে পৃথিবীতে।

"কতদিন ধ'রে হ'ল।
প্রবল আকুল বাসনায়
ধুধু করে প্রাণ, সেই দাহে
ইতিহাস দর্জা খুলে ধুলো-পথ দেখায় মিশরে
পিরামিড ছায়ায় প্রাচীন
যুবা ব'সে আছে নীল নদীর ওপারে কাকে চেয়ে;
অনাত্মীয় শস্যক্ষেতে রুথ সেই কান্নাচোখে চলে
জুডিয়ার নির্বাসিতা নারী,
সব গেছে ঘরহীন তার;
চৈন কবি লয়াং-এর শৈলগুহাগাত্রে হাত রেখে
চিন্তিত মানুষ,
প্রেয়সীর স্পর্শরূপা চন্দ্রমা-তৃষিত বক্ষে নিয়ে
ঐশ্বর্য যুগের এশিয়ায়।
ক্ষুধার্ত যৌবনভারে ডুবে আছে,
চুম্বন কম্পন শিরা, আরো বেশী ঐকান্তিক
সত্তার সমগ্র মেলে ভাবে পরমাকে
চেকুয়ানে যে গিয়েছে যুগজন্ম পরপার;—
এই হয়েছিল, শোনো, কতদিন ধ'রে হ'ল,
মানুষ, তোমার ভাগ্যে।
"অতখানি পূর্বলেখ প্রথমে দুঃসহ ধারণায়,
পরে তারি সখ্যতা বিরহপাত্রের উচ্ছলিত
তৃষ্ণার অতীত সুধা দাও তুমি, হে প্রেয়সী,

কারুণ্যে নিঃসঙ্গ মাঙ্গালিকে;
নিয়েছি তা বন্ধ দরজায়;
চলেছি গলির পথে সোনার গম্বুজ পার হ'য়ে।

"মুক্তি-পথ আছে, ভ্রামণিক,
দূরে চ'লে গিয়ে পাওয়া;
পাঠালে সে বিশ্ব-দ্বারে, হে সুন্দরী।
রেঙ্গুনে বিরাট শান্ত পাথর চত্বর
নির্নিমেষ বৌদ্ধ ধ্বনি, রঙিন প্রবাহ
সোয়ে-ড্যাগনের পাশে, সিঁড়ি বেয়ে
জনস্রোত অচেনায় দিলে পূর্ণ দান।
ফ্লরেন্সে ব্রিজের কাছে দাঁড়াই প্রবাসী থাম ধ'রে
বিয়াত্রিচে-লগ্ন চোখে, কফি খাই শেষে
পাশের কাফেতে ব'সে, ফিয়েজোলে ঊর্ধ্বে মেঘে গাছে
স্বর্গবাস আভাসিত—
দেখি বন্ধ জানালায়।

"মরুধ্যান আবাদান, নির্মম বালির ছুরি কাটে
কঠিন সমুদ্রনীল, উট-ঘণ্টা ধমনীতে;
তৃপ্তি পাই রৌদ্রপ্লেন তাতে চ'ড়ে
কল্পনায় ফিরে-আসা, জানি না কোথায়।
কত বড়ো এ-প্রতীক্ষা, শবরীর জীবন-দাহন
আমি, নর, মানি তার হ'য়ে দিনে-দিনে
দ্বীপান্তরে গিয়ে সারা দীর্ঘ বেলা দাঁড়াই যখন
প্রশ্নচিহ্ন নারিকেল ক্রন্দন-উদ্বেল কিনারায়,
অতলান্ত ঘেরা ক্ষুদ্র গ্রেনাডিনে
পশ্চিম ইন্ডিসে।

"ঘরে-ফেরা হাওয়া
সিন্ধু-শকুনের শাদা পাখার চঞ্চল প্রতীকে,
ক্লান্তির কপোল ছোঁয়;
হয়তো তীরে বাড়ি নেই, তবু ভরসায়
ভালোবাসা পায় ঘর।
সুখী হওয়া প্রাণ সুখে, হৃদয়ে যেমনি লগ্ন হোক্,
মানুষ তোমার ভাগ্য এই,
বসুন্ধরায়।
"যেখানেই থাকি তাই বার্তা পাবে, চির-আকাঙ্ক্ষিতা,
দিয়েছ শূন্যতাপূর্ণ চক্ষের আহ্বান
সর্বকাল পথিকের চিরলোকে;
পেয়েছে প্রণতি,
অলিভ-বন্দিত তট স্বর্ণছাত গলিতে তোমার॥"

মনীশ ঘটক
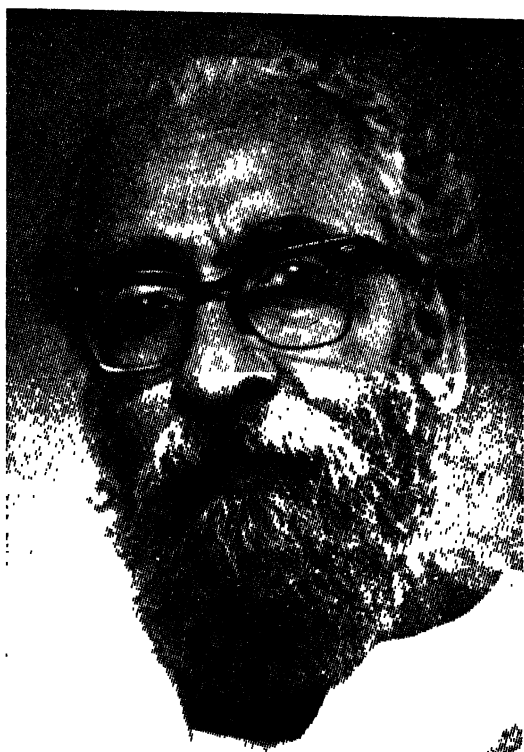
কবি মনীশ ঘটকের চেহারার মতোই তাঁর কবিতা ঋজু এবং বলিষ্ঠ।। তীক্ষ্ণ বাগ্‌রীতি, বক্তব্যের সাবলীলতায় তাঁর কবিতা ভাস্বর। চিত্রকল্পে পারদর্শী এই কবির অনায়াস কথন-ভংগীতে সমাজ, যন্ত্রণা বিশেষভাবে পরিস্ফুট। কল্লোলের প্রথম সারির আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এই কবি এখনো কবিতায় অনলস সাধনায় ব্রতী।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: রাজসাহী, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০২, রবিবার। **জীবিকা:** আয়কর বিভাগে ব্যবহারজীবী। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা, প্রকাশ সন, কবিতাটি কোন্ পত্রিকায় মুদ্রিত:** 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামে 'কল্লোলে'

গল্পলেখক হিসেবেই পরিচিত। ১৯২৪ থেকে সবরকম লেখা বন্ধ। ১৯৩০/৩১ সাল থেকে স্ব-নামে কবিতায় আত্মপ্রকাশ। প্রথম কবিতার নাম মনে নেই—হয় বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রে, না-হয় 'প্রবাসী'তে, না-হয় 'সুধীন দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়ে' প্রথম কবিতা ছাপা হয়। ১৯৩০-৩১ আনুমানিক সময়-সংকেত, দু-এক বছর পরও হতে পারে। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** ঋগ্বেদ, রবীন্দ্রনাথ, ভাওয়ালের গোবিন্দ দাস। **সবচেয়ে প্রিয় বিদেশী কবি:** পুরোনোদের মধ্যে অনেকেই। পরবর্তীদের মধ্যে উইলফ্রেড ওয়েন, এলিয়ট, এজরা পৌন্ড, এডিথ সিট্‌ওয়েল, প্যাবলো নেরুদা, লর্কা, ফ্রস্ট—এবং সাম্প্রতিক কোনো কোনো আফ্রিকান কবি। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** সার্থক কবি মাত্রেই সত্যদ্রষ্টা এবং জনকল্যাণের বর্তিকাবাহী। তাঁদের রচনা অপৌরুষেয়, সর্ববিধ সংস্কৃতির ধারাবাহক। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** যুগপৎ কোমলতা ও শক্তিমত্তা জীবনে কবিতাই আনতে পারে অন্তরতমের সাধনা দ্বারা। এককে বহু বহুকে এক কবিই দেখতে পান, কবিতার ক্ষেত্রে তাই সার্থক কবির প্রভাব অপরিসীম। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি—কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:** 'একটি বিশাল গাছ'। ১৯৬১ সালে রচিত, এবং প্রবাসী'র ষষ্ঠিতম বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** সব দেশের ভাষা জানি না, ইংরেজির মাধ্যমে রসাস্বাদন করে থাকি। আধুনিক বাংলা কবিতার স্থান সর্বশীর্ষে মনে করি। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** উজ্জ্বল ও ভয়াবহ। গ্রেশামি কানুন কাব্যসাহিত্যে সংক্রামিত হবার লক্ষণ অপ্রকট নয়।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ কাল: 'শিলালিপি' (১৯৪০), 'যদিও সন্ধ্যা' (১৯৬৮)
সম্পাদিকা পত্রপত্রিকা: ১৯২৪, অতিথি (ত্রৈমাসিক, ঢাকা থেকে)।
১৯৫৫ থেকে ১৯৭০, বর্তিকা (ত্রৈমাসিক, বহরমপুর থেকে)।

একটি বিশাল গাছ

প্রভঞ্জন হার মানে। গোঙায় নিষ্ফল রোষে
বিদ্যুৎগর্ভ বারিবাহ। সুতীক্ষ্ম ফলকাঘাতে
দীর্ণ করে দিগঙ্গন লক্ষজিহ্ব শাণিত বিজলী।
অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতু আত্মঘাতী পরিক্রমা শেষে
অন্তরীক্ষে হয় অন্তর্ধান। এত রঙ্গ. কে সে দেখেছে?
একটি বিশাল গাছ মাথা যার আকাশে ঠেকেছে।

অসংখ্য শেকড়গুলো অগণন শিশুর মতন
মাটির বুকের রস যুগে যুগে করেছে শোষণ।
গাছ বহু বাহু মেলে ডালে ডালে পাতায় পাতায়
নগ্না প্রকৃতিরে দৃপ্ত আসঙ্গের আহ্বান পাঠায়।
উচ্চশির, মানে না সে ঝড় ঝঞ্ঝা গ্রীষ্ম বর্ষা হিম
শুধু দেখে, আরো কত—কত দূরে অনন্ত নিঃসীম!

অগ্ন্যুৎগার, ভূকম্পন, সর্বনাশা প্রলয় প্লাবন,
ভূগর্ভের স্তরে স্তরে সঙ্গোপনে কত বিবর্ত্তন
পারেনি তাহারে আজও অঙ্কশায়ী করিতে ধূলায়
সে বিরাট, সে মহান, স্বতন্ত্র সে মৌন মহিমায়।
ধ্যান নেত্রে দেখে শুধু সাগরের অশ্রান্ত লহর
অভ্রংলিহ গিরিরাজ—সেই শুধু তাহার দোসর।

অলঙ্ঘ্য করাল কাল। লক্ষকোটি বর্ষপরে হের
নাগলোকে কৃষ্ণকায় অঙ্গারের স্তূপ, খনিকের
যন্ত্রাঘাতে জীর্ণ পঞ্জরের হাহাকার। বিষধর
সর্পশীর্ষে হীরাখণ্ড দ্যুতি ঝলমল। জাতিস্মর
অর্ধ সুষুপ্তির অঙ্কে স্বপ্ন দেখে মগ্নচৈতন্যেতে
একটি বিশাল গাছ মাথা যার আকাশে ঠেকেছে॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাংলা কবিতার সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাকে বিস্তৃত ও প্রসারিত করার অভীপ্সা নিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় জয়যাত্রা। মানুষের বাঁচার সংগ্রাম থেকে সুরু করে দেশের কবিতায় রাজনীতি, সমাজ বিচিত্ররূপে রূপায়িত হয়েছে। নিরন্তর পথের সন্ধানী প্রেমেন্দ্র মিত্র সর্বস্তরেই এক নতুন মানুষ, নতুন এক ভূখণ্ডকে উন্মোচন করে ধরলেন। কল্লোল, কালিকলমের ওই দুর্ধর্ষ প্রতিভা, নবনব চিন্তাধারায় বাংলার কাব্য আন্দোলনকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কবিতায় প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই প্রাজ্ঞ প্রবীণ, নানা বিবর্তনের মাঝেও নবীন। সজীবতা, জনপ্রিয়তা তরুণদের কাছে আজও ঈর্ষণীয়।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা : বারাণসী, ১৯০৪/১৯০৫ সেপ্টেম্বর, ৫৭, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-২৬। **জীবিকা:** লেখা। **প্রথম প্রকাশিত**

কবিতা: 'দ্বার খোল দ্বার খোল রাত্রির প্রহরী'। **প্রকাশ সন:** ১৯২৬ (?)। **কবিতাটি যে পত্রিকায় মুদ্রিত:** কল্লোল। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** অনেকের। মাইকেল মধুসূদন, নবীন সেন, রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, সত্যেন্দ্র দত্ত, যতীন সেনগুপ্ত। **প্রিয় বিদেশী কবি:** সবচেয়ে প্রিয় কাউকে বলা উচিত নয়। প্রিয়দের মধ্যে এ'রা আছেন—আগের যুগের কীটস, শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্রাউনিং, হুইটম্যান। এযুগের মধ্যে—এডিথ সিটওয়েল, এজরা পাউন্ড, রবার্ট গ্রেভস। রুশ কবিও দু-একজন। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** অত্যন্ত মূল্যবান। কবি গতিশীল সমাজের শুধু মুখপাত্র নয় তার নিয়ন্ত্রকও বটে। সংস্কৃতি একটা জীবনবিচ্যুত বিলাস যে নয় তা প্রমাণ করবার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব কবিদের। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** আগের উত্তরেই যা বলেছি তাই বলবো। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায় রচিত। কোথায় প্রকাশিত:** অপ্রিয় কবিতাই খুঁজতে হয়। সংকলনের জন্যে যেটি দেওয়া হ'ল সেটি বছর পাঁচেক আগে প্লেনে আতলান্তিক পার হতে হতে মাথায় আসে, পরে লিখে ফেলি। 'অথবা কিন্নর' বইটিতে আছে। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** আধুনিক মানে সমসাময়িক যে নয় সেইটেই আগে স্পষ্ট হওয়া দরকার। আধুনিক অর্থে যে কবিরা গতানুগতিকতার বন্ধন ভাঙবার চেষ্টা করছে তা বুঝলে কাব্যজগতে তার একটা স্থান চিরকাল থাকত। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** সৎ কবিতা হলে উজ্জ্বল নইলে অন্ধকার।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: কখনো মেঘ (১৯৬১), জোনাকিরা (১৯৫৪), প্রথমা (১৯৩২), ফেরারী ফৌজ (১৯৪৮), প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৩), সম্রাট (১৯৪০), সাগর থেকে ফেরা (১৯৫৬), হরিণ-চিতা-চিল (১৯৬০) অথবা কিন্নর (১৯৬৭)। শ্রেষ্ঠ কবিতা—২য় পর্যায় (১৯৭০)।

সম্পাদিত সংকলন: প্রেম যুগে যুগে [১৯৪৯] শতাব্দী শতক [যুগ্ম-সম্পাদক ১৯৬১]

পত্র-পত্রিকা: কবিতা (১৩৪২), যুগ্মভাবে। নিরুক্ত।

মুখ

একটা মুখ কাঁদায় হয়ে শীতের রাতে পথে অনাথ শিশু,
মেলায় বাজিকরের খেলায় একটা মুখ মুখোশ পরে' হাসায়।
খেয়ার নায়ে ওপারে যেতে কবে যে কোন ভিড়ে
একটা মুখ এক নিমেষে অকুল স্রোতে ভাসায়!
কার সে মুখ কার?
জানে কি তারা-ছিটোন অন্ধকার!

সে মুখ যারা দেখেনি তারা জানেনা জ্বালা নিদান যার নেই।
শীতের দিনে পোহায় রোদ উঠোনে বসে আরামে কাঁথা গায়;
ঝুমকো লতা দেয়ালে তোলে, মরাই রাখে ভরে',
ফল কি ফুল পাড়তে শুধু নাগাল ডাল নামায়।
হোক সে মুখ যার,
অনিদ রাতে কাঁপে না অন্ধকার।

সে মুখ যার পড়েছে চোখে ঘরে-ই থাকে যায় না সেও বনে,
বসত করে পাঁচিল ঘিরে, হিসেব করে' পুঁজি যা আছে ভাঁড়ায়।
তবুও কোন হতাশ হাওয়া একটা ছেঁড়া ছায়া
তারার ছুঁচে সেলাই করে' রাত্রি জুড়ে টাঙায়।
কার সে ছায়া, কার?
প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণার।

অজিত দত্ত

রবীন্দ্রোত্তর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘসময় ধরে অগ্রজ কবি অজিত দত্তের কাব্যের বিস্তার। প্রকৃত অর্থে সৎ-কবিতার সাধনায় অজিত দত্ত বাংলাসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। বিদগ্ধ ব্যক্তিমানস, অসামান্য বাচনভঙ্গীতে প্রেমের কবিতায় বিশেষ সুর সংযোজনে মূর্ত করেছেন। তাঁর লিরিক কবিতা—বায়ুস্রোতে খসে পড়া পালকের মতো ব্যঞ্জনাময়—যেখানে কবি বলেন—আকাশের শূন্য নীলে মোর কাব্য লিখি অবিরত/সে আকাশ তোমার অন্তর/ মালতী/তোমার মনে রাখিয়াছি আমার স্বাক্ষর।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: ঢাকা [বসতবাটি] আসকলাল লেন, ১৯০৭, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯। **জীবিকা**: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলার অধ্যাপক। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা**: তখন আমি ইন্টারমিডিয়েট পড়ি, নাম মনে পড়ছে না। **প্রকাশ সন**: ১৯২৫ সাল মনে হয়। **কবিতাটি কোন্ পত্রিকায় মুদ্রিত**: মানসী। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: কেউ কেউ বলেন দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রভাব আমার কবিতায় পড়েছে, আমি অস্বীকার করি না। **প্রিয় বিদেশী কবি**: প্রথম জীবনে

কেউ কেউ, পরবর্তী যুগে আরও কিছু কবি স্বাভাবিকভাবেই ভালো লেগেছিল, তাদের মধ্যে—ওয়াল্টার, ডিলমেয়ার হাউসম্যানকেই বাছা যেতে পারে। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা এতই স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজনস্বীকৃত যে, এ-বিষয়ে বিশেষ করে কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। কবিতা প্রচার করে না, ঘোষণা করে না, তবু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব সবচেয়ে বেশী। কারণ কবিতার ভাব ও চিন্তা, আবেগ ও অনুভূতি এমন প্রগাঢ়ভাবে পাঠকের চিত্তকে স্পর্শ করে যে তা জাতির মনকে একটি উচ্চ সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। এবিষয়ে অনেক কথাই বলা হয়েছে, কাজেই বিস্তৃত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব [?] স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি: কবে, কোথায় রচিত। কোথায় প্রকাশিত:** রাজা। ১৯৪৬ সালে 'পুনর্ণবা' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ হয়েছিল। আমার সমগ্র কবিতা থেকে একটি কবিতা নির্বাচন করে দেওয়া আমার পক্ষে অসুবিধা। তবে 'রাজা' নামক কবিতাটি আমি সম্পাদককে ছাপতে অনুরোধ করেছি। এই সনেটটি নির্বাচন করবার কারণ এই যে এই ধরনের কবিতা আমি বেশ কিছুসংখ্যক লিখেছি এবং লিখতে আমার ভালোই লাগে। এ কবিতায় যে বিষয়টি বলা হয়েছে তা এযুগে পাঠকের পক্ষে অপ্রীতিকর হবে না, এই আশায় কবিতাটি নির্বাচন করলাম। আমার অন্যধরনের কবিতার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা এটিতে একটু নতুনত্বের স্বাদ পাবেন। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** আধুনিক কবিতা বলতে যদি সাম্প্রতিক কবিতার কথা বলা হয়ে থাকে, তবে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এর স্থান নিরূপণের সময় এখনো এসেছে বলে মনে করি না। সাম্প্রতিক কবিতার টেকনিক নিয়ে নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, প্রকাশের পদ্ধতি চিত্রকল্প প্রভৃতি নানা অলঙ্কারের নূতন প্রয়োগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কবিতার নব রূপায়ণের প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে কিছুসংখ্যক কবিতা সার্থক হয়ে উঠেছে এবং এই সার্থকতার মধ্য দিয়ে কবিতার নূতন পথ তৈরী হচ্ছে। যা খাঁটি কবিতা, পুরাতন হোক বা সাম্প্রতিক হোক, তা কবিতাই। কাব্যের ইতিহাসে তার বিশেষ স্থান আছে, যেমন আছে মানুষের মনে। কিন্তু কবিতা রচনার পদ্ধতি ও ভঙ্গি যুগে যুগে পরিবর্তিত হয় সে হিসাবে সাম্প্রতিক কবিতাও অভিনন্দনযোগ্য বই কি? তবে বর্তমানে এই পরীক্ষা যেমন ব্যাপক, সার্থকতা অনুযায়ী লাভ হচ্ছে কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** এ কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এটুকু বলা যায় যে—সাম্প্রতিক কবিতার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে বাংলা কবিতা আরও বলিষ্ঠ ও সুন্দর হয়ে উঠবার সম্ভাবনা নেই, এমন নৈরাশ্যজনক মনোভাব আমি পোষণ করি না।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ কাল: পাতাল কন্যা (১৯৪০), নষ্টচন্দ্র (১৯৪২), পুনর্ণবা (১৯৪৭), ছায়ার আলপনা (১৯৫১), জানালা (১৯৫৯), ছড়ার বই (১৯৬১), কবিতা সংগ্রহ (১৯৬৪), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭০)।

রাজা

জরি আর পুঁতি গাঁথা জমকালো চোগা-চাপকানে
জাঁদরেল চেহারায় পার্ট করে যাত্রার রাজা;
উষ্ণীষ-আভরন সবি আছে আয়োজন যা-যা,
রাজসিক হাবভাব, রাজকীয় চাল সবি জানে।
ভোর হলে এই সাজ ফিরে যাবে ভাড়ার দোকানে,
ঘরে আছে হেঁটো ধুতি, কড়া সাজ দু'ছিলিম গাঁজা
হুকুমের জরু আছে, আছে তাড়ি আর তেলেভাজা,—
আরেক রাজার পার্ট—ভাষাটা তফাৎ, একই মানে।

কিছু জেতে বীররসে, কিছু কিছু করুণ রসের
বিগলিত অভিনয়ে আসর-বাসর করে মাত,
জীবনের পালাগানে মেডেল ইণাম নেয় জিতে
কখনো নিজের ঢাকে নেশা দিয়ে, কখনো জরিতে,
যত মিছে অভিনয় তত তার পাবার বরাত
কেননা সে জেনে গেছে সিধে পথ দেশের-দশের।

বুদ্ধদেব বসু

রবীন্দ্রত্তোর বাংলা কবিতার অন্যতম নায়ক বুদ্ধদেব বসু একদিকে যেমন কবিতায় নতুন মুখ সংযোজন করেছেন, অপরদিকে কবিতায় নিজেকে প্রাজ্ঞ থেকে প্রাজ্ঞতর করেছেন। বিদগ্ধ কবি বুদ্ধদেব বসু চিরতরুণ। বালা কবিতার এই নেতা কোন কাব্যগ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে গুরুদেব বলেছিলেন—এ যেন একটা দ্বীপ, এ দ্বীপের বিশেষ একটা আবহাওয়া ফল ফুল ধ্বনি বন। বুদ্ধদেবের কবিতাই তাঁর ভাষা। দীর্ঘ কাব্যের সড়ক বেয়ে আজও বুদ্ধদেব বসু নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সচেষ্ট। একজন প্রবীণ কবি এভাবেই উদাহরণ হয়ে থাকেন।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: কুমিল্লা, ১৯০৮, নাকতলা, কলকাতা। **জীবিকা**: সাহিত্য। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা**: নাম মনে নেই। **প্রকাশ সন**: মনে নেই। আমার বয়স তখন আট বা নয়। **কবিতাটি কোন্ পত্রিকায় মুদ্রিত**: 'তোষিণী' ঢাকা। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: অনেকেরই। **প্রিয় বিদেশী কবি**: অনেকে। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: প্রশ্নটি বুঝলাম না। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: গবেষণার বিষয়। **স্বরচিত প্রিয়**

কবিতাটি: কবে, কোথায় রচিত। কোথায় প্রকাশিত: এক নয়, অনেক। বা কোনো-টাই নয়। তবে 'ইলিশ' নিতে পারেন। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: সেটা আরো পঞ্চাশ বছর পরে বোঝা যাবে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: ভবিষ্যতে জানা যাবে।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: উক্তি—গবেষণার বিষয়।
এক পয়সার একটি (১৯৪২), মর্মবাণী (১৩৩১), একটি কথা (১৯৩২), কঙ্কাবতী (১৯৩৭), দময়ন্তী, দ্রৌপদীর শাড়ি ও অন্যান্য কবিতা (১৯৬৩), নতুন পাতা (১৯৪০), পৃথিবীর পথে (১৯৩৩), বন্দীর বন্দনা ও অন্যান্য কবিতা (১৯৩০) বাইশে শ্রাবণ (১৯৪২) বারোমাসের ছড়া (১৯৬৫), বিদেশিনী (১৯৪৩), যে আঁধার আলোর অধিক (১৯৫৮), রূপান্তর (১৯৪৪), শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর (১৯৫৫), মরচে পড়া পেরেকের গান (১৯৬৬), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৩), শ্রেষ্ঠ কবিতা ২য় পর্যায়—(১৯৭০)।
কাব্য-নাটক: তপস্বী তরঙ্গিণী (১৯৬৬)।
সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা: কবিতা (১৯৩৫)।
সংকলন: আধুনিক বাংলা কবিতা (১৩৬০)।

ইলিশ

আকাশে আষাঢ় এলো; বাংলাদেশ বর্ষায় বিহ্বল।
মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে তীরে নারিকেল সারি
বৃষ্টিতে ধূমল; পদ্মাপ্রান্তে শতাব্দীর রাজবাড়ি
বিলুপ্তির প্রত্যাশায় দৃশ্যপট-সম অচঞ্চল।

মধ্যরাত্রি মেঘ-ঘন অন্ধকার দুরন্ত উচ্ছল
আবর্তে কুটিল নদী; তীর-তীব্র বেগে দেয় পাড়ি
ছোট নৌকাগুলি; প্রাণপণে ফেলে জাল, টানে দড়ি
অর্ধনগ্ন যারা, তারা খাদ্যহীন, খাদ্যের সম্বল।

রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধকালো মালগাড়ি ভরে
জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি রাশি ইলিশের শব
নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর পাহাড়।
তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে ঘরে
ইলিশ ভাজার গন্ধ; কেরাণির গিন্নির ভাঁড়ার
সরস সর্ষের ঝাঁজে। এলো বর্ষা, ইলিশ-উৎসব।

বিষ্ণু দে

কঠোর বিচারে রবীন্দ্রোত্তর যুগের পুরোধা কবি বিষ্ণু দে। লোকায়ত চেতনার গভীরতার সংগে কবিতার নান্দনিক রূপ-কে মেলানো তাঁর আজীবনের অন্বিষ্ট। বিষ্ণু দে বিশ্বাস করেন রাজনৈতিক উপলব্ধি ছাড়া শিল্প বা জীবনের মুক্তি নেই। বহু পঠনশীলতা, আবেগ, স্মৃতি-বাদি অস্তিত্ব-বোধ এবং প্রত্যয়সিদ্ধ দার্শনিকতার গভীরতম সমাহারে তাঁর কবিতা। এক কথায় বলা চলে বিষ্ণু দে বাংলা কবিতার দীর্ঘ পদযাত্রায় একটি মাইল স্টোন।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: কলকাতা। ১৯০৯। কলকাতা। **জীবিকা:** অবসরপ্রাপ্ত। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** ঠিক মনে নেই। **প্রকাশ সন:** ঠিক মনে নেই। **কবিতাটি কোন্ পত্রিকায় মুদ্রিত:** হয় "প্রগতি" না হয় "বিচিত্রা"। **প্রথম**

জীবনে কাঁর কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল: রবীন্দ্রনাথ। **প্রিয় বিদেশী কবি :** দান্তে ও শেক্সপিঅর্। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা :** যথার্থ কিন্তু সামাজিক অর্থে বোধহয় গৌণ। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব :** প্রচুর ও গভীর। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি:** অন্বিষ্ট ও সেই অন্ধকার চাই। **কবে, কোথায় রচিত। কোথায় প্রকাশিত:** ১৯৪৯/৫০, কলকাতা সাহিত্যপত্র, পরে অন্বিষ্ট নামক বইতে। 'সেই অন্ধকার চাই'য়ে দ্বিতীয় কবিতাটি মুদ্রিত। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** কবিদের কাছে উচ্চ, বাজারে তেমন নয়। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** আধুনিক সাহিত্যের মতোই।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: অন্বিষ্ট (১৯৫০), উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩৩), চোরাবালি (১৯৩৭), তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ (১৯৫৮), নাম রেখেছি কোমল গান্ধার (১৯৫৯), স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ (১৯৪১), বাইশে জুন। বিষ্ণু দে'র শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৫), সন্দীপের চর (১৯৪৭), সাত ভাই চম্পা (১৯৪৪), সেই অন্ধকার চাই (১৯৬৭)।
সম্পাদিত সংকলন: এ কালের কবিতা (১৯৬৩)।
পত্র-পত্রিকা: নিরুক্ত।

সেই অন্ধকার চাই

ঘন বন, বহুদূর-বিস্তৃত এবং জন্তুতে ভয়াল,
বহু সরীসৃপ, গুপ্ত হভ্যার আড়ত, অন্ধকারে তীক্ষ্ম অন্ধকার,
হিংস্র চিতা নেকড়ে আর হায়েনা, শেয়াল
বিশ্বাসঘাতক বহু জন্তুতে ভয়াল।

থেকেছি সে-বনে, নীল আকাশ দেখিনি,
নিশ্বাসে টেনেছি ভিজা মাটির মস্তিতে
বাষ্পময় প্রকৃতির অসুস্থ বাতাস
যে-বাতাসে অন্ধকারে স্বভাবত ফুলে ওঠে গোখরো, ময়াল।

থেকেছি বুর্জোয়া বহু দেশে গ্রামে শহরে বস্তিতে,
বহু জন্তু সরীসৃপ কাজ করে, করে বিকিকিনি;
দিবা-দ্বিপ্রহরে ঢাকে কালোয়ায়া হৃদয়ে হৃদয়ে
অন্ধকার দিয়ে ঢাকে লালদীঘির লাল অন্ধকার।

অন্য অন্ধকার আছে! তাও চেনা, থেকেছি নিবিড়
ঘন নীল অন্ধকারে, স্পন্দমান ছন্দে অতল স্মৃতির হর্ষ ভয়ে
কাব্যের আদিম গর্ভে যেখানে করেছে মহাভিড়

লক্ষ-লক্ষ জীবন-মৃত্যুর ক্ষিপ্র দিব্য অন্ধকার;
থেকেছি যে-অন্ধকারে, সেই অন্ধকার চাই শরীরে, হৃদয়ে।
সেই বনে হিংস্রতার স্বাভাবিক, সৃষ্টিময়, মধুর দয়াল;
মৃত্যু নয় দীনহীন, আপাতিক, নয় সামাজিক ভয়ে
অথবা হাজার জন্তুর দন্তুর নখী মানবিক শোষণে ভয়াল॥

অরুণ মিত্র

মহৎ কাব্যগুণের বহুল লক্ষণাক্রান্ত অরুণ মিত্রের কবিতা। বিদেশী আঙ্গিক সংহতির সঙ্গে দেশজ চেতনার এমন মণিকাঞ্চন যোগ খুব কম কবির রচনায় বিধৃত হয়েছে। মানুষের সংগ্রাম ও শ্রমকে রাজকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার সফল প্রয়াস তার কবি-কর্মে। বৈদগ্ধ তাঁর কাব্যের বোঝা নয়, সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মতো স্বাভাবিক।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: যশোর; নভেম্বর ১৯০৯; ১৮ডি, জওহরলাল নেহরু রোড, এলাহাবাদ-২। **জীবিকা:** অধ্যাপনা। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা, প্রকাশ সন এবং কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:** নাম মনে নেই। প্রকাশ সনও মনে নেই। আমার বয়েস যখন ১৫ বা ১৬ বছর তখন কবিতাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকার নামও ভুলে গেছি, শুধু এইটুকু মনে আছে যে সেটি ছিল কিশোরদের পত্রিকা এবং বাংলার কয়েকজন বিপ্লবী তার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। **প্রথম জীবনে কার কবিতা উদ্বুদ্ধ করেছিল:** রবীন্দ্রনাথের কবিতাই আমাকে এই পথে টেনে আনে। **প্রিয় বিদেশী কবি:** কোনো একজনের নাম করতে পারি না। তাছাড়া, কেউ

কি চিরকালের জন্যে সবচেয়ে প্রিয় হয়ে থাকেন? রবীন্দ্রনাথই কি আর আগের মতো আমার প্রিয় আছেন? কালক্রমে অবস্থাক্রমে ভালো লাগার হেরফের হয়। অন্তত আমার হয়েছে। যেমন, প্রথমে এলিয়টকে খুব ভালো লাগত, পরে তেমন লাগত না। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে বোদল্যার ও র‍্যাঁবোকে ভালো লাগতে আরম্ভ করে; কিন্তু বোদল্যার ছাঁটাই হয়ে র‍্যাঁবোই থেকে যান। এলুয়ারকে ভালো লাগে, কিন্তু তাঁকে আজ ছাড়িয়ে চলেছেন স্যাঁ-ঝ্যুন প্যার্স। এখন আবার দেখছি Fou d'Elsa-র আরাগঁ আমাকে মুগ্ধ করছেন। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ঘটানোর ব্যাপারে কবির ভূমিকা কি, প্রশ্নের এই অর্থ ধরে নিয়ে উত্তর দিচ্ছি।—সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির আলাদা কি ভূমিকা হতে পারে জানি না। সাহিত্যসৃষ্টি জাতির সংস্কৃতিকে উন্নত করে বলে যদি মেনে নিই, তাহলে কবি কেন বিশেষভাবে উল্লেখ্য হবেন? বরং বর্তমানকালে গল্প-উপন্যাস-নাটক লেখকদের গুরুত্ব এ-বিষয়ে বেশী, কারণ সর্বসাধারণের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ আরও বেশী। অনেক বেশী লোক তাঁদের লেখা পড়ে বা শোনে। অবিশ্যি রবীন্দ্রনাথের মতো কবির আবির্ভাবে অবস্থাটা অন্যরকম হয়। তখন কবিতায় আগ্রহী না হয়েও অনেকে কবিতা পড়ে কিম্বা কবিতার বই সামনের তাকে রাখে। তাতে পরোক্ষ একটা প্রভাব পড়ে: কথা ধার করে কথা বলা যায় এবং পাড়ায় পাড়ায় মণ্ডপ সাজিয়ে উৎসব করা যায়। কিন্তু তাকে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি বলতে বাধে। আমি মনে করি সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সামাজিক অগ্রগতির অন্তর্গত। অধিকাংশ মানুষ যদি লেখাপড়ার সুযোগ না পায়, বই কেনার বদলে চালডাল কিনতেই নাজেহাল হয়, তবে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি কি করে হতে পারে এবং কবিরই বা বিশেষ কি ভূমিকা থাকতে পারে? **স্বরচিত প্রিয় কবিতা: কবে কোথায় রচিত, কোথায় প্রকাশিত**: কোনো একটি কবিতাকে আমার প্রিয় বলা সম্ভব নয়। নিজের কোনো কোনো কবিতা আমার ভালো লাগে, কোনো কোনো কবিতা পছন্দ হয় না। যে সব কবিতা আমার ভালো লাগে তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট তিনটি কবিতার নাম করছি 'চতুরঙ্গ', প্রবাসে, পোল পার হওয়ার সময়। সন তারিখ আমার মনে থাকে না, লিখেও রাখি না, সময়ের আন্দাজ মোটামুটি দিতে পারি। বছর বাইশ আগে 'সাহিত্যপত্রে' প্রকাশিত কলকাতায় রচিত **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান** : বাংলা দেশে দেখি কবিরাই সবচেয়ে বেশী অনুসন্ধিৎসু। তাঁরা নানা বিষয়ে খোঁজখবর রাখেন, পড়েন, আলাপ-আলোচনা করেন। অর্থাৎ পৃথিবীর সাহিত্যস্রোতের মধ্যে তাঁরা থাকেন। বিভাগের তুলনায়। কিন্তু তা থেকে কিছু গড়ে উঠছে কিনা সেটা স্বতন্ত্র কথা। কারণ, সাহিত্য সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করা এবং অন্যান্য সাহিত্যের দ্বারা অনু-

প্রাণিত বা বিপর্যস্ত হওয়া এক কথা আর মাটি, মানুষ ও সময়কে ছুঁয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা অন্য কথা। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: কবিতা বলতে আমরা এখন যা বুঝি, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আধুনিক বা অনাধুনিক যাই হোক। কোনো সমাজ-ক্রিয়ার অথবা অন্য কোনো শিল্পের আশ্রয়ে হয়তো তার একটা ভূমিকা ভবিষ্যতে তৈরী হবে। নইলে কবিরা এবং তাদের কিছু বন্ধু-বান্ধব ছাড়া আর কেউ কবিতা নিয়ে মাথা ঘামাবে বলে মনে হয় না। যারা বই পড়তে পারে তাদের মধ্যে কয়েকজন বাদে বাকীরা যদি কবিতা পড়তে না চায়, তাহলে কি বলব? পাঠকদের গলদ, না, কবিদের? সব দোষ পাঠকদের ঘাড়ে চাপিয়ে স্বস্তিবোধ করতে আমি অসমর্থ। গাঁয়ে যখন মানছে না তখন আপনি মোড়ল সেজে লাভটা কী? কবিদের ভরসা পাবার একমাত্র কারণ তো আপাতত এই দেখছি যে, কোনো একদিন কলেজের মাষ্টারমশাইরা হয়তো তাঁদের কবিতা ক্লাসে ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: প্রান্তরেখা (১৯৪৩), উৎসের দিকে (১৯৫৪), উৎসের দিকে (পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৫৭), ঘনিষ্ঠ তাপ (১৯৬৩)।
সম্পাদিত পত্রিকা: অরণি (সম্পাদকীয় তত্ত্বাবধানের ভার ছিল আমার উপর)।

চতুরঙ্গ

উৎকর্ণ

রুদ্র এক রাত্রি ঠেলে বিহঙ্গের ডানা
শব্দের রেখায় পথ পথান্তর পার হয়,
বুকচাপা ঘরের ভিতর
শিহরায় আশা স্বপ্ন অন্ধকার উন্মুখ জঠর;
নিথর উৎকর্ণ জাগি
কখন মিলবে তারা
ভোরাই রক্তের সুরে জীবনের প্লাবনের রোলে।

বাঁধ

এ নির্মম নদী
সাপের মতন ফোঁসে, লোহার নিশ্বাসে দিনভর
থমথম কালো মেঘ, অরণ্যের ভয়
তীরে তীরে চেপে বসে, জিঘাংসার দাঁত

কুরে নেয় মধুমুল;
আমাদের হাতগুলি জোড়া লাগে দুঃসাহসী বাঁধে,
মৃত্যুর শপথে উচ্চকিত দুর্দম বিস্তার।

স্বাক্ষর

শহরের পাথরের গায়ে দিলাম স্বাক্ষর,
লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ তূর্যে জাগে
ঘরছাড়া দল জমে সমুদ্র-গভীর
জমে সকাল সন্ধ্যার আগে
জমে তামাসার আসর ভাঙার আগে,
টলমল ধূসর সময়ে
স্তম্ভগুলি আগুনের শিখা
দীর্ঘ রাতে আলো পড়ে,
ইঁটকাঠ ইস্পাতের স্তূপে
নিশানের মতো ওড়ে একটি মশাল।

পরিখার পার

নিস্তব্ধ শস্যের ভিড়ে হারিয়ে যাবার ডাক দিয়ে
দিন যায় জ্যোৎস্নার মন্ত্রের মতো,
উর্বর প্রস্তুতি
রুক্ষ হৃদয়ের চাপে উতরোল আন্দোলনে
সীমান্তের সংকীর্ণ এলাকা জুড়ে অস্ফুট চীৎকারে।

মৃদুদীপ ভালোবাসা দাবানল হতে চায়
জঞ্জালের স্তূপ ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
তীব্র গূঢ় ক্ষত
অশ্রান্ত নির্ঝরে ধোয় বপনের কাল,
প্রতীক্ষাশেষের দৃষ্টি
দেখে এক ভবিষ্যৎ ফোটে শুভ্র বিশাল পুষ্পের দলে
শান্তির শিশিরমুক্তা-ঝলমল পৃথিবীকে দেখে।

আমরা মুঠোয় নিয়ে অবিনাশী বীজ
পা বাড়াই নিষেধের পরিখার পারে।

বিমলচন্দ্র ঘোষ
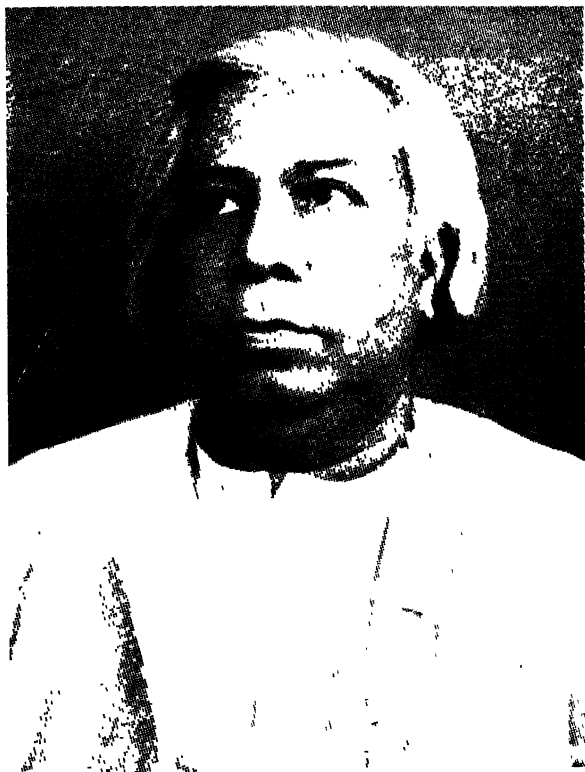
'বিমল দা, সম্প্রতি এক্স-রে'তে ধরা পড়েছে রোগটা টি.বি। আপনার 'দক্ষিণায়ন' পেলে রোগ-শয্যায় শুয়ে শুয়ে উপভোগ করতে পারি' লিখেছিলেন সুকান্ত। সুরু থেকেই বিমলচন্দ্র ঘোষ সমাজসচেতন কবি। জীবনের ধূসর আতপ্ত মরুভূমিতে তার চোখের সামনে জেগেছে পুষ্পিত দিগন্ত। রক্ষণশীলতা, কুসংস্কার, অবিচার, শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর কাব্য বজ্রকঠিন প্রতিরোধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় দেশব্যাপী কালোবাজারী মুনাফাশিকারী বীভৎস উল্লাসের ভেতর তিনি গর্জে উঠেছিলেন। তিনি যেমন born fighter তেমনি born writer.

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: ভবানীপুর, কলিকাতা—১২ই ডিসেম্বর ১৯১০। ১, যদু ভট্টাচার্য লেন, কলিকাতা-২৬। **জীবিকা:** লেখা ও সরকারী বৃত্তি। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** আমার যখন বয়স হবে পনেরো 'একটি গান' তখন লিখি। **প্রকাশ সন:** ১৩৩১। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:** 'সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা।' **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** প্রথমে মাইকেল মধুসূদন, পরে রবীন্দ্রনাথ। **প্রিয় বিদেশী কবি:** প্রথম জীবনে ছিলেন শেলী. কীটস্, শেষের দিকে এলিয়ট, মায়কোভস্কি। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** কবিকে হতে হবে কোটি কোটি মানুষের সংগ্রামী জীবনের শরিক। তাদের আনন্দ যন্ত্রণার অংশ। নিঃসঙ্গতায় সে যখন আত্মস্থ তখনো তার মনে বহিরঙ্গ জগতের প্রতিচ্ছায়া ক্রিয়াশীল। কবিমাত্রেরই আত্মাভি-মান আছে, অহংবুদ্ধি আছে। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** উপরোক্ত বক্তব্যগুলিই এর উত্তর। কবিতায় প্রকৃতি ও সমাজের প্রভাবের সঙ্গে এই বক্তব্য ওতঃ-প্রোতরূপে জড়িত। কবির মন বহুমুখী সুতরাং প্রয়োজন ও আবেগ অনুযায়ী কবিতায় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কোনো বাঁধাধবা ছকে কবিমনকে বাঁধা যায় না। কিন্তু সে আত্মাভিমান ও অহংবুদ্ধি তার নিজেরই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ত্রুটি। মানুষ প্রথমে সমাজবদ্ধ জীব তারপর সে শিল্পী, সে কবি। তার শিল্প-চেতনাকে, তার কবিত্বকে শুধু প্রকৃতি নয়, সমাজও রসদ ও প্রেরণা জোগায়। সেজন্য লোকবিমুখিতাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি—কবে, কোথায়, রচিত। কোথায় প্রকাশিত:** নোনা খাম: খাড়া রোদ্দুর। ১৯৫৭। গঙ্গোত্রী। লেনিনের একটি ছবি দেখে। (নিঃসঙ্গ লেনিন ভোলগার বালুসৈকতে)। **বাংলাসাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** ঈশ্বর গুপ্ত থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বাংলা কাব্যধারার দিকে তাকালে আধুনিক কবিতার ঐশ্বর্য দেখে মন বিস্ময়ে, আনন্দে, গর্বে ভরে যায়। বাংলাসাহিত্যের সবচেয়ে বড় সম্পদ আধুনিক কবিতা। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর ইতিহাস সৃষ্টির দিকে এগিয়ে চলেছে আধুনিক কবিতা।

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: জীবন ও রাত্রি (১৩৪০), দাক্ষিণায়ন (১৯৪১), উলুখড় (১৯৪৩), দ্বিপ্রহর ও অন্যান্য কবিতা (১৩৫২), নানকিং (১৯৪৮), সাবিত্রী (১৯৫১), সপ্তকাণ্ড রামায়ণ (১৯৫১), ভুখা ভারত (১৯৫১), বিশ্বশান্তি (১৯৫১)। প্রকাশিত সংকলন ও প্রকাশ কাল: ছায়াপথ (১৯৫৫), উদাত্ত ভারত (১৯৫১), রক্তগোলাপ (১৯৫৮), উত্তরাকাশের তারা শান্তি (১৯৫১), উত্তরাকাশের তারা (১৯৬৭)।

সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশ কাল: মেঘনা (১৯৪৭), পটভূমি (১৯৫১), মনীষা (১৯৩৮), বারোমাস (১৯৫৪), এষা (ত্রৈমাসিক) (১৯৬৫)।

নোনা ঘাম : খাড়া রোদ্দুর

অহংকারের সাড়ে-তিন হাত ছায়াটাকে
দুপায়ে মাড়িয়ে
দুপুরের সূর্যকে মাথায় রাখে।
তারপর
আগুনগলা ঘামের ঢেউ ভেঙে
সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে চলে।

রক্তের নুনে
ঘামের নুনে
চোখের জলের নুনে
মহাপৃথিবী লাবণ্যময়ী
যে নুন
শ্রম ও সৃষ্টির
আদি উপাদান,
যে নুনের খরতীব্রতায়
সাতসমুদ্র উদ্‌বেলিত।

সূর্যকে মাথায় রেখে
অহংকারের সাড়ে-তিন হাত ছায়াটাকে
পায়ে মাড়িয়ে
খাড়া রোদ দাঁড়িয়ে ঘামে।
নোনা হাওয়ার নোনা আগুনে
পাথর-খোদাই পেশীগুলো
স্ফীত হয়ে ওঠে।

ঝিনুক ভাঙা গরম বালির উপর
দাঁড়িয়ে
দু হাতের মুঠি শক্ত করে
ঘাড় সিধে রেখে
খাড়া রোদ
হিংস্র মাতাল সমুদ্রটার দিকে তাকায়:

রাক্ষুসে ঢেউগুলো
স্পর্ধার অট্টহাসিতে

বলিষ্ঠ পেশীপুষ্ট সবল
দু পায়ের ওপর
আছড়ে—ভেঙে—চূর্ণ হয়ে—
গাঢ়-নীল-নৈরাশ্যে
পিছু হটে।

সূর্যদগ্ধ সৈকতে মুখ থুবড়ে
গম্ভীর আওয়াজটা
টুকরো টুকরো হয়ে
দিগন্তে মিলিয়ে যায়
আকাশ বাতাস
নিস্পন্দ
নিথর!

তারপর
সংবিৎ ফিরে এলে
সকলের চোখে পড়ে
সেই জোরালো পা দুটোর সর্বাঙ্গে রক্ত
আর
নোনা ভিজে বালির ওপর
ছড়িয়ে আছে
কতকগুলো মরা থ্যাঁৎলানো হাঙর।

দক্ষিণারঞ্জন বসু

তামাম পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত দক্ষিণারঞ্জন বসু ঘুরেছেন। দেশের মানুষের সংগে তামাম দুনিয়ার মানুষের শিক্ষাসংস্কৃতি, সুখ-দুঃখের শরিক হয়েছেন, ফলে দূরের আকাশ তাঁর কাছে, আরও কাছে এসে বাঙ্ময় হয়েছে। প্রাজ্ঞ দৃষ্টিভংগীর সংগে কাব্যের এই মনিকাঞ্চন যোগ আন্তরিক উপলব্ধিতে সৃষ্ট। 'শিল্পী এবং তাঁর সৃষ্টি আপাতকালে আশ্রয় গ্রহণ করে মাত্র, তাঁর লক্ষ্য বা ইষ্ট সর্বকালের' এই আদর্শে কবি দক্ষিণারঞ্জন বসুর পদযাত্রা। নিখুঁত ছন্দজ্ঞান, চিত্রকল্প তাঁর কবিতায় স্থিত। কোনরকম অসংলগ্নতা, দুর্বোধ্যতার বেড়াজালে না জড়িয়ে গভীর জীবনবোধে তিনি কবিতাকে দীপ্ত করেছেন।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: বজ্রযোগিনী, জেলা ঢাকা, ২৬শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৯১২। ৬৪/১৩ বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা-৩৭। **জীবিকা:** (বার্তা-সম্পাদক, যুগান্তর), অধ্যাপনা (সাংবাদিকতা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ও সাহিত্য রচনা। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** যতীন দাসের আত্মদানের ওপর রচিত 'মৃত্যুঞ্জয়'। **প্রকাশ সন:** সম্ভবত ১৯৩১। **কবিতাটি কোন্ পত্রিকায় মুদ্রিত:** বঙ্গবাসী কলেজ ম্যাগাজিনে। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও নজরুল; কলেজ জীবনে শেলী, কীটস এবং ব্রাউনিংও। **প্রিয় বিদেশী কবি:** ওয়াল্ট হুইটম্যান। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** সমকালীন সমাজের পরিচয় তার সংস্কৃতিতে, আর কবিরাই বস্তুত কালের রাখাল। যুগ-জীবন যেমন কবির রচনায় প্রকাশ পায়, তেমনি কবির তৃতীয় নয়নে ভবিষ্যতের চিত্রও সময় সময় ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে কবির পদক্ষেপে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি চিহ্নিত। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** কবির ক্ষমতা ও তাঁর কাব্যদৃষ্টির স্বচ্ছতা অনুযায়ী কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব অনুভূত হবে। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি:** এখনো তাই। **কবে, কোথায়, রচিত। কোথায় প্রকাশিত:** ২-১০-৬৯ তারিখে কলকাতায় রচিত। দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** 'আধুনিক কবিতা'র সঠিক সংজ্ঞা আমি খুঁজে পাই না। কাল যেমন স্থির নয়, 'আধুনিক' কথাটিও তেমনি অস্থির, সবসময়ই পরিবর্তনশীল। তাই 'আধুনিক' স্থলে 'সমকালীন' বিশেষণটিই এক্ষেত্রে আমি প্রকৃত অর্থবহ এবং প্রযোজ্য বলে মনে করি। বাংলা সমকালীন কবিতার গতি ও গুরুত্ব দুই-ই অবশ্য স্বীকার্য। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** সমকালীন কবিতার ভবিষ্যৎ কি, এ প্রশ্নের আলোচনা আরম্ভের আগে কবিতা কি, এ-বিষয়টি পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। এর সংজ্ঞা নিরূপণও খুব সহজ নয়। কারণ এক এক মহাজন এক এক রকম মত প্রকাশ করেছেন এ সম্বন্ধে। 'Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings.'—ওয়ার্ড্স্‌ওয়ার্থের এ সংজ্ঞা সর্বকালের কবিতা সম্পর্কে যতই প্রযোজ্য হোক না কেন একালের শ্রেষ্ঠ কবি-সমালোচক এলিয়ট কিন্তু একে অসম্পূর্ণ বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে 'Poetry is a superior amusement.' আমার মনে হয়, এ দু'টি মতের মধ্যেই সত্য রয়েছে। আমি মনে করি কবিতা শুধু ছন্দের ঝঙ্কার নয়, কিংবা শুধু শব্দ প্রয়োগের কারুকলাও নয়। কবিতা মহৎ ভাবের বিদ্যুৎস্ফুরণ যাতে মনের মুক্তিতে অনির্বচনীয় আনন্দলাভ ঘটে। মনের সেই মুক্তি সুখেরও অভিব্যক্তি হতে পারে, কিবা যন্ত্রণার। তবে উভয়তই ফলশ্রুতি অসীম আনন্দ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এলিয়টের কাব্য-সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে আর্নল্ড কবিতাকে যে 'criticism of life' বলে অভিহিত করেছেন, সে মতবাদ আর টেকে না। জীবন সমালোচনার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি কবিতা রচিত হয় তা'হলে উন্নতধরনের অর্থাৎ অনির্বচনীয় আনন্দ তাতে আশা করা যায় না। 'শুধু অকারণ পুলকে' যে সৃষ্টি তাই প্রকৃত কবিতা। সেখানেই 'Superior amusement' প্রত্যাশিত।

মানুষের ব্যথা-যন্ত্রণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। সেই অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা ও যাতনা সৃষ্টির আদিকাল থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসছে সঙ্গীতে শিল্পকলায়। আদিম মানুষ তার দুঃখ-বেদনা ও কামনা-বাসনাকে ঘোষণা করেছে কণ্ঠস্বরের সুর-ঝঙ্কারে, গাছে বা পাহাড়ের গায়ে খোদাই শিল্পের মাধ্যমে কিংবা মাটি বা পাথরের মূর্তি গড়ে। এ সবই এক এক জাতীয় কবিতা। বাস্তবিক পক্ষে কবিতা এক বিচারে ললিতকলার শ্রেষ্ঠ বিভাগ। মানুষের যখন অক্ষর জ্ঞান হলো, মানুষ যখন লিখতে শিখলো তার মনের পিপাসা তখন অনেক সহজে মুক্তি পেতে থাকলো কবিতার মাধ্যমে। আদি কবি বাল্মিকীর কণ্ঠে যে গভীর হৃদয়-বেদনা ধ্বনিত হয়েছিল তাঁর 'মা নিষাদ...' শ্লোকে তারপরে সুখের প্রত্যাশায় ও সাফল্যে এবং যন্ত্রণার কাতরতায় কত কবির হৃদয়-উন্মোচন আমরা লক্ষ্য করেছি নানা দেশের নানা ভাষার কবিতায় ও গাথায় গাথায়।

কিন্তু সাধারণ জীবনে যেমন মানুষ সময় সময় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, পুরনো বিধি-বিধানকে আর মেনে চলতে চায় না, কবিতা বা চারুকলার ক্ষেত্রেও তেমনি প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ লক্ষ্য করা যায়। অন্যদেশের বা অন্য-ভাষার কবিতার জগৎ নিয়ে এখানে দৃষ্টান্ত তুলে আলোচনার অবকাশ নেই, তবে বাংলা কাব্য-জগতেই আমরা মাইকেল মধুসূদনের, নজরুলের বিদ্রোহ লক্ষ্য করেছি এবং পরবর্তীকালেও চলতি হাওয়ার বিরুদ্ধে চলতে দেখেছি অনেক শক্তিমান কবিকে। এক এক কালের এই বিদ্রোহের মধ্যে সমকালীন মানুষের মনোভাব বিধৃত হয়ে থাকে। সময় সময় ভাবমাহাত্ম্যে এক একটি সমকালীন কবিতা সর্বকালীন হয়ে ওঠে, শুধু তাই নয়, দেশের সীমানার বাইরেও তা' সর্বজনীনতা লাভ করে। এ প্রসঙ্গে মানুষের কবি, গণচেতনার কবি হুইট-ম্যানের একটি কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে। তিনি বলেছেন,

'I know I am solid and sound,
I know I am deathless.'

আমি পূর্ণ, আমি মৃত্যুহীন—এ যে একেবারে আমাদের গীতা-উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি!

এমনি করেই এককালের ও একদেশের কবিতা সর্বকালীন ও সর্বজনীন হয়ে ওঠে। আমাদের সমকালীন বাংলা কবিতায়ও তেমন স্মরণীয় রচনার সন্ধান মেলে যদিও জীবনানন্দ দাশ বলেছেন, 'সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি।'

বাঙালী কবি-সাহিত্যিকরা দীর্ঘকাল ধরেই বিশ্বের প্রগতিশীল চিন্তা-ধারার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ আজ অতি দ্রুত পরস্পরের কাছাকাছি এসে পড়ছে। পারস্পরিক ভাব-বিনিময় সহজ হওয়ায় আমাদের চৈতন্য সহজে উদ্ভাসিত হচ্ছে এবং সকল পক্ষই সমৃদ্ধতর হয়ে উঠছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন বাংলা কবিতা সম্বন্ধে আমি অধিকতর আশান্বিত। কারণ সারা ভূমণ্ডল জুড়ে আজকের শ্রেষ্ঠ বাংলা কবিতার সীমানা।

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: আরও সূর্যের কাছে (১৯৬২), অলক্ষ্যে বিকেল (১৯৬৫), আশা যখন বৃষ্টি (১৯৬৮), রাত্রিকে দিনকে (১৯৬৯)।

সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা, সংকলন ও প্রকাশ কাল: 'মধুরাংশচ' বার্ষিক সংকলন (পঞ্চম দশকে ছয়টি সংখ্যা), 'ভাইয়ের মুখ' (যুগ্ম-সম্পাদনা)।

এখনো তাই

সে বাঙলা এখনো আছে দুই ভাগ যদিও এখন।
আম জাম নারকেল লিচু আর কুলের বাগান,
পাকা তাল কাঁঠালের খেজুরের সুগন্ধে আকুল;
এখনো অশ্বত্থ বট তেতুল হিজল
দেবদারু বাঁশঝাড় ছায়া দেয় হাওয়া দেয়
দুই বাঙলা জুড়ে
ক্লান্ত পথিকে, গৃহে, রাত্রি কি দুপুরে;
আশ্বাস আনন্দ দেয় প্রান্তরের সবুজ ফসল,
চাষীদের দিন রাত হাড়ভাঙা খাটুনির ফল।

মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু মোষ ছাগল চরায়,
গুলী খেলে বিড়ি খায় মাঝে মাঝে বাঁশীও বাজায়;
এখনো তেমনি নৌকো বেয়ে যায় মাঝি,
গান গায় প্রাণ খুলে গঙ্গায় পদ্মায়
মহানদী মেঘনায় রূপনারায়ণে।
বছর বছর আজো বান ডাকে দুঃখের নদীতে,
খেয়ালী বর্ষায় ভাসে দু'বাঙলার গ্রাম গ্রামান্তর:

সাহায্যের ধ্বনি ওঠে বন্যার্তের ত্রাণে
দু'দিকের নগরে বন্দরে।
খেয়াঘাটে যাত্রীভিড় নিরন্তর চলে পারাপার,
ফেলো কড়ি দাও পাড়ি দু'ধারেই আছে কর্ণধার!
পল্লীর হাটে বাজারে শহরে নিয়মিত বেচাকেনা,
ওধারে যেমনি এধারেও তাই বদলেনি কোনো ধারা;
জারি-সারি আর মিছিলে-মেলায় যাত্রা ও কবিগানে,
আজিও তেমনি গ্রাম ভেঙে পড়ে ভাঙা এই বাঙলায়।

কুলি-কামিনের কামারের আর কুমারের,
ছোট দোকানীর আর কারখানা শ্রমিকের,
দিন কাটে দুখে এখনো তেমনি দু'ধারেই,
পূবে পশ্চিমে দীনের কুটীরে সমান অন্ধকার,
সোনা আশ্বিনে দুখীর দুঃখ বেড়ে যায় চারগুণ;
পূজা অঙ্গনে আলোর জলুষ আনন্দে মাতামাতি,
অন্য দিকে কী অন্ন অভাব নিদারুণ হাহাকার!
বৈষম্যের অভিশাপে সারশূন্য আগেও যেমন,
সে বাঙলা এখনো আছে দুই ভাগ যদিও এখন।

এখনো আগের মতোই এখানে সেখানে
শিশুদের অনেকের ঘুম ভাঙে ভোরের আজানে,
অথবা খঞ্জনি তালে ভক্তকণ্ঠে প্রাগ-ঊষা-কীর্তনে;
ভিড় জমে লোকোৎসবে আগেরই মতন,
পুণ্যস্থানে মায়েদের সন্তানের মঙ্গল কামনা।
পূজায়-গাজনে কিংবা ঈদ-মহরমে
চাচা-মামা দাদু-ভাই ডাকা ডাকি যেমনি তেমন,
সে বাঙলা এখনো আছে দুই ভাগ যদিও এখন।

গাঁয়ের পুকুর ঘাটে এবেলা ওবেলা
ঘড়া ও কলসী নিয়ে মেয়েদের মেলা,
কিংবা নিয়ে এঁটো কিংবা পূজোর বাসন
এখনো তেমনি বসে এধারে ওধারে।
সে আগেরই মতো আজো হৃদয়ে হৃদয়ে
দোলা লাগে মধুক্ষরা বসন্তের নম্র শিহরণে,

শহরের পথে পথে কলস্বর তরুণ-তরুণী
দু'ধারেই আরো বেশি সজীব উচ্ছল।

ফকির বাউল দুঃখী ভিখ মাগে আগের মতোই,
ঈশ্বরের দোয়া মেলে দাতা দিয়ে খুশি।
দু'বাঙলা এখানে এক, মানুষের মধ্যে ভগবান—
বাঙালী জীবন-সূত্রে এ তত্ত্বের পেয়েছে সন্ধান।
ধর্মভীরু মানবিক বলিষ্ঠ মনন,
সে বাঙলা এখনো আছে দুই ভাগ যদিও এখন।
একই আকাশ তলে মিলে মিশে স্বচ্ছন্দ বিহার
দু'বাঙলার পাখিদের, কাকলির ওঠে ঐকতান।
এখন যদিও ঘেরা চারিদিক ঘোর অন্ধকারে,
অমৃতের ধারা নামে কুসুমের হাসির জোয়ারে।
এখনো তেমনি ভাবেই মান-অভিমান,
হৃদয় বদল চলে দু'বাঙলার পল্লীতে নগরে।
এদিকে উদ্বাস্তু কান্না ওপারেও দীর্ঘ হতাশ্বাস,
বিদেশীর ছলনায় বুক পেতে নিয়েছি আঘাত।
এ দুর্ভোগ আমাদেরই পাপের ফলন,
তবুও সে বাঙলা আছে দুই ভাগ যদিও এখন।

দিনে সূর্য, রাতে চাঁদ সহযোগী তারাদের নিয়ে
এখনো তেমনি রয় পাহারায় বঙ্গজননীর;
সুন্দর সুন্দরবন বাঁধে আলিঙ্গনে,
চরণ যুগল ধুয়ে ধন্য মানে বঙ্গোপসাগর।
এখনো বাঙালী কাঁদে পলাশীর পাপে,
এখনো বাঙালী হাসে মিলনের প্রসন্ন তৃষায়,
স্বরাজ পেয়েছি বটে ফিরে চাই সে হারানো মন,
সে বাঙলা তেমনি আছে দুই ভাগ যদিও এখন।

দিনেশ দাস

নেহাৎ কথার কথায় খ্যাতনামা এক সাহিত্যিক-বন্ধু বলেছিলেন—'কবিতা'তে লেখ হে, ওখানে না লিখলে সাহিত্যে স্বীকৃতি পাবে না। কফি হাউসেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দিনেশ দাস কোনোদিন বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় লেখেন নি। ঐ একই প্রশ্ন উঠেছিল আবার কাস্তে'র সময়: এ কবিতা না ছাপা হলে লেখাই ছেড়ে দেবেন ভেবেছিলেন। এই হল দিনেশ দাস, যিনি শুধুমাত্র কবিতা লিখেই জনপ্রিয়। যে কোন কবিতা পাঠকই তাঁর দু'চারটে কবিতা মুখস্ত বলে দিতে পারেন। অজাতশত্রু এই কবি কোন দল করেন না, তাবেদারী কূটনীতি থেকে দূরে সরে একান্তই কবিতা সাধনা করে যাচ্ছেন। চিত্রকল্প, ভাবনা, ছন্দে, উপস্থাপনার মাধ্যমে বাংলা কবিতায় ঈর্ষণীয় স্থান অধিকার করে আছেন। 'সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি' এ আপ্তবাক্য জীবনানন্দ যে দু-একজন কবির উপরে প্রয়োগ করেছিলেন তাঁদের একজন দিনেশ দাস।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: আলিপুর, কলিকাতা: ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩। ৪/১, আফতাব মস্ক্ লেন, কলকাতা-২৭। **জীবিকা**: শিক্ষকতা। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা**: শ্রাবণে। **প্রকাশ সন**: ১৯৩৪ (যখন আমি স্কটিশচার্চ কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম)। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত**: দেশ। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: সত্যেন দত্ত ও নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র। **প্রিয় বিদেশী কবি**: শেলী, কার্ল স্যান্ডবার্গ, ব্রাউনিং। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: যে কোনো ভাল বা মহৎ কবিতা শুধু যে সাহিত্যরীতির রূপান্তর ঘটায় তা নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অগ্রগতি ঘটায়—সেখানে কবির একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা আছে। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব কখনও প্রকট, কখনও বা অপ্রকট। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি**: কাস্তে। **কবে, কোথায় রচিত। কোথায় প্রকাশিত**: ১৯৩৭, কলকাতায়। শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৩৮। **বাংলাসাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: আজকের বাংলা সাহিত্যের রাজপথে উপন্যাসের ঢাউস অ্যামবাসাডার গাড়ি যেভাবে ধুলো উড়িয়ে, কাদা ছিটিয়ে, ভেঁপু বাজিয়ে ছুটেছে তাতে আধুনিক কবিতার গতি অনেকটা রাস্তার ধার দিয়ে সন্তর্পণে পদযাত্রা করার মত। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: আধুনিক কবিতায় মাঝে মাঝে চকমকি ঠুকে চমকে দেওয়ার কাণ্ড-কারখানা থাকলেও, এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলেই মনে হয়।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: কবিতা (১৯৪২), ভুখমিছিল (১৯৪৪), দিনেশ দাসের কবিতা (১৯৫১), অহল্যা (১৯৫৪), কাঁচের মানুষ (১৯৬৩)। শ্রেষ্ঠ কবিতা (প্রথম পর্যায়) (১৯৬২), শ্রেষ্ঠ কবিতা (দ্বিতীয় পর্যায়) (১৯৭০)।

সম্পাদিত সংকলন, পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশ কাল. অগ্রগতি (১৯৩৬), সাপ্তাহিক।

অলকা, হিন্দুস্থান কোয়ার্টার্লি (নিউজ ডাইজেস্ট), সহকারী সম্পাদক। দৈনিক কৃষক (সাব-এডিটার) (১৯৪০-৪৬), মাতৃভূমি (কার্যকরী সম্পাদক) (১৯৪৭)।

সম্পাদিত সংকলন: ২৫ জন সাম্প্রতিক কবি।

কাস্তে

বেয়নেট হ'ক যত ধারালো
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু!
শেল্ আর বোম হ'ক ভারালো
কাস্তেটা শান দিও বন্ধু,

বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে?

চাঁদের শতক আজ নহে তো,
এ যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে!

লোহা আর ইস্পাতে দুনিয়া
যারা কাল করেছিল পূর্ণ,
কামানে কামানে ঠোকাঠুকিতে
নিজেরাই চূর্ণ-বিচূর্ণ।

চূর্ণ এ লৌহের পৃথিবী
তোমাদের রক্ত সমুদ্রে
ক্ষয়িত গলিত হয় মাটিতে,
মাটির—মাটির যুগ ঊর্ধ্বে।

দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই, চেয়ে দেখ বন্ধু!
কাস্তেটা রেখেছ কি শানায়ে
এ-মাটির কাস্তেটা বন্ধু!

সুশীল রায়

উত্তরসূরীদের কবিকৃতির উপর শ্রদ্ধাশীল সুশীল রায় কখনো পোজ করেন না। কবিতা নিয়ে ভীষণ ভেবেছেন বলেই কিছু তরুণতম মুখ আজ পরিচিত। দলবেঁধে গঠনমূলক কিছু ভাবা গেলেও কবিতা-রচনা হয় না একথা সুশীল রায় বিশ্বাস করেন, ফলে তিনি কখনো কবিতাকে হুড়-যুগের মধ্যে টানেননি। দুর্বোধ্যতার বেড়াজালে নিজেকে জড়িয়ে নয়, জীবন-সমাজ সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ এই কবি, সহজ সরল নিখুঁত ছন্দে চারপাশের জীবনযাত্রার দিকে খোলা চোখে তাকিয়ে সহজিয়া একটি কাব্যরূপকে আবিষ্কার করেছেন। সুশীল রায় কখনো মনে করেন না এই বুঝি দেরী হয়ে গেল।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: রাজশাহী (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্থান)। ১৯১৫। ৫৯বি, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯। **জীবিকা:** বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের যুগ্ম-অধ্যক্ষ, 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার সম্পাদক। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** কবিতাটির নাম স্মরণ হচ্ছে না। প্রথম ছত্র—'আজ যদি চলে যাই, বলে

যাই: আর আসিব না। **প্রকাশ সন:** ১৯৩৬। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:** পূজা সংখ্যা, আনন্দবাজার পত্রিকা। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্য। **প্রিয় বিদেশী কবি:** কীট্‌স্‌। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** সংস্কৃতির সঙ্গে কবির যোগ নিবিড়। কবিকৃতি ও সংস্কৃতি সমার্থক শব্দ কিনা জানি না, কিন্তু সেরকম হলে মন্দ হ'ত না। কবির কর্তব্য উৎকৃষ্ট কবিতা লেখাই নয়, আচারে আচরণেও উৎকৃষ্ট হতে হবে কবিকে। তবেই সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সম্ভব। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** কবি যদি প্রকৃত কবিস্বভাবের হন তবে কবিতার উপর তার প্রতিফলন হবে। সেইটেই কবির লাভ। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:** "পাঁচ বিঘে ও আমি" ১৯৬৯ সেপ্টেম্বরে কলকাতায় কবিতাটি রচিত। শারদীয়া 'দেশ' ১৩৭৬ সংখ্যায় প্রকাশিত। **বাংলাসাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** চিরকালই একটি করে আধুনিক কাল থাকে; সেইকালের সেই লেখা সেইকালে চিরকালই আধুনিক। সব সাহিত্যেই এটা সত্য। সুতরাং বাংলা সাহিত্যেও সত্য। সাহিত্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য এর প্রয়োজন আজ আছে, আগামী কালও থাকবে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** এটা বলা আর মানুষের ভাগ্য নিয়ে ভবিষ্যৎ-বাণী করা একই কথা।

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও তার প্রকাশ কাল: সুচরিতাযু (১৯৩৬), পাঞ্চালী (১৯৫১), শতদ্রু (১৯৬৫), আখ্যায়িকা-কাব্য 'প্রণয়ী'-পঞ্চক' (১৯৬৪)।

সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশ কাল: 'নাচঘর' (১৯৩৬-৪১), কবিতায় মাসিক পত্র 'জীবাণু' (১৯৩৬-৩৯), কবিতার মাসিক পত্র 'ধ্রুপদী' (১৯৬০ থেকে ১৯৬৮), 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' (১৯৬৬-), প্রতি ঘণ্টার কাব্যপত্র 'কবিতা ঘণ্টিকী' (২৩ বৈশাখ, ১৩৭৩, ৭ মে, ১৯৬৬), শতবৎসর অন্তর প্রকাশিত পত্রের প্রথম সংখ্যা 'শতবার্ষিক কবিতা' (১৩৭৪)।

পাঁচ-বিঘে ও আমি

বেড়াতে আসিস কিন্তু : পাঁচ-বিঘের জমির জাজিম
সম্মুখে বিছিয়ে নিয়ে বসে আছি। শোন্‌--
যাকে বলে অনির্বচনীয়
এমনি আশ্চর্য জায়গা, অনেক চেষ্টায় পাওয়া গেছে।
বঙ্গোপসাগর থেকে সোজা আসে অফুরন্ত হাওয়া--
দাক্ষিণ এমনি খোলা। কেতকীর অপর্যাপ্ত চুল
সামাল দেওয়াই কষ্ট, ঝগড়া লেগে আছেই দিনরাত

দক্ষিণ হাওয়ার সঙ্গে : হাওয়ার আঘ্রাণ
নিতে বেশ মজা পাই। বেড়াতে আসিস,
খুব খারাপ না-লাগতেও পারে এই নিরালা বসতি।

পূবে রোজ ভোরবেলা সীমাশূন্য মাঠের ওপারে
সূর্য ওঠে। সন্ধ্যা হলে আবির ছিটিয়ে আকাশের
সারা গায়ে হোলি খেলা নিত্যনৈমিত্তিক কাণ্ড তার।
উত্তরে মহেশগঞ্জ রেল-ইস্টিশান, ঘন বাবলা-বন
পেরিয়ে ট্রেনের
হুইসলের শব্দ আসে কানে। যদি বেড়াতে আসিস
ভারি ভালো লাগবে। আমি ভারি ভালো আছি।

সাত-বিঘতের এই শরীর ঢাকার জন্যে খাসা
পাঁচ-বিঘে জমির মালিকানা নেওয়া গেছে।
করোগেট-চৌচালা-ঘরে দুটি প্রাণী আছি নিরিবিলি।
এমন জীবন পায় ক'জন, তবুও
মন ছটফট করে কেন রে? বেইমান
মনকে শাসন করতে একবার আসিস।
একবার বেড়িয়ে যাস আমাদের পাঁচ-বিঘে জমিতে।

সমর সেন

এক ঝলক সোনালী রোদে সমর সেন ফুটতে দেখেছেন বেগুনী ঘাস-ফুল, উড়তে দেখেছেন উদাসীন দুপুরের চিল. শুনেছেন মৌমাছির অলস গুঞ্জন, এর চেয়ে তাঁর কাছে রঙ করা রাজবাড়ি সুন্দর মনে হয়নি। আপাতরোম্যাণ্টিক বিরোধী হতে চাইলেও তাঁর অবচেতন মন কিন্তু তারই অন্বেষণে প্রতিক্ষিত। তুমি এখনো এলেনা/সন্ধ্যা নেমে এলো/পশ্চিমের করুণ আকাশ/গন্ধে ভরা হাওয়া/আর পাতার মর্মর ধ্বনি/তারপর নিঃসংগ কবিকে ছেয়েছিল—আমার অন্ধকারে আমি/নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর নিঃসংগ। কিন্তু এই একাকীত্ববোধ তাঁকে বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি। সমস্ত অসাড়তাকে ঝেড়ে ফেলে তিনি বলেছেন—মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও পৃথিবীতে নূতন পৃথিবী আনো/হানো ইস্পাতের উদ্যত দিন। তাই বেকার প্রেমিকের রক্তে জ্বলে বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: কলকাতা, ১৯১৬। ১৫সি, সুইন্‌হো স্ট্রীট, কলকাতা-১৯। **জীবিকা:** সাংবাদিক। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** মনে নেই। **প্রকাশ সন:** মনে নেই। **কবিতাটি কোন্‌ পত্রিকায় মুদ্রিত:** খুবসম্ভব 'পূর্বাশা'য়। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল?** বাল্যবয়সে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইস্‌লাম। **প্রিয় বিদেশী কবি:** একাধিক। তিরিশের যুগে এলিয়ট ও ইয়েট্‌স্‌। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** এখন ঔপন্যাসিকের চেয়ে কম। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব** : ×। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি—কবে, কোথায় রচিত। কোথায় প্রকাশিত:** ১৯৩৭-৪০র মধ্যে। কলকাতায়। 'কবিতা' পত্রিকায়। **বাংলা-সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** জানি না, কেননা সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ এখন বলতে গেলে নেই। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** ভবিষ্যৎ ভাবি, বর্তমানে কেবা মরে।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন [প্রথম পাঁচটি ১৯৩৭-৪৪]: কয়েকটি কবিতা, গ্রহণ, নানাকথা, খোলা চিঠি, তিন পুরুষ, সমর সেনের কবিতা।
পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা: কবিতা (১৩৪৪) যুগ্ম-সম্পাদক।

একমাত্র তোমাকে সত্য বলে মানি

একমাত্র তোমাকে সত্য বলে মানি।
দারুণ গ্রীষ্মে অভীপ্সা-ব্যাকুল মন
তোমার আদেশে শহরের দিগ্বিজয়ে ঘোরে
তোমার আদেশে সন্ন্যাসীর সাধনা-সঙিন দিনগুলি
যুবতী-সঙ্কুল আসরে
সানব্য-সঙ্গীতে সংহত।
প্রভু, পৃথিবীতে তোমার লীলা অবিরাম,
এ্যাসেম্‌ব্রি-হলে বিরহছলে মিলন আনো,
প্রবীণ কবির মুখে আবার আনো
স্বদেশী গান।

রাত্রির দূষিত রক্তে বিকলাঙ্গ দিনের প্রসবে
আমাদের তন্দ্রা ভাঙে:
তারপর আকাশ ভারি হয়ে ওঠে,
বিরস কাজের সুরে
কতদিনের ক্লান্তিতে কলের বাঁশি বাজে;
পিছনে সমস্তক্ষণ ক্ষিপ্রগতি বাসের শব্দ।

পৃথিবীর কবিতার শেষ নেই ঃ
দিনের ভাটার শেষে
গলিত অন্ধকারে মরা মাঠ ধু ধু করে,
চরাচরে মরা দিনের ছায়া পড়ে।
উদ্দাম নদীতে শেষ খেয়া নেই,
শিকারী কীট সোনার ধানে।
তাই বঙ্কিম ব্রহ্ম যীশু পরমহংস
সময় যখন আসে তখন সকলি মানি,
দুর্গম দিন,
নামহীন অশান্তিতে বিচলিত বুদ্ধি,
তবু সরল চরম কথাটি এই বলে মানি
ভারি ট্যাঁক ছাড়া কিছুই টেঁকে না,
সবার উপরে আমিই সত্য
তার উপরে নেই

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
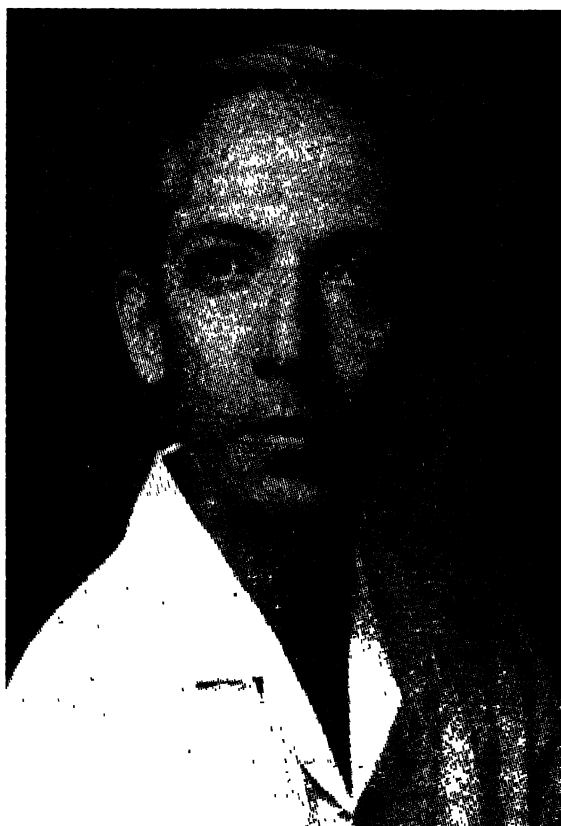
কবিতা থেকে অনেকটা সরে এসেছেন বলে সাম্প্রতিক পাঠকগোষ্ঠীর কাছে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর কাব্য-কৃতি খুব বেশী পরিচিত নয়। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রোত্তর যুগে তৎকালীন কবিগোষ্ঠীরই একজন, এই কবি দীর্ঘকাল কাব্যচর্চার মাধ্যমে বাংলা কাব্য-জগতে সুপরিচিত একটি নাম। তাঁর কবিতা অযথা বাকচাতুর্যে কিংবা দুর্বোধ্যতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়নি বরং সমাজদর্শনে সচেতন এই কবির রচনা জীবনবোধে উজ্জ্বল। সুন্দর শব্দচয়ন ও প্রকাশভঙ্গির জন্যে তাঁর চিত্রকল্প পাঠকের চোখের পাতায় বাস্তবের মত ভেসে ওঠে।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: কলকাতা। ১৯১৭। ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, কলিকাতা-২০। **জীবিকা**: লেখা। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা**: যতদূর মনে পড়ে ১২ বছর বয়সে "আমড়া" নামে আমার প্রথম কবিতা ছাপা হয়। কবিতাটি হারিয়ে গেছে। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ঝাপসা যা মনে পড়ে তা এই, আমড়ার গুণ: আমড়া খেলে চুল পাকবার, দাঁত পড়বার এবং বাড়িতে চোর পড়বার ভয় থাকে না। কারণ আমড়া ভক্ষণ করলে অকালে ইহধাম ত্যাগ করতে হয়। এটা ইতিহাসের কথা। এটা হাসবারও কথা। **প্রকাশ সন**: | X | **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত**: "হিন্দু" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায়। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: রবীন্দ্রনাথ। **প্রিয় বিদেশী কবি**: টি. এস্. এলিয়ট। এজরা পাউন্ড। কিন্তু সবচেয়ে প্রিয় কবি শেক্সপিয়র। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: সৎ মানুষের যে ভূমিকা সৎ কবিরও সেই ভূমিকা। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: এই প্রশ্নের মানে বুঝলাম না। কবিতার ক্ষেত্রে কার প্রভাব? যিনি লিখছেন; না যিনি পড়ছেন? **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত। কোথায় প্রকাশিত**: "মহুয়ার রাত"; ৩০.৮.৬২; বরাহনগর। "অমৃত" শারদীয়া সংখ্যা ১৯৬২। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: মানুষের জীবনই মানুষের কবিতা। কবিতাকে আধুনিক কিংবা অনাধুনিক বলা ভুল। আজ যা আধুনিক, কাল সেটা পুরনো। কাল যেটা আধুনিক, পরশু সেটা পুরনো। শেক্সপিয়র, রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস, ব্যাস,, বাল্মিকী– আজও তাঁরা "আধুনিক" - চিরকালের আধুনিক। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: মানুষের যেটা ভবিষ্যৎ– "আধুনিক" কবিতারও তাই ভবিষ্যৎ।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: শবরী (১৯৩৭), মৈনাক (১৯৪০), শিবির (১৯৪২), সোনার কপাট (১৯৪২), রাজধানীর তন্দ্রা (১৯৪৩), একা (১৯৪৮), মায়াবী সিঁড়ি (১৯৬৬)।

সম্পাদিত সংকলন, পত্রপত্রিকা ও প্রকাশ কাল: সংকলন সংকেত (১৩৫০), কল্পনা ও আল্পনা (১৩৪৩), কিশোর (১৩৪৩), শ্রীহর্ষ (১৯৩৭), সংকেত (১৩৫০)।

মহুয়ার রাত

আশাভঙ্গের রঙ ভাদ্র-শেষ পশ্চিম আকাশে
সব শূন্য একাকার।
বুদ্বুদের মতো শুধু ভাসে
নানান চোখের স্মৃতি।

জল-ভরা টলটলে
বৈশাখের বুক খাঁ-খাঁ।
শ্রাবণের জলে তারপর
অতল গভীর স্বাদ।
আশাভঙ্গের ক্ষণ
অঙ্গীকারে আবদ্ধ কোরো না।
ফিরে নাও কৃপণের মতো
মিলনের ক্ষণকাল।
বিচ্ছেদের মোহনা-বিস্ময়
তনুর তনিমা।—
হায় তনু!
ফিরে নাও মুখ চোখ হাত
আর স্বেদ বিন্দু
আর মহুয়ার রাত॥

হরপ্রসাদ মিত্র
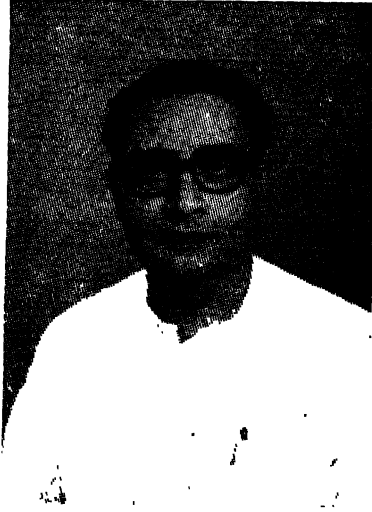
হরপ্রসাদ মিত্র দীর্ঘকাল যাবৎ কাব্যরচনা করেও বাংলা কবিতার পাঠকদের কাছ থেকে যেন একটু দূরেই সরে আছেন, তার কারণ হয়তো শিক্ষাক্ষেত্রে নিজেকে আরও ব্যাপৃত করে রাখা কিংবা অন্যান্য রচনায় অধিক পরিমাণে মনসংযোগ করা। অথচ এই শহরের মানুষদের যন্ত্রণা, সমাজ সম্বন্ধে দূরদৃষ্টি বারবার কবিতায় এসে রমনীয়তা অর্জন করেছে। কখনো এই যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে কবির তীব্র প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত কখনো জগতের বিশুদ্ধতম বৃষ্টিতে পিপাসা মেটাতে চেয়েছিলেন। তিনি কখনো অস্থিরতায় সোচ্চার, কখনো আত্মমগ্ন।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: দেওঘর। ১৯১৭। পি-২৫৩এ, লেক টাউন, কলকাতা-৫৫। **জীবিকা:** অধ্যাপনা [প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** মনে নেই। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:** মনে নেই। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** রবীন্দ্রনাথের। **প্রিয় বিদেশী কবি:** ছেলেবেলায় কীট্‌স্‌ ভাল লাগতো। তারপর অনেকের প্রতি অনুরক্ত বোধ করেছি। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:**

কবির সর্বাধিক ভূমিকা তাঁর সত্যরক্ষার আন্তরিকতায়—ব্যক্তি, সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদি ব্যাপারগুলির চেতনা এই সত্যেরই অংগ। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** যেমন চেহারার প্রভাব দর্পণে। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:** "বেগনভিলা" ('দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত, ১৯৬৮ সম্ভবতঃ)। আমার সবচেয়ে প্রিয় কবিতা এখনো লেখা হয়নি। যে কবিতাগুলি আমার নিজের মোটামুটি ভাল লেগেছে, সেইরকম একটি কবিতা পাঠালুম। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** 'আধুনিক কবিতা' কোনো স্থায়ী ব্যাপার নয়। যুগে যুগে 'আধুনিক' নামটির লক্ষণ বদলাচ্ছে। ১৯৭০ সালে বাংলা সাহিত্যে কবিতার গুরুত্ব কতকটা গৌণ মনে হয়। কবিতা সম্বন্ধে পাঠকরা কি সত্যিই আগ্রহী? **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অভ্রান্তভাবে কিছু বলা যায় কি? তবে এইটুকু মনে হয় যে, কবিদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কবিমনেরও যদি মৃত্যু না ঘটে, তাহলে তাঁদের ক্ষেত্রেও আধুনিকতা চিরন্তনতায় গিয়ে মিশবে।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: ভ্রমণ, পৌত্তলিকা, চন্দ্রমল্লিকা, সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা, তিমিরাভিসার, আশ্বিনের ফেরিওয়ালা, সাঁকো থেকে দেখা ইত্যাদি।
সম্পাদিত সংকলন ও প্রকাশ কাল: একটি বাংলা; একটি হিন্দী অনুবাদসহ বাংলা।

বেগনভিলা

কতোটুকু জানি বলো? আদিগন্ত পূবে বা পশ্চিমে
নজর সম্ভব নয় একযোগে উত্তরে-দক্ষিণে।
এ-শীতে বেগনভিলা কী আগুন ছড়ালো ফটকে—
হঠাৎ গভীর ইচ্ছে নাড়া দেয়, জানাই তোমাকে।
কে তুমি, কোথায় আছ জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে
আদৌ ছিলেই কিনা, আজকাল এমনো সংশয়।
স্বতই উদ্‌গত হয়, এমন কি সব মূল্যবোধে।

যৌবন, তুমিই জানো রক্তের আসল কলনাদ
নেপথ্য-সংবিৎই লেখে সময়ের যথার্থ সংবাদ।
যখন পৃথিবীময় দেওয়ালের বিবিধ পোস্টার
কারো বা নিপাত চায়, অবিরত কারো উচাটন
জ্বলে কুশপুত্তলির ছেঁড়া শার্ট, হৃদয়ের খড়,
ছোটে চিরম্লানমুখী সহিষ্ণুতা, ছাপোষা ভব্যতা,

আমরা হারাই আর ওরা বলে, ছিল না তো কেউ,
মনেও পড়ে না সত্যি কী আগুন বেগর্নভিলায়!
যৌবন, তুমিই জানো রক্তের গভীর স্রোতোবেগ!
আমিও উত্তাপ চাই,—ছেঁড়া কথা উড়েছে অনেক।
শব্দার্থে নিরুদ্ধ যতো হীনশ্রমী ভাবালু কবিকে
যৌবন, তুমিই বলো—শব্দ এক অনন্যীকরণ!
যথার্থ শব্দের স্বাদ ইন্দ্রিয়ে ও অতীন্দ্রিয়তায়—
অনিরুদ্ধ অভিজ্ঞতা যেমন এ বেগর্নভিলায়।
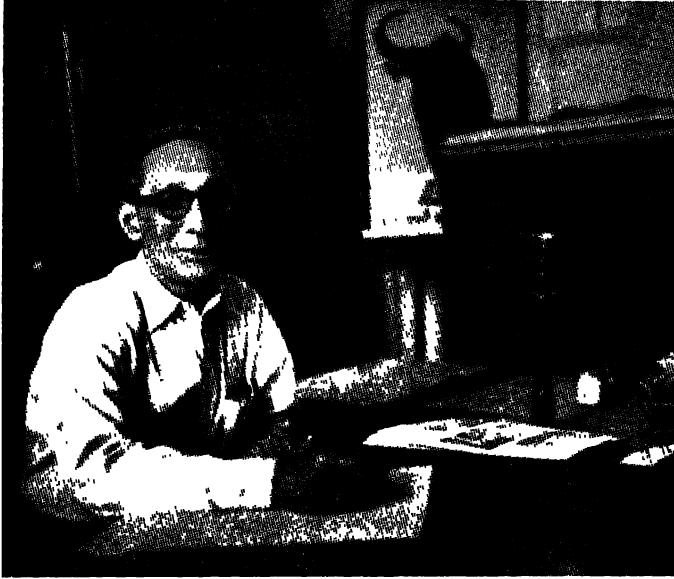
গোপাল ভৌমিক

কবি গোপাল ভৌমিক অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছেন। জীবনের অসংখ্য জটিলতা এ্যাটম বম, যুদ্ধ, বুভুক্ষু জীবন দেখে এসেছেন। তাঁর কবিতায় জটিলতর জীবনের অর্ন্তমুদ্ব ভাষা, সাংবাদিকের বিশিষ্টতা কাব্যে স্ব-মহিমায় প্রকাশ। বিজ্ঞান রাজনীতি, সমাজনীতিতে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত তাঁর কবিতা ছন্দলালিত্যে সিক্ত। দীর্ঘদিন ধরে কাব্য সাধনায় মগ্ন। কবির কাঁধে অনেকেই বন্দুক রেখে ফায়ার করেছেন এবং সুযোগ-সুবিধে মত এই সহজ সরল মানুষটিকে সযত্নে পরিহার করেছেন। সাহিত্যের ডামাডোলের বাজারে গোপাল ভৌমিককে ভুলে থাকা সম্ভব হলেও তাঁর কাব্যকৃতি স্মরণীয়।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: দানিস্তপুর, বলোড়া, ঢাকা। ১৯১৮। ৩২, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, ই/৫, কলিকাতা-১৯। **জীবিকা:** সরকারী চাকরি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনসংযোগ আধিকারিক। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** নাম মনে নেই। **প্রকাশ সন:** ১৯৩৪। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:**

বঙ্গবাসী কলেজ ম্যাগাজিনে। বাইরের পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ 'নবশক্তি'তে ১৯৩৫ সালে। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** সচেতনভাবে কারো কবিতা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে বলে মনে পড়ে না। তবে অজ্ঞাতসারে তৃতীয় দশকের অনেক বাঙালী কবির মত আমারও মনে রবীন্দ্রপ্রভাব কাজ করেছে। **প্রিয় বিদেশী কবি:** এককথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা এক একজন কবিকে তাঁর কাব্যের এক একটি গুণের জন্যে ভালো লাগে এবং নিজের পরিবর্তনশীল মেজাজ অন্ধকারেও ভালো লাগে। সামগ্রিকভাবে প্রিয় কবি রবার্ট ব্রাউনিং। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** কবি যখন সামাজিক জীব তখন এ ভূমিকা নিঃসন্দেহে আছে। তবে আমি এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চাই না। এ ভূমিকা বহুলাংশে নির্ভর করে জীবন সম্বন্ধে কবির দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিক গঠনের উপর। আজকের দ্রুতপরিবর্তনশীল ও বিজ্ঞানভিত্তিক দুনিয়ায় কবি শুধু জাতীয় সংস্কৃতির নয়, আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিরও প্রতিভূ। আমি নিজে অখণ্ড মানবসংস্কৃতিতে বিশ্বাসী এবং নিজের কাব্যরচনায় এই মৌলিক প্রতীতি অক্ষুণ্ণ রাখায় যত্নশীল। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কলাপে কবির যে ভূমিকা থাকে তা তাঁর সৃষ্টিকেও অংশত প্রভাবিত না করে পারে না। স্রষ্টা একক হলেও তাঁর পিছনে সামগ্রিক সমাজ-মানসের উপস্থিতি অনস্বীকার্য। নানা কবির কবিতার বিভিন্নতা কবি-মানসিকতার বিভিন্নতারই প্রকাশ মাত্র। বলা বাহুল্য কবি-মানসিকতার এই ভিন্নতা সৃষ্টি হয় কবির শিক্ষা-দীক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিশিষ্টতা থেকে। কবি শুধু বর্তমান সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণকারীই নন, তিনি, বহুক্ষেত্রে ভাবী সংস্কৃতিরও নিয়ামক। বর্তমান যুগে রবীন্দ্র-সংস্কৃতির চর্চা আমার এ উক্তির যথার্থ্য কিছু পরিমাণে প্রতিপন্ন করে। তবু আমি মনে করি সৃষ্টির ক্ষেত্রে কবি ঈশ্বরের মতই একক, অনন্য ও নিরপেক্ষ। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:** 'করাল সময়'। কলকাতায় আমার তৎকালীন বাসগৃহ ৫০এ, বালিগঞ্জ প্লেসে ১৬ই জুলাই ১৯৬৭ সালে রচিত। এটি 'সাতরঙ' শারদীয়া সংখ্যায় ১৩৭৪ সালে প্রকাশিত। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান আমি যথেষ্ট উচ্চ বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথ যে উঁচু তারে আমাদের মন বেঁধে দিয়ে গেছেন তাঁর কালে, তৎপরবর্তীকালে বাংলা কবিতার বহুমুখী অগ্রগতি হয়েছে এবং হচ্ছে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** আধুনিক কবিতা বলতে আমি কোন বিশেষ মানসিকতার কবিতা বুঝি না—বুঝি সময়-চিহ্নিত কবিতা। যে কোন ভালো কবিতা যে সময়েই রচিত হোক তার একটা কালাতীত মূল্য থাকে। আজ যা আধুনিক কবিতা বলে পরিচিত কাল

তা কাব্যধারা বদলে যায় ফলে 'অনাধুনিক' হয়ে উঠতে পারে কিন্তু অ-কবিতা নিশ্চয়ই হয় না। সাধারণভাবে আমি কবিতার ভবিষ্যতে বিশ্বাসী। মানুষের মনে যতদিন প্রেম ঘৃণা প্রভৃতি মৌল প্রকৃতিগুলি থাকবে—থাকবে আত্মানুসন্ধীয় এ ইতিহাস-চেতনা ততদিন কবিতাও তার সঙ্গী হয়ে থাকবে।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: সাক্ষর (সম্ভবতঃ ১৯৬৪), বসন্ত বাহার (১৯৬৫)।
সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা, সংকলন ও প্রকাশ কাল: মাসিক মাতৃভূমি (যুগ্ম সম্পাদক) মালঞ্চ, দৈনিক কৃষক (সহঃ-সম্পাদক)।
সম্পাদিত সংকলন: '১৩৫৪ সেবা কবিতা'।

করাল সময়

সুচতুর শিকারী বিড়াল
লুকিয়ে যতই খাক দুধ মাছভাজা
একদিন ভাঙে তার সব জারি জুরি
গৃহিণীর খুন্তি বেড়ি কাটারির ঘায়ে।

তারপর ভাঙা পায়ে
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে
বাদবাকি জীবনটা কাটে:
এঁটোকাঁটা যা পায় সে চাটে।

ফাঁকির পাখীটা ঠিক সময়ের জালে
একদিন ধরা পড়ে যায়;
সে কথা থাকে না মনে
যত পড়ি পুঁথির পাতায়।

চুরি-করা সর দুধ মাছভাজা খেয়ে
আপাতত যত জোর করি না সঞ্চয়
সব তার শুষে নিতে
অদূরে দাঁড়িয়ে থাকে করাল সময়।

মণীন্দ্র রায়

যে কথা শুনিয়েছিল গ্রাম্য-কবিয়াল, তার ছন্দ মনে নেই, কিন্তু বুকে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, সে আগুনে মশাল জেবলে বন্ধুর-সড়ক গ্রাম গঞ্জ পেরিয়ে আজ বাংলা কবিতার ঈর্ষণীয় স্থানে এসে দাঁড়িয়েছেন চল্লিশের প্রথম সারির কবি মণীন্দ্র রায়। মানুষের বাঁচার সংগ্রাম, অবহেলিত মানুষের ধূমায়িত ক্ষোভ—অমিল থেকে মিলের সীমান্তে সুখের মেলাকে নিপুণ শিল্পীর মতো এ'কেছেন—'যেন রাত্রি-স্তব্ধতার বুকে ক্রমাগত, বেজে যাচ্ছে পাগলা-ঘণ্টি কয়েদখানায়।' যুদ্ধোত্তর বাংলার আত্মিক দৈন্য, হতাশাবোধেও এই কবি, জীবনকে পুরনো কাপড়ের মতো ছুঁড়ে ফেলে না দিয়ে অমোঘ প্রত্যয়ে বলেছেন—নিজের ভেতরে লাফ, নিজেকে ছাড়িয়ে/অপরাজিতের ইচ্ছা/আমি বে'চে থাকি। যুগযন্ত্রণা থেকে সরে এসে নয়, যুগের যন্ত্রণার সঙ্গে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সমীকরণে এবং ঋজু বক্তব্যে, শব্দচয়ন, রূপকল্পের ত্রিবেণী সংগমে বাংলা-কবিতাকে স্বতন্ত্র মহিমায় স্রোতস্বিনী করেছেন কবি মণীন্দ্র রায়।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: শীতলাই, পাবনা। ১৯১৯, ৪ঠা অক্টোবর। ১৭বি, সুইনহো স্ট্রীট, কলকাতা-১৯। **জীবিকা:** সাংবাদিকতা। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** দাদুরী। **প্রকাশ সন:** ১৯৩৬। **কবিতাটি কোন্ পত্রিকায় মুদ্রিত:** পরিচয়। **প্রথম জীবনে কারো কবিতা কি আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** অনেকেরই। প্রথমে একজন গ্রাম্য কবি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমাদের গ্রামে এসেছিলেন। আমার বয়স তখন ৯/১০ বছর। তাঁর নিজের কবিতা আবৃত্তি করছিলেন তিনি, গ্রামের লোকেরা সাগ্রহে শুনছিল। এটা দেখে আমার খুব উৎসাহ জাগে। মনে হল এঁর মতোই যদি দেশের কথা বলতে পারি সকলে আমার কথা শুনবে। **আপনার প্রিয় বিদেশী কবি:** শেকস্পীয়ার, দান্তে, মায়াকভাস্কী, নেরুদা, আরাগঁ, আনা আখমাদুলিনা। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** প্রথম সারিতে। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে রাজনৈতিক কর্মীর ভূমিকার মতোই কবির ভূমিকাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। (সমাজব্যবস্থা না বদলালে যে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সম্ভব নয়, তা বলাই বাহুল্য।) কবির কাজ এ ব্যাপারে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যায় ভিয়েতনামের দিকে তাকালে। যুদ্ধক্ষেত্রে বসেও মুক্তিযোদ্ধারা কবিতা লিখছেন। তাতে বোঝা যাচ্ছে: একই লড়াইয়ের দুটি দিক হল রাইফেলের লড়াই, আর কলমের লড়াই—সংস্কৃতির লড়াই। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** কবিতার ওপর এর প্রভাব অসামান্য। কবিতা জ্যান্ত, নতুন, এবং জীবনের সহযাত্রী হতে থাকবে।--নতুন জীবনের প্রেরণা দেবে। **স্বরচিত আপনার প্রিয় কবিতাটি:** ইয়াসিন মিয়া। **কবে, কোথায়, কবিতাটি রচিত। কোথায় প্রকাশিত:** ইয়াসিন মিয়া কবিতাটি তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা। 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত। জীবনে দুঃখ আসতে পারে, কিন্তু দুঃখ বিলাস নয়, কাজে জড়িয়ে থেকেই দুঃখকে পার হতে হয়। এবং মানুষের আয়ু কমবেশি হতে পারে, কিন্তু জরুরী কথা হল 'কে কেমন কাজে লাগায়।' **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** সবার উপরে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** সীমাহীন—প্রায় মানবজীবনের মতো। কারণ আধুনিক কবিতা জীবনেরই সহযাত্রী।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: ও প্রকাশ সন: ত্রিশঙ্কু (১৯৩৯), একচক্ষু (১৯৪২), ছায়াসহচর (১৯৪৪), সেতুবন্ধের গান (১৯৪৮), অন্যপথ (১৯৫১), কৃষ্ণচূড়া (১৯৫৫), অমিল থেকে মিলে (১৯৫৪), মুখের মেলা (১৯৫৯), অতিদূর আলোরেখা (১৯৬২), কালের নিস্বন (১৯৬৫), মোহিনী আড়াল (১৯৬৬), নদী ঢেউ ঝিলিমিলি নয় (১৯৬৭), এই জন্ম, জন্মভূমি (১৯৬৯), ভিয়েতনাম (১৯৬৯), নাটকের নাম ভীষ্ম (১৯৭০), জামায় রক্তের দাগ (১৯৭০)।

সম্পাদিত পত্রপত্রিকা ও সংকলন, প্রকাশ কাল: ৪ খানা। সীমান্ত (১৯৪৬), এক বছরের কবিতা (১৯৬৫) তিন যুগের কবিতা (১৯৬৫), উজান যমুনা (১৯৬৬), মণীন্দ্র রায়ের সংকলিত কবিতা (১৯৬৪), মণীন্দ্র রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭০), প্রেমের জন্য (১৯৭০)।

ইয়াসিন মিয়া

দেখা হল শব্জির বাগানে।
তখন বিকেল। ছোট চারাগুলি ইয়াসিন একা
দ্রুত পরিচর্যা করে। শূন্য দিকসীমা।
অবনীর ডাকে ফিরে তাকাল যখন
রৌদ্রবিচ্ছুরিত মুখে ঘামে-ভেজা জ্যোতির আভায়
ফোটে যেন ঋষির মহিমা।

এ-ছিল অকল্পনীয়। বাজেপোড়া অশথে পিপুলে
হয়তো বা কিশলয় জাগে, কিন্তু মানুষে কি অতো
দারুন বিষের জ্বালা পার হ'য়ে নীলকণ্ঠ কেউ।
অবনী তো আজো সেই বৈশাখের ঝড়ে
বাসাভাঙা ডানা তার আকাশের পরিক্রমা থেকে
ফেরাতে পারেনি কোনো শাখার উপরে।

একই গ্রামে ছিল দুইজনে
বহুদিন। অবনী যুবক, ঘুরে ফিরে
অবশেষে এইখানেই পাঠশালার ম্লান শিক্ষাব্রতী।
ইয়াসিন চাষী, তার একক সন্তান রহিমের
বিবাহের স্বপ্নে ভোলে মৃতদার প্রৌঢ়ের বিষাদ।
এরি মাঝে এল সেই ভয়ঙ্কর ক্ষতি।

দৃশ্যের আড়ালে বুঝি আরো কিছু আশ্চর্য ঘটনা
ছিল, অবনীর মন উচ্ছল ঢেউয়ের
নিচে কী জটিল স্রোতে জীবনের দুদিকের পাড়
ভাঙে গড়ে তা জেনেছে, নিজেকেও সরিয়ে রাখেনি।
'তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে' শিখেছে কবে, আর
এখন সে হাতে নিল তীক্ষ্ণধার ছোরা!

খবরের কাগজে সবাই
পরবর্তী ইতিহাস জেনেছে, হাজার

চাষীর খামারে ওঠে তেভাগার উপদ্রুত সাড়া।
সেদিন সুলালগঞ্জে হিংস্র ক্ষুধা খাণ্ডবের রোষে
জ্ব'লে গেল কতো ঘর—একটি কিশোর
সূর্যাস্তের সে তিমিরে প্রাণ দিয়ে হল সন্ধ্যাতারা।

এখনো স্মৃতির পটে দেখা যায় রহিমের দেহ—
রক্তপরিপ্লুত, মৃত, চোখে তবু কী এক জিজ্ঞাসা!
অন্ধকারে জোয়ারের মতো তার ক্ষুব্ধ ঢেউয়ে ঢেউয়ে
দাঁড় ছিঁড়ে ভেসে গেছে অবনীর মন।
দীর্ঘ দুবছর জেলে ভেবেছে, কী বলে ঐ গ্রামে
দাঁড়াবে, কী অভিযোগ শুনবে তখন!

আর, প্রথমেই দেখা তারি সঙ্গে যার
সর্বস্ব গিয়েছে, যার জীবনের আশার শিকড়ে
পরুষ কুঠার নেমে শুকিয়েছে উদ্ভিন্ন মুকুল।
মনে হল ফিরে যাবে, কিন্তু ঐ শিরাওঠা হাতে,
শ্বেত কাশগুচ্ছ চুলে, বসার ভঙ্গিতে, দ্রুত কাজে
কী করুণ স্নেহ ছিল, দেখে চোখ পারেনি ফিরাতে।

কাছে গিয়ে ডেকেছে সে, 'ইয়াসিন মিয়া,
ভালো আছো?' 'খোদাতালা রেখেছে যেমন!'
'আমি অপরাধী!' 'সে কি! সকলেরি আয়ু
এক নয়। বড় কথা, কে কেমন কাজে তা ফুরায়।
আল্লার বিচারে জানি রহিম করেনি কোনো ভুল।
কবে এলে মাষ্টার মশায়?'

অবনী বসল ঘাসে। একথা সেকথা
ব'লে অবশেষে তার মনের কপাট
খুলেছে সে, 'বল তো কী ক'রে
পার হ'য়ে এলে ঐ দুঃখের সাগর?
বল তো কী ক'রে আছ বেঁচে?'—
একালের নচিকেতা খোঁজে যেন রহস্যের জড়!

কতোক্ষণ দূরে চেয়ে ভাবে ইয়াসিন।
তারপর অপ্রতিভ হাসি টেনে বলে,

সে কথা জানি না। শুধু কাজ করে গেছি প্রতিদিন।
যখনি অস্থির মন, জ্বালা ধরে বুকে,
কাজে ডুবে পেয়েছি আরাম।
এছাড়া আর কী আছে! আদাব।' 'সালাম'।

ঝুঁকে ঝুঁকে চলে যায় আসন্ন আঁধারে
শীর্ণ দেহখানি তার। কাজে ডুবে পেয়েছে আরাম?
দুটি পাখি উড়ে গেল; আলো জ্বলে কার আঙিনায়।
পৃথিবী চলেছে। হেসে অবনী জানাল মনে মনে--
এ জীবন এত স্বচ্ছ, বাণী তার এতোই আদিম,
অথচ মানুষ তার লিপি ভুলে যায়!

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

'পালাবার পথে ধুলো ওড়ানোব দঙ্গলে, ভাই/আমিও ছিলাম একজন আজ প্রাণপণে তাই/ ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লাল ঝাণ্ডা ওঠাই।' সত্যিই সেদিন কবি ভীরুতার মুখে প্রচণ্ড লাথি মেরে কবিতায় লাল ঝাণ্ডা উড়িয়েছিলেন—প্রবেশ করেছিলেন সাহিত্য-জগতে দিগ্বিজয়ীর মত—জয় করেছিলেন শত শত পাঠকের মন, বলেছিলেন—কমরেড নবযুগ আনবে না? কিন্তু সময়ের আবর্তে সংসারের বোঝা সত্যিই কি ক্লান্তি এনে দিয়েছিলো তার—সত্যি কি সাজাতে চেয়েছিলেন ঘর, বদরিকা পাখি কিনতে গিয়েছিলেন মেলা থেকে? বাগ্‌রীতির সংগে মুখের ভাষা শব্দের ঝংকারে কবিতায় মীড়ের আওয়াজ তুলেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ছন্দ প্রয়োগ, শব্দ নিক্ষেপ, স্যাটায়ার, প্রতীকধর্মতা সব কিছু মিলেমিশেই সুভাষ অনবদ্য।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: কৃষ্ণনগর, ১৯১৯, ৫-বি ডাঃ শরৎ ব্যানার্জী রোড, কলি-২৯। **জীবিকা:** লেখা আর তর্জমা। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** সত্যভামা স্কুল ম্যাগাজিন 'ফল্গু'তে। নাম মনে নেই। **প্রকাশ সন:** সম্ভবত ১৯৩৩। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:** ঐ। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** রবীন্দ্রনাথের। **প্রিয় বিদেশী কবি:** এলিয়ট, হুইটম্যান, আরাগঁ, মায়াকভস্কি, পাস্তেরনাক, নেরুদা ইত্যাদি। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** সমাজের সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতির সঙ্গে সংস্কৃতির প্রশ্নটি জড়িত। সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটানো কবির অন্যতম দায়। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** প্রশ্নটি আমার কাছে স্পষ্ট নয়। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি—কবে, কোথায় রচিত। কোথায় প্রকাশিত:** প্রিয় কবিতা 'নির্বাচনিক' (?) ১৯৩৯-এর গোড়ার দিকে নদীয়ার জয়রামপুর গ্রামে আই-এ পরীক্ষান্তে ছুটিতে লেখা। 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** এখনও সর্বাগ্রে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** এখন-কার কবিতা ভবিষ্যতে কী রূপ নেবে, না আজকের কবিতার কী ভবিষ্যৎ? প্রশ্নটি যে অর্থেই করা হোক, ভবিষ্যদ্বাণীতে আমার রুচি নেই। আধুনিক কবিতার একমাত্র ভবিষ্যৎ বোধহয় ভবিষ্যতে ভূতপূর্ব হওয়া।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশকাল: পদাতিক (১৯৪০), অগ্নিকোণ (১৯৪৮), চিরকুট (১৯৪৯), সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা। যতই দূরে যাই। কাল মধুমাস। এক ভাই (১৯৭০)।

সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা: পরিচয়, সন্দেশ, কেন লিখি, প্রাচীর।

নির্বাচনিক

ফাল্গুন অথবা চৈত্রে বাতাসেরা দিক্ বদলাবে।
কথোপকথনে মুগ্ধ হবে দুটি পার্শ্ববর্তী সিঁড়ি,—
"অবশ্যকর্তব্য নীড়।" (মড়াকাটা ঘর,—স্থানাভাবে?)

নখাগ্রে নক্ষত্রপল্লী; ট্যাঁকে টুকরো অর্ধদগ্ধ বিড়ি।
মাংসের দুর্ভিক্ষ নইলে ঋষি মনে হতো হাবভাবে।
বিকৃতমস্তিষ্ক চাঁদ উল্লাঙুল স্বপ্নে অশরীরী।

বিকালে মসৃণ সূর্য মূর্চ্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ।
মন্দভাগ্য বার্সিলোনা রেস্তোরাঁতে মন্দ লাগবে না।
সাম্য অতি খাসা চিজ!—অনুচিত কিন্তু রাজদ্রোহ!

'জীবন বিস্বাদ লাগে!'—ইত্যাদিতে ইতস্তত দেনা।
এবার আত্মাকে, বন্ধু, করা যাক প্রত্যাহার। (অহো!
সম্প্রতি মাঘের দ্বন্দ্বে ছত্রভঙ্গ দক্ষিণের সেনা।

সদলে বসন্ত তাও পদত্যাগ পত্র পাঠাবে না?)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কোনরকম ভাঁড়ামী নয়, কবিতাকে রক্তের মধ্যে অনুরণিত করেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিপথে প্রলোভন ছিল অনেক, কিংবা কবিতাকে 'হবি' হিসেবেও গ্রহণ করলে অসুবিধে ছিল না; কিন্তু কবিতাকে এই পৃথিবীর অন্যায় অবিচার সুবিধাবাদ এবং মেকি মানুষগুলোর উপরে চাবুকের মতো ব্যবহার করেছেন। রাজনৈতিক বিবর্তন তার কবিতাকে অলংকৃত করেছে। ছন্দে মেজাজে, বক্তব্যে, বীরেনবাবু বরাবরই আলাদা ধাঁচের এবং এই জন্যেই এই সংকবিকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা যায়।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: বিক্রমপুর, ঢাকা। ১৯২০, ২রা সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। ১৪, ষ্টেশন রোড, ক'লকাতা-৩১। **জীবিকা:** চাকুরী। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** মনে নেই। **প্রকাশ সন:** মনে নেই। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:** মনে নেই। **প্রথম জীবনে কাঁর কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** মহাভারত, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ। **প্রিয় বিদেশী কবি:** প্রাচীন চীনা কবিতা, ব্রাউনিং, ওয়াল্ট হুইটম্যান। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** অনিবার্য। সংস্কৃতিকে যাঁরা সামনের দিকে এগিয়ে দেন, তাঁদের মধ্যে কবিরা চিরদিনই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। বাল্মিকী,

বেদব্যাস, হোমার, দান্তে থেকে সুরু ক'রে আজকের রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর কবিরা এই ভূমিকা কীভাবে পালন করেছেন; একটু তলিয়ে দেখলেই আশা করি প্রশ্নের উত্তর স্বচ্ছ হবে। এই ভূমিকা বিভিন্ন কবি বিভিন্নভাবে পালন ক'রে থাকেন। কালিদাস, সেক্সপীয়র, শেলী অথবা জীবনানন্দ দাশ কেউই ঠিক অপর কোন খ্যাতনামা কবির রাস্তা ধরে অগ্রসর হননি। সংস্কৃতির দিগন্তকে তাঁরা নিজেদের কবিগুণে প্রসারিত ক'রেছেন। আমরা যারা প্রথম শ্রেণীর কবি নই, আমাদেরও কাজ থাকে পরিশুদ্ধ মানব সমাজের স্বপ্ন দেখার এবং প্রচন্ড অন্ধকার ও পেছনটান-কে অতিক্রম ক'রে শিল্প ও সাহিত্যকে প্রবাহিত মনুষ্যত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। এজন্য কবিকে যদি মিল্টনের মত অন্ধ, শেলীর মত দেশ-ত্যাগী অথবা লরকার মত নিহত হ'তে হয়, কিংবা রোমা র'লার মত কারাগারেই জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাতে হয়, কবি সেই প্রচন্ড মারকেও অনায়াসে সহ্য করেন; তবু এগিয়ে চলার ধর্মকে তিনি কিছুতেই পরিত্যাগ করেন না। আমি এমন কথা বলি না যে সংস্কৃতির দিগন্তকে প্রসারিত করতে হ'লে কবিকে রাজ-নৈতিক বা সামাজিক নির্যাতন সহ্য করতেই হবে। অথবা, আমার যা রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং চেতনা সেই বিশ্বাস এবং চেতনাকে রক্তে না নিলে কবির কবিতা নিষ্ফল। আমার কাছে দস্তোইএভস্কি এবং হুইটম্যানের মানবতা যদিও গভীর তাৎপর্য বহন করে, র‍্যাঁবো, বদলেয়ার অথবা কাফকার নরকযন্ত্রণাও তার কাছাকাছি কোন সৎ অভিজ্ঞতা বহন করে ব'লে তাঁদের কবিতাও গ্রাহ্য, এবং আমার বিশ্বাস-মতে তাঁরাও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নন, পক্ষে। অন্যত্র অবনীন্দ্রনাথের কবিত্ব অথবা 'রূপসী বাংলার' কবিতাগুচ্ছ অথবা কালিদাসের কবিতা—যা নিছক সৌন্দর্য-বর্ণনা—আমার কবিতাপাঠের পিপাসাকে বাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ, আমি বলতে চাইছি, সৎ-কবিতামাত্রই [অথবা উপন্যাস, নাটক, ছবি এবং যে কোন শিল্প] সংস্কৃতির নিত্যনতুন দিগন্ত আবিষ্কারকে প্রভূত সাহায্য করে এবং সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা যোগায়। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** কবি সারাজীবন ধরে কবিতা লেখেন, আর কবিতা নিশ্চয় তাঁর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সুতরাং সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির যতটুকু ভূমিকা তা তাঁর কবিতাতেও প্রতিফলিত হয়। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:** এ প্রশ্নের এখনি উত্তর দেবো না। তবে সংকলনের জন্যে যে কবিতাটি দিচ্ছি এটিও আমার প্রিয় কবিতা। প্রথম কোথায় প্রকাশিত হ'য়েছিল মনে পড়ছে না, তবে 'মহাদেবের দুয়ারে' প্রথম সংকলিত হয়েছে। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** আধুনিক কবিতা, যা যথার্থ অর্থেই কবিতা, ব্যাঙের ছাতার মত হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি। তার শিকড় অনেক গভীরে, এবং সেই কারণেই তার ভবিষ্যৎ থেকে যায়। আমি কবিতার

অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রচণ্ড আস্থা রাখি। তবে আধুনিক কবিতার নামে চিরকালই কিছু আবর্জনা আসল কবিতার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার থাকে। সময় ঐ আবর্জনা ধুয়ে মুছে দেয়। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কবিতাই তো সবার প্রথমে এবং সর্বশেষে পাঠ্য।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: গ্রহচ্যুত (১৩৪৯), রাণুর জন্য (১৩৫৮), উলুখড়ের কবিতা (১৩৬১), মৃত্যুত্তীর্ণ (১৩৬২), লখীন্দর (১৩৬৩), জাতক (১৩৬৫), তিনপাহাড়ের স্বপ্ন (১৩৭১), সভা ভেঙে গেলে (১৩৭১), মুখে যদি রক্ত ওঠে (১৩৭১), ভিসা অফিসের সামনে (১৩৭৪), মহাদেবের দুয়ার (১৩৭৪), তিনতরঙ্গ রৌদ্রে রাত্রি শিবরাত্রি (যুগ্মভাবে) (১৩৭৪), হাওয়া দেয় (যুগ্মভাবে) (১৩৭৫), মানুষের মুখ (১৩৭৬), শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন (১৩৭৬)।

সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা: উচ্চারণ (অন্যতম সম্পাদক)।

সম্পাদিত কবিতা সংকলন: আমার বাংলা (১ম ১৩৬২|১৩৬৩), কালপুরুষ|রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত (১৩৬৭), দুর্গম গিরি কান্তার মরু|কাজী নজরুল ইসলামকে নিবেদিত (১৩৭১), জীবনায়ন|জীবনানন্দ দাশকে নিবেদিত (১৯৫৪), মানুষের নামে|দাঙ্গার বিরুদ্ধে (১৩৭১), ভিয়েৎনাম (১৩৭৩), অমল মানুষ|ম্যাক্সিম গোর্কিকে নিবেদিত (১৩৭৫), খাড়া পাহাড় বেয়ে|লেনিনকে নিবেদিত (১৩৭৬), ভোরের নক্ষত্র|মাইকেল মধুসূদন দত্তকে নিবেদিত (১৩৬৯), যুগ্মসম্মাদক|ভাইয়ের মুখ (১৩৬৭) যুগ্মভাবে।।

একটি নষ্ট পচা ফলের জন্য

একটি নষ্ট পচা ফলের জন্য
ভিক্ষুকেরা সবাই হাত বাড়ায়,
'আমাকে দাও, আমাকে দাও, আমাকে. ...'
যেন আগুন লেগেছে ঐ পাড়ায়।

ফলটি ছুঁড়ে দিতেই বাধলো দাঙ্গা,
ভিক্ষুকদের খুনোখুনি থামায় কে?

৬
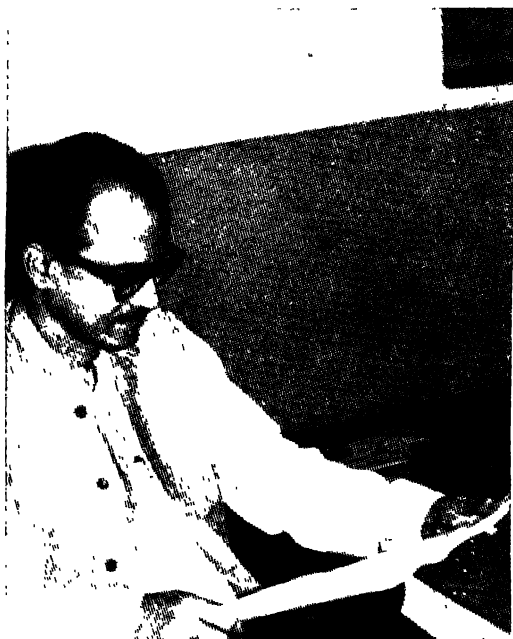
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

'সাংবাদিকী ও প্রচারধর্মী রচনার সঙ্গে কবিতার পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত জিনিসগুলোর ভিতর অভিজ্ঞতা বিশোধিত ভাবনাপ্রতিভার মুক্তি শুদ্ধি ও সংহতি কিছুই নেই কবিতায় তা আছে' —সৎ কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় এ আপ্তবাক্যটি তাঁর কাব্যচর্চায় স্মরণ রেখেছেন। মানবধর্মে অটল, প্রগতিশীল চিন্তাধারার আলোকিত এই কবি স্বল্পবাক্। সময় তাঁর ব্যর্থতা সফলতা নিয়ে উত্তাল অনুভবের তরঙ্গশীর্ষে। গাছের কান্ড থেকে ডালপালা গজানোর মতো অনায়াস নিরুপায় তার কবিতা ভেতরের তাগিদে ফুটে ওঠে।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: নলডাঙ্গা, জেলা—যশোহর (বর্তমানে পাকিস্তানে); তারিখ—১৩২৭ (১৯২০), ১৭ই জুন, বৃহস্পতিবার; বর্তমান ঠিকানা—২৬/৩, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯। **জীবিকা:** চাকরি (সাংবা-

দিকের)। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা**: নাম মনে নেই। **প্রকাশ সন**: ১৯৩৯ সাল। **কবিতাটি কোন্ পত্রিকায় মুদ্রিত**: "আনন্দবাজার পত্রিকা", দোল-সংখ্যা। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: একাধিক কবির। ১৯৩২-এর পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ১৯৩৫-৩৬-এ মোহিতলাল মজুমদারের। ১৯৩৯-এর পর বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা। **প্রিয় বিদেশী কবি**: সম্ভবত, লাতিন আমেরিকা (চিলি)-র কবি পাব্লো নেরুদা। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: পাব্লো নেরুদা-র কবিতার দেহে একাধারে যেমন আধুনিকতম ইয়োরোপীয় কবিতার রূপেব ছোঁয়া আর লাতিন আমেরিকার মিশ্র-স্পেনদেশী রঙের আভা লেগেছে, তেমনি সে কবিতার আত্মা হল আজকের দিনের শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল মানবতাবাদ। তাই আমি মনে করি পৃথিবীর সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে পাব্লো নেরুদার ভূমিকা অনন্য অগ্রবর্তীর। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নেরুদার পরোক্ষ প্রভাব যথেষ্ট। প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা জানা নেই। পরোক্ষভাবে হলেও ব্যক্তি হিসেবে তাঁর কাছে আমার ঋণ সমূহ। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি**: "এ-জমি" **কবে, কোথায় রচিত। কোথায় প্রকাশিত**: ১৯৫৩ সালের মার্চ কিংবা এপ্রিল মাসে লেখা। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ নামে ছোট্ট শহরে (আধা-শহরে) বসে। ওই বছরই প্রকাশিত হয় তৎকালীন "সীমান্ত" পত্রিকায়। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার ভূমিকা অগ্রবর্তীর। নজরুল ইস্লামের কবিতা ১৯২০-'৩০-এর এবং তিরিশের দশকে ও চল্লিশের দশকে তৎকালীন আধুনিক কবিতা সমগ্রভাবে ওই সব দশকের সাহিত্যে মনন, অনুভূতি ও রচনার ধরন নির্ধারিত করে দিয়েছিল। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: কবিতার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎও তাই। তবে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক থাকা ও যত্ন নেয়ারও প্রয়োজন রয়ে যাচ্ছে। কবিতার ভবিষ্যৎ মূলত পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। কেননা কবিতার কলাকৌশল ও প্রকরণ যতই সূক্ষ্ম আর জটিল হোক না কেন, কবিরা সূক্ষ্ম কবিতা লিখে যতই আত্মপ্রসাদ লাভ করুন, মূলত সেগুলি জীবন্ত কবিতা হয়ে উঠছে কিনা তাব ব্যারোমিটার কই? তার বিচারক কে হবে? কবি স্বয়ং এবং তাঁর দু-চারজন পক্ষপাতী বন্ধু? তা হয় না। তাঁরাও ভুল করতে পারেন, ভুল করে থাকেন। সাধারণত কবিতার শরীরকে তার আত্মা বলে ভুল করার একধরনের মস্তিষ্ক-নির্ভর (cerebral) ঝোঁক এই বিদ্বজ্জনদের মধ্যে দেখা যায়। তাই, আমার ধারণা, কবিতা নিরপেক্ষ নিস্পৃহ পাঠককে মনোযোগী ও পক্ষপাতী করে তুলতে পারে কিনা, এটাই কবিতার ভালোমন্দ বাছাইয়ের সবচেয়ে বড় মাপকাঠি। আর

তা করতে হলে কবিতা বস্তুটিকে পাঠকের জীবনের সঙ্গে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করে তোলার যাদুমন্ত্রটি জানা দরকার। এই যাদুই হোল শিল্পবোধ। শিল্প শুধু কবিতার সূক্ষ্ম, জটিল নির্মাণকৌশল মাত্র নয়। কবিতায় সূক্ষ্ম চলনবলনের অনুপস্থিতি যেমন inartistic, তেমনি পাঠককে অভিভূত বা বিচলিত করতে না পারাও কবিতার পক্ষে inartistic হওয়া ছাড়া কিছু নয়। কবিতায় সূক্ষ্মতা আত্মমুখ (subjective) হলে, বা, যাকে বলে, 'পাঠকের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেলে'ও আমি কবিতাকে inartistic বলব। ভয়ের কথা, কিছুকাল ধরে আধুনিক কবিতার পাঠকসংখ্যা কমছে। তাই, গোড়ার কথাটা শেষেও আরও একবার বলি: পাঠক-সংখ্যা কমতিতে নয়, বৃদ্ধিতেই কবিতার ভবিষ্যৎ নিহিত।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন. স্নায়ু (১৯৪১), মনপবন (১৯৪২), তেলেঙ্গানা ও অন্যান্য কবিতা (১৯৪৮), মেঘবৃষ্টিঝড় (১৯৫১), ক'টি কবিতা ও একলব্য (১৯৫৯)। এছাড়া ঘুমতাড়ানি ছড়া (অপর তিনজন কবির সঙ্গে মিলিতভাবে) (১৯৪৭)।
সম্পাদিত সংকলন, পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশ কাল· পরিচয় (১৯৫৬-১৯৬৫), মানুষের সপক্ষে (১৯৫২), হায়, ছায়াবৃতা (১৯৬১)।

এ-জমি

মাঠ......মাঠ......মাঠ
যতদূর চোখ যায় ধুলোয় ধূসর খেত জমি।
বুকে তার এঁকেবেঁকে পড়ে আছে নিথর নিশ্চুপ অজগর
সরকারি রাস্তার বাঁধটা।

দোর্দণ্ড দুপুর শুধু একা বসে থাকে ধুনি জেনুলে।

মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙে স্টেশনটার
চোখ কচলে হাই তোলে, আড়ামোড়া ভাঙে।
দু-মুখে কেন্নোর মত দুই দিক থেকে
ছোট লাইনে ট্রেন আসে
—পশ্চিমে বিহার আর পূবে পাকিস্তান---
দমকে দমকে দেয় উগরে এলোমেলো
আলুথালু জনস্রোত ঃ জলস্রোত
মদেশি ভিন্‌দেশি লোক, দলে দলে উদ্বাস্তু মানুষ।

হঠাৎ হরেক ভাষা বলে তারা হরবোলার মত
হঠাৎ হারিয়ে যায় গঞ্জে গ্রামান্তরে
তেপান্তরে।

সন্ধেটা খানিক বুঝি প্রতীক্ষায় কনে-দেখা-আলো
অন্ধকারে অন্ধ তারপর।
আচম্‌কা মাদল বাজে থেকে থেকে
কাছে.. দূরে দূর থেকে কাছে
রাত যেন উৎকর্ণ দু-কান।

অরুণকুমার সরকার

সাম্প্রতিক তরুণ কবিরা যখন এক একটি লিরিক কবিতা উৎরোতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যান তখন অরুণবাবু আজ থেকে বেশ কয়েকটা বছর আগে অনায়াস ভংগীতে স্বচ্ছন্দ গীতিকবিতা রচনা করে পাঠকমহলে একটি বিশেষ শ্রদ্ধার আসন অধিকার করে নিয়েছেন। ইদানীং অরুণকুমার সরকার লেখেনই না এ অভিযোগ অনেকের। অনুষংগের পারম্পর্যে শব্দের নব নব ব্যঞ্জনায়, অভিজ্ঞতা বর্ণনায়, কবিতাকে যেন ফ্রেমে বাঁধাই করে রেখেছেন যখন 'বৃষ্টিভেজা বাড়ির মতো রহস্যময়/তোমার হাতে আছে আমার একটু সময়'—হৃদয়ের গভীরে নিয়ে আসি তখনই কবিতা প্রতি তন্ত্রীতে গিয়ে সাড়া জাগায়।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: কালিঘাট, কলকাতা। ১৯২১। ৪৫-এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা-২৬। **জীবিকা**: কলকাতা কাস্টমস হাউসের এ্যাপ্রেজর। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা**: যীশুখ্রীষ্ট। **প্রকাশ সন**: ১৯৩৯। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত**: দেশ। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: মাইকেল, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ এবং তিরিশ দশকের প্রত্যেকটি কবি। **প্রিয় বিদেশী কবি**: উইলিয়ম ব্লেক। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: অপরোক্ষ হলেও অমোঘ। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: দীর্ঘস্থায়ী। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত**: শান্তিনিকেতনে, ১৯৫০ সালে, 'দূরের আকাশ' কাব্যগ্রন্থে। **বাংলা সাহিত্যে কবিতার স্থান**: সব চাইতে উঁচুতে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: খুবই আশাপ্রদ।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: 'দূরের আকাশ' (১৩৫৯), যাও, উত্তরের হাওয়া (১৩৭২)।
সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা: উচ্চারণ (অন্যতম সম্পাদক)।

শান্তিনিকেতন থেকে (অশোক মিত্র-কে)

সে-কোন্ নারীকে আমি ভালোবেসে ক্ষয়ে যেতে পারি
কঠিন অসুখে ভুগে? কাঁপে একেশিয়ার শরীর
ছায়ায় কাঁকরে পথে রতনকুঠিতে জ্যোৎস্নায়।
কেউ জেগে নেই আর। কেউ নেই। খোয়ায়ে প্রান্তরে
শীতের কুয়াশা স্থির প্রতিকৃতি রবীন্দ্রনাথের।
হঠাৎ বাতাস আসে। থেমে যায়। কাঁপে, রাত্রি কাঁপে।
সে-কোন্ নারীকে আমি ভালোবেসে ক্ষয়ে যেতে পারি?

সে-নারী কবিতা? কথা? অশরীরী শব্দের ব্যঞ্জনা?
হয়তো। অস্পষ্ট সব। শান্তিনিকেতনে জ্যোৎস্নায়
সমস্ত বেদনা দুঃখ কান্না শোক কথা-শরীরিণী
রবীন্দ্রনাথের গানে। তাঁর দিগ্‌বিস্তৃত চেতনা
খোয়ায়ে প্রান্তরে দূরে কাছে একেশিয়ার শরীরে
আমার হৃদয়ে ব্যাপ্ত, সঞ্চারিত স্নায়ুতে স্নায়ুতে :
সে-কোন্ নারীকে আমি ভালোবেসে ক্ষয়ে যেতে পারি?

নরেশ গুহ

তীব্র রোম্যান্টিক কবি নরেশ গুহের কবিতা, সুরে, ছন্দে, ভাষায়, লিপিচাতুর্যে আলাদা মেজাজের একটি নিটোল বস্তু রচনা করে। চল্লিশের স্মরণীয় কবি নরেশ গুহকে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার পাঠকরা আজ কাছে পাচ্ছেন না অথচ আজও যখন—'দিন ভরে ওঠে স্বাদে, ভরে রাত/তুমি কাছে নাই।/বসন্তের জানালার মাঘের রাতের শীত/একলা পোহাই।' তখন কবির বিষাদমগ্ন চেতনার সঙ্গে আমাদেরও মন ভরে ওঠে।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: টাঙ্গাইল, ১৯২৪। বহুদিন ধ'রে ৫, সত্যেন দত্ত রোড, কলকাতার এই ঠিকানায় আছি। **জীবিকা**: যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য পড়াই। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা**: কলকাতায় ছোটোদের কোনো মাসিকে। বিষয়টা ছিল ভাদ্র মাসের আগমনে গ্রাম্য বালক কবির পুলক। **প্রকাশ সন**: তখন পূব বাংলায় ইশকুলে পড়তুম। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত**: দরকার কী সেসব টেনে বের করার? **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: কিশোর বয়সে, বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ। **আপনার সবচেয়ে প্রিয় বিদেশী কবি**: এক নন, একাধিক। তার মধ্যে আছেন লিপো, বোদলেয়ার, ইয়েটস্‌, এলিয়ট। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: কবি হিসেবে কবির একমাত্র কাজ যদ্দূর সম্ভব ভালো কবিতা লেখা যাতে একটিও

বানিয়ে বলা কথা থাকবে না। কাজটা দুরূহ। করে উঠতে পারলে। তাতে সংস্কৃতির উন্নতি মনে করলেই উন্নতি। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব :** কার প্রভাব ? কিসের প্রভাব ? **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত :** আমার প্রায় সব লেখাই 'কবিতা'য় ছাপা হয়েছিল। যেমন "অলৌকিক" কলকাতায় লেখা, ১৯৪৯ সালে অরুণকুমার সরকারকে চিঠিতে। যেমন "শান্তি-নিকেতনে ছুটি" অশোক মিত্রের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়ে। "লোকটা" নামে 'চতুরঙ্গে' বেরিয়েছিল একটি কবিতা, বিজলি আলো পৌঁছবার আগে তিনদিন একা ছিলুম সারনাথে, তখন লেখা। আরো আছে, কিন্তু আপনাদের ধৈর্য থাকবে না। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান :** কবিতা ভালো হ'লে প্রথম সারিতে বলা বাহুল্য। আধুনিক হোক, প্রাচীন হোক, কিছু এসে যায় না, যদিও কাকে কবিতা বলে সে বিষয়ে ধারণাটি যে আবহমানকাল থেকে অপরিবর্তনীয় আছে তাও নয়। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ :** ভবিষ্যতেও আধুনিক কবিরা লিখবেন, এবং যাঁদের রুচি হয় পড়বেন, এইমাত্র বলা যায়। তবে কবিদের বুড়ো আঙুল কেটে ফেললে কী করবেন জানি না।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: 'দুরন্তদুপুর', (১৯৫১)
সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা: 'কবিতা' (১৯৫৩) [সহ সম্পাদক]

অলৌকিক

কলকাতায় বেঁচে আছি শুধু এই মহাপুণ্যবলে
এখনো গলির মোড়ে প্রায়শ সন্ধ্যায় আলো জ্বলে,
ভোরে কলে জল আসে, কখনোবা পাশের বাড়ির
দ্বিতল রেলিঙে ঝোলে সদ্যস্নাত জাফরাণী শাড়ির
আঁচলের প্রান্তভাগ। কী আশ্চর্য, প্রহরে প্রহরে
পাড়ার বস্তির কোণে রাত্রি ছিঁড়ে দস্যুতার স্বরে
কুঁকড়োর ঘোষণা ওঠে। ক্লান্তিহীন কী অধ্যবসায়
একফোঁটা কালো মাছি দুপুর বিরক্ত ক'রে যায়
নানাখানা উড়ে উড়ে। চায়ের উদ্বৃত্ত কিছু চিনি
খুঁটে তুলে নিয়ে যায় এক সার পিঁপড়ে প্রতিদিনই
নিপুণ নিষ্ঠায়। আর জানালায় দু'গজ আকাশ—
দু'গজ বেগনি নীল কমলা কি ফ্যাকাশে পাঙাস—
বারোমাস উপস্থিত।

অন্ধকারে ফস্ ক'রে জ্বালো
সরু দেশলাই কাঠি, ঘর ভরে মৃদুনীল আলো!
বিলিতি এ্যান্টিকে ছাপা সদ্য কিনে আনা কোনো বই
বুক ভ'রে গন্ধ দেয়, ডরে ভয়ে সুযত্নে লুকোই,
যেন কার প্রেমপত্র, বন্ধুদের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে।
(দিনে থাক, আলো জেলে রাত্রে পড়া যাবে চেখে চেখে।)
আর কী আশ্চর্য কান্ড, ছয় রাত্রি যেই হয় পার,
হাসিতে আটখানা মুখ ফিরে আসে লাল রোব্বার,
ভাসমান লাল বয়া, ছয়দিন সমুদ্র সাঁতরিয়ে
জাহাজডুবির পর। আসন্ন এ-রবিবার নিয়ে
মনে বুঝি, জীবিকার পশুটার লোমশ থাবায়
বিদীর্ণ হলেও তবু শনিবার ঘরে ফেরা যায়
শিস দিয়ে।
আর, দেখ, চিঠির বাক্সটা যেই খুলি,
রোজ কিছু চিঠি থাকে! অলৌকিক কে ডাকপিওন,
রেখে যায় রোদ্দুরের চৌকো খামগুলি!

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বাংলা কবিতার কি ফর্ম, কি বিষয়বক্তব্যে, ছন্দে, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নিয়তই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। একই সংগে লিরিক এবং যুক্তিনিষ্ঠ অনাবেগ কবিতা রচনায় তিনি বিস্ময়কর-ভাবে সিদ্ধ। সাম্প্রতিক অধিকাংশ প্রবীণ কবিরাই যখন দুর্বোধ্যতার অর্থহীন অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলছেন, নদীপারাপারের ব্যর্থ চেষ্টা করছেন, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী সেখানে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে পারাপারের শক্ত ছন্দোময় সাঁকো তৈরী করছেন এবং এইজন্যেই তিনি বাংলা সাহিত্যে একজন প্রথম সারির কবি।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: আমার জন্ম পূব-বাংলায়। ফরিদপুর জেলার ছোট একটি গ্রামে। জন্ম-সন ১৯২৪। ১৯ অক্টোবর, রবিবার। এখন কলকাতায় আছি। **জীবিকা:** সাংবাদিকতা। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** কবে কোথায় আমার কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, মনে পড়ে না। একবার একটা বিয়ের উপহার লিখেছিলাম। কে জানে, সেইটেই হয়ত ছাপার হরফে আমার প্রথম পদ্য। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস। **সবচেয়ে প্রিয় বিদেশী কবি:** 'সবচেয়ে' কথাটা আমার ভাল লাগে না। প্রিয় অনেকেই। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** রাজনীতিক কিংবা আমলাদের ভূমিকাব চাইতে নিশ্চয়ই অনেক বড়। **স্বরচিত প্রিয় কবিতা:** স্বরচিত কোনো কবিতাই আমার প্রিয় নয়। এখানে যে কবিতাটি দিচ্ছি, তার বদলে অন্য যে-কোনও কবিতা দেওয়া যেত। তাতে কোনও ইতর-বিশেষ হত বলে আমার মনে হয় না। 'চতুর্থ সন্তান' কিংবা কলকাতার যীশু'র মধ্যে যে কোন একটা নিতে পারেন। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** আমি কবিতা লিখি, ফ্যাশনের কারবার করি না। কোনটা আধুনিক ফ্যাশনের কবিতা, কোনটা সেকেলে, আমার জানা নেই। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** আধুনিকতর কবিতার কাছে পরাস্ত হওয়া।

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: নীল নির্জন (শ্রাবণ, ১৩৬১), অন্ধকার বারান্দা (চৈত্র, ১৩৬৭), প্রথম নায়ক (আষাঢ়, ১৩৬৮), নীরক্ত করবী (মাঘ, ১৩৭১), নক্ষত্র জয়ের জন্য (বৈশাখ, ১৩৭৬), কলকাতার যীশু (অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬), শ্রেষ্ঠ কবিতা (বৈশাখ, ১৩৭৭)। পত্রপত্রিকা সম্পাদনা: কলেজে ছাত্রাবস্থায় 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকা সম্পাদনা করেছি।

কলকাতার যীশু

লাল বাতির নিষেধ ছিল না,
তবুও ঝড়ের-বেগে ধাবমান কলকাতা শহর
অতর্কিতে থেমে গেল:
ভয়ংকরভাবে টাল সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল
ট্যাক্সি ও প্রাইভেট, টেমপো, বাঘমার্কা ডবলডেকার।
'গেল গেল' আর্তনাদে রাস্তার দু-দিক থেকে যারা
ছুটে এসেছিল—
ঝাঁকামুটে, ফিরিওয়ালা, দোকানী ও খরিদ্দার--
এখন তারাও যেন স্থির চিত্রটির মত শিল্পীর ইজেলে
লগ্ন হয়ে আছে।

স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখছে,
টালমাটাল পায়ে
রাস্তার এক-পার থেকে অন্য-পারে হেঁটে চলে যায়
সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি শিশু।

খানিক আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে চৌরঙ্গীপাড়ায়;
এখন রোদ্দুর ফের অতিদীর্ঘ বল্লমের মতো
মেঘের হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে
নেমে আসছে;
মায়াবী আলোয় ভাসছে কলকাতা শহর।

স্টেটবাসের জানালায় মুখ রেখে
একবার আকাশ দেখি, একবার তোমাকে।
ভিখারী-মায়ের শিশু,
কলকাতার যীশু,
সমস্ত ট্রাফিক তুমি মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছ।
জনতার আর্তনাদ, অসহিষ্ণু ড্রাইভারের দাঁতের ঘষ্‌টানি,
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই;
দুদিকে উদ্যত মৃত্যু, তুমি তার মাঝখান দিয়ে
টলতে টলতে হেঁটে যাও।
যেন মূর্ত মানবতা, সদ্য হাঁটতে শেখার আনন্দে
সমগ্র বিশ্বকে তুমি পেতে চাও
হাতের মুঠোয়। যেন তাই
টাল্‌মাটাল পায়ে তুমি
পৃথিবীর এক-কিনার থেকে অন্য-কিনারে চলেছ।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

প্রতিটি কবিতাই জগন্নাথ চক্রবর্তীকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। প্রখর পাণ্ডিত্য তাঁর কবিতার বোঝা হয়ে দাঁড়ায়নি অথচ সমাজসচেতন, মূলতঃ লিরিক এই কবির স্বতন্ত্র এক মেজাজ। কবি যখন অনায়াস তীর্যক-ভঙ্গিতে বলেন—যেন বারে বারে ট্রেণ এসে থামে/উতল/জংশনে কি জানি কে নামে?/দ্বিপ্রহর নিদারুণ জুন/আপ না ডাউন?' তখন পথে যেতে যেতে পুকুরে নুড়ি ফেলার মত শব্দগুলো ঢেউ হয়ে হৃদয়ে এসে মেশে। তখনই কবিকে স্বকীয়তায় মনে হয়।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: যশোহর (পূর্ব পাকিস্তান)। ১৯২৪। ২৩-বি বাদে রায়পুর রোড, কলিকাতা-৩২ (যাদবপুর)। **জীবিকা**: অধ্যাপনা

(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য বিভাগের রীডার)। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** "মরণের পারে" মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত। বাংলা ১৩৪৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়; আমি তখন হাইস্কুলের ছাত্র। **প্রকাশ সন:** বাংলা ১৩৪৫ (ইংরেজি ১৯৩৮)। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:** মাসিক বসুমতী। **প্রথম কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'। 'উদ্বুদ্ধ' করেনি, এই একমাত্র কাব্যগ্রন্থ যা আমার প্রকৃতই ভাল লেগেছিল এবং কবিতার রাজ্যে আমার মনকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, কবিতা লিখবার জন্য আমাকে ব্যগ্র করে দিয়েছিল। অথচ এই কবিতা আমি সজ্ঞানে কোথাও অনুকরণ করিনি। **প্রিয় বিদেশী কবি:** স্যাঁ-জন-পের্স; হোমার (ইংরেজি অনুবাদে)। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা ও কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** সংস্কৃতির দুটি দিক আছে, একটি বাইরের একটি ভিতরের। পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-অনুষ্ঠান, আহার-বিহার, বাসগৃহের গঠন ও সাজসজ্জা এগুলির মধ্যে মানুষের এবং জাতি-গোষ্ঠীর রুচি ও বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। কিন্তু এগুলি সংস্কৃতির বহিরঙ্গ। সংস্কৃতির অন্তরঙ্গের দিকটি হচ্ছে মানুষের শিক্ষাদীক্ষা এবং সেই সঙ্গে আবেগ-অনুভূতি, স্বপ্ন ও কল্পনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট প্রবণতা। আমরা যখন বলি 'কেলটিক ইম্যাজিনেইশন' বা 'বাঙালী ভাবপ্রবণতা' তখন আমরা এই অন্তরঙ্গ সংস্কৃতি বা কালচারের কথাই বলতে চাই। যেমন পৃথিবীসুদ্ধ লোক জানে বাঙালীরা কাব্যোন্মাদ, তা সে পূব বাংলাই হোক আর পশ্চিম বাংলাই হোক। এক কলকাতাতেই শত শত কবিতা পত্রিকা জ্বলছে আর নিভছে; পত্র-পত্রাণু চুমকির মতো পথিকের বুকে চমক দিয়ে বুকস্টলে দাঁড়িয়ে আছে। এবং বহু লোক এই নিয়ে মেতে আছে। কবিতামেলা বসছে, কবিপক্ষ পালিত হচ্ছে; কবির লড়াই কবির বড়াই এতো লেগেই আছে। এক কথায় কবিতা দিয়ে বাঙালীকে চেনা যায়, কলকাতা বা ঢাকাকে বোঝা যায়। যে-অতিথি বলেন 'আমি কবিতা ভালবাসি', কলকাতা বা ঢাকার দরজা তাঁর জন্য অবারিত। এছাড়া সংস্কৃতি যদি রিফাইনমেন্ট বা সুন্দরায়ণ বা মনঃশ্রী হয় তবে মানতেই হবে এতে কবিতার একটি অগ্রণী ভূমিকা আছে। ভাষার ক্ষেত্রে শ্রীসম্পাদনের কাজ অনুক্ষণ করে যাচ্ছেন কবিরা। তাঁরা কথায়, শব্দে, শব্দগঠনে, ইমেজারি প্রয়োগে যে-পরিবর্তন বা পরিমার্জন আজ ঘটান, আগামী কাল বা পরশু তা সর্বস্তরের ভাষা ও সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত হয়। ভাষার মধ্যে যে পরমাণবিক শক্তি রয়েছে তার বিস্ফোরণ ঘটান কবি। ফলে মহাকাশ জয়ের মতো অন্তরাকাশ জয়ের ক্ষেত্রে কবির নেতৃ-ভূমিকা অনস্বীকার্য। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:** "সরল রেখার জন্য" ১৯৬৭র কোনো শীতের মাঝরাতে,

একটি চিঠির খামের উপর পেন্সিলে রচিত। প্রকাশিত "অমৃত" পত্রিকায়, ১৩৭৫ ১৪ আষাঢ় সংখ্যায়। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: পিরামিডের চূড়ায়, সংকীর্ণ কিন্তু শীর্ষ চূড়ায়। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: আধুনিক ক্লাসিকতায় সিদ্ধিলাভ।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: নগর-সন্ধ্যা (১৯৪৬), কারার প্রার্থনা (১৯৫০), পার্ক স্ট্রীটের স্ট্যাচু ও অন্যান্য কবিতা (১৯৬৯), নিঃশর্তের নাম সুন্দরী (১৯৭০)।

সরলরেখার জন্য

সামান্য একটা সরলরেখার জন্য মাথা খুঁড়ছি,
পাচ্ছি না।
পৃথিবীতে কোথাও একটা সরল রেখা নেই।

আকাশ অপরাজিতা-নীল কিন্তু গোলাকার,
দিগন্তও চক্রনেমিক্রম।
নদী আঁকাবাঁকা, পাহাড় এবড়োখেবড়ো,
হ্রদ চ্যাপ্টা, উপকূল বুকে হাঁটা সরীসৃপের মতো খাঁজকাটা,
কুকুরের লেজ কুণ্ডলী, হরিণের শিং ঝাঁকড়া,
গোরুর খুর দ্বিধা, আর গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোড উধাও কিন্তু এলোমেলো।
সৃষ্টিতে সরলরেখা বোধহয় এখনো জন্মায় নি।
যতো দাগ সব হয় ডিম, নয় নারকেল, নয় কলার মোচা—
বৃত্ত, উপবৃত্ত ইত্যাদি,
একটাও সোজা নয়।

কোনো মানুষই সোজা নয়,
তাই বোঝা শক্ত।

মাথার উপরে সূর্য—জবাকুসুম—
তিনিও সোজা চলেন না,
উত্তরায়ণ থেকে দক্ষিণায়ণ
মাতালের মতো টলছেন।

সোজা কিছুই চোখে পড়ছে না।

তোমার চোখের ঈষৎ-ভাষাও
আমার বুকের মধ্যে এসে কেমন যেন বেঁকে যাচ্ছে,
আর আমার সোজা ইচ্ছাটাও তোমার দ্বিধার মধ্যে
কেবলি কৌণিক।

সামান্য একটা সরলরেখার জন্য
আমরা বসে আছি।

রাম বসু
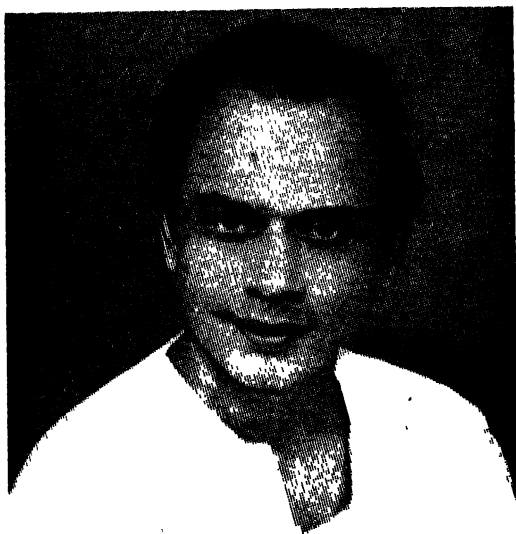
আজ এমন এক সময়ের সন্ধিক্ষণে আমরা দাঁড়িয়ে আছি যখন চতুর্দিকে অসুস্থ, থমথমে আবহাওয়া, কডওয়েলের ভাষায় সংস্কৃতির নাভিশ্বাস দেখা দিয়েছে। তবু এই যুগসন্ধিক্ষণে রাম বসুর মতো কবিরা আছেন যাঁরা নির্জন গুহার অন্ধকার থেকে বাইরে এসে যুগের আকুতিতে প্রকাশ করতে গিয়ে পূর্বসূরীদের কাছে শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে গভীর আত্মপ্রত্যয়ে বলতে পারেন—'রবীন্দ্রনাথ আমরা তীব্র ঘৃণায় পবিত্র হয়েছি' তাই কখনো বজ্র বন্ধ্যা মুখে প্রহার করলেও অন্ধকারে ঊর্ধ্বমুখে রূপের আলো পড়ে। ব্যক্তিগত রাম বসুকে ব্যাগ কাঁধে দেখলে একটি বারের জন্যেও মনে হবেনা, এই সেই আপোষহীন নির্লোভ কবি, কাল কে সাথী রেখে যাঁর ছন্দ ধনুকের ছিলার মতো কাজ করে।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: তারাগুনিয়া, ২৪ পরগণা। ১৯২৫। এখন থাকি ২৭।৫১ আটাপাড়া লেন, কলকাতা-৫০-এ। **জীবিকা:** বর্তমানে চাকরি করছি। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** কবিতার নাম মনে নেই! প্রকাশিত কবিতা বলতে গেলে অনেক দূর যেতে হয়। তবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন থেকে 'ত্রিশূল' নামে একটা ছোট সংকলন বেরিয়েছিল। তাতেই হয়তো। অথবা অধুনা-লুপ্ত অরণি পত্রিকায়। ঠিক বলতে পারছি না। **প্রকাশ সন:** সে হবে বোধহয় ১৯৪৪/৪৫ সালের কথা। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** কবিতা লিখতে গিয়ে বিষ্ণু দে'র মোহে বহুকাল পড়েছিলাম। যে সময় কবিতা লিখতে চেষ্টা করতাম তখন বিষ্ণু দে'র 'সাত ভাই চম্পা' সবে মাত্র বেরিয়েছে। ওই বইটা আমাকে বিহ্বল করেছিল। **সবচেয়ে প্রিয় বিদেশী কবি:** বলা কঠিন; অনেকেই আছেন। আবার অনেক আগে ছিলেন, এখন আর প্রায় পড়ি-ই না। কিন্তু যাঁরা এখনো মনে সমানভাবে জীবিত তাঁরা হলেন—এলুয়ার, মায়াকভস্কি, নেরুদা, লোরকা। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** প্রশ্নটা অস্পষ্ট। সাংস্কৃতিক অগ্রগতি বলতে বোঝায় এক মৃতপ্রায় সাংস্কৃতিকে ধ্বংস করে জীবনধর্মী নতুন সংস্কৃতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা। তাই এই অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা হল সংগ্রামী। আমি সেই ভূমিকা কতদূর পালন করতে পারি বা পারবো, জানি না। আমার সার্থকতা বা ব্যর্থতা এ ক্ষেত্রে কোন কথাই নয়। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে ফল একটা হয়-ই। জীবন এবং পরিবেশ সম্পর্কে অধিকতর সচেতনার দরুণ কবিতা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তার প্রভাব থেকেই যায়। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:** প্রিয় কবিতা কোনটি বলা কঠিন। সবচেয়ে শেষে যেটি লিখেছি সেটাই মন জুড়ে থাকে যতক্ষণ না আর একটা লিখতে পারছি। তাই ওই প্রশ্ন থাক। সংকলনে নেওয়ার কথা হলে বলবো 'পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে' কবিতাটি নেবেন। ওটা বেরিয়েছিল 'অগ্রণী' পত্রিকায়। সে হবে সম্ভবত ১৯৪৯ সালের কথা। কবিতা লিখেছিলাম কলকাতায়, আমরা আগে যে বাড়িতে থাকতাম, ২নং কিশোরী মুখার্জী লেনের চিলেকোঠায়। বড় মনের মত জায়গা ছিল। অনেকখানি আকাশ পেতাম। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** নিতান্ত কঠোর ও নিরাসক্ত সমালোচকও স্বীকার করবেন যে বাংলা সাহিত্যে কবিতার স্থান চিরকালই সকলের ওপরে। আধুনিক কবিরা তার উজ্জ্বলতা আরও তীব্র ও শাণিত করে তুলতে পেরেছেন বলে আমি গর্বিত। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** কেন? আশঙ্কা করার মতো কিছু ঘটছে নাকি? যদি হয়ে থাকে, উদ্বিগ্ন হবার মতো কিছু নয়। মাঝে মাঝে আবিলতা আসে পরবর্তী প্রবাহকে তীব্রতর করে তুলতে।

আমি মনে করি জীবনের মতো কবিতাও অবিনশ্বর। তাই আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার কোন উদ্বেগ নেই।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: যখন যন্ত্রণা (১৯৫৫), দৃশ্যের দর্পণে (১৯৫৬), নীলকণ্ঠ (১৯৫৭)।

পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে

অনেকক্ষণ বৃষ্টি থেমে গেছে
বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ,
ফুটো চাল থেকে আর জল গড়িয়ে পড়বে না
খোকাকে শুইয়ে দাও।

খোকাকে শুইয়ে দাও
তোমার বুকের ওম্ থেকে নামিয়ে
ওই শুকনো জায়গায় শুইয়ে দাও,
গায়ে কাঁথাটা টেনে দাও
অনেকক্ষণ বৃষ্টি থেমে গেছে।

মেঘের পাশ দিয়ে কেমন সরু চাঁদ উঠেছে
তোমার ভুরুর মত সরু চাঁদ
তোমার চুলের মত কালো আকাশে,
বর্ষার ঘোলা জল মাঠ ছাপিয়ে নদীতে মিশে গেছে
কুমোর পাড়ার বাঁশের সাঁকোটা ভেঙে গেছে বোধ হয়
বোধ হয় ভেসে গেছে জলের তোড়ে
অভাবের টানে যেমন আমাদেব আনন্দ ভেসে যায়।

নল বনেব ধার দিয়ে
পান বরজের পাশ দিয়ে
গঞ্জের ষ্টিমারের আলো—
আলো পড়েছে ঘোলা জলে
রামধনুর মত,
রামধনুর মত এই রাত্তির বেলা।
ধান খেত ভাসিয়ে জল গড়ায় নদীতে
ষ্টিমারের তলায়

আমাদের অভাবের মত
ঠিক আমাদের কপালের মত।

আমাদের পেটে ত ভাত নেই
পরণে কাপড় নেই
খোকার মুখে দুধ ত নেই এক ফোঁটাও,—
তবু কেন এই গঞ্জ হাসিতে উছলে ওঠে
তবু কেন এই ষ্টিমার শস্যেতে ভরে ওঠে
আমাদের অভাবের নদীর ওপর
কেন ওরা সব পাঁজরকে গুড়িয়ে যায়?

শোন,—
বাইরে এস
বাঁকের মুখে পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে;
শোন—বাইরে এস,
ধান বোঝাই নৌকা রাতারাতি পেরিয়ে যায় বুঝি
খোকাকে শুইয়ে দাও
বিন্দার বৌ শাঁকে ফুঁ দিয়েছে।

এবার আমরা ধান তুলে দিয়ে
মুখ বুজিয়ে মরবো না
এবার আমরা প্রাণ তুলে দিয়ে
অন্ধকারে কাঁদবো না
এবার আমরা তুলসী তলায়
মনকে বেঁধে রাখবো না

বাঁকের মুখে কে যাও, কে?
লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দাও
লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দাও!
আমাদের হাঁকে রূপনারায়ণের স্রোত ফিরে যাক
আমাদের সড়কিতে কেউটে আঁধার ফর্সা হয়ে যাক
আমাদের হৃদপিণ্ডের তাল দামামার মত
ঝড়ের চেয়েও তীব্র আমাদের গতি।
শাসনের মুগুর মেরে আর কতকাল চুপ করিয়ে রাখবে?
এস

বাইরে এস—
আমরা হেরে যাবো না
আমরা মরে যাবো না
আমরা ভেসে যাবো না
নিঃস্বতার সমুদ্রে একটা দ্বীপের মত আমাদের বিদ্রোহ
আমাদের বিদ্রোহ মৃত্যুর বিভীষিকার বিরুদ্ধে—

এস বাইরে এস
আমার হাত ধর
পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে।

কৃষ্ণ ধর
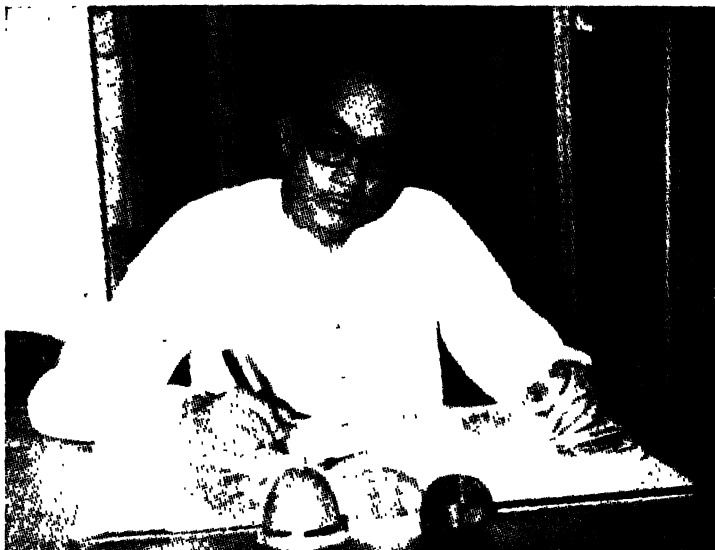
আমরা যখন লাঞ্ছিত, অপমানিত, জীবনে যখন মানুষ নতুনভাবে বাঁচতে শিখছে, বাংলাদেশের এই পটভূমিকায় কবিতায় আসেন কৃষ্ণ ধর। তাঁর প্রথম বই উৎসর্গ করেছিলেন নজরুলকে। সুকান্তর সমবয়সী এই কবির সংগে প্রত্যক্ষ রাজনীতির যোগ না থাকলেও সেই চেতনায় কবি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং দেশকালের গণ্ডী পেরিয়ে চেতনার ক্রমঃবিস্তার হয়েছে। সাম্প্রতিক-কালে কবি কখনো নিঃসংগ, তীব্র প্রেমভাবনায় অনুরণিত কৃষ্ণ ধর এমন একজন সৎ কবি, যাঁর মতে সাহিত্যে কখনো চাতুরী চলে না।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: কমলপুর, ময়মনসিংহ (অধুনা পূর্ব পাকিস্থান)। পৌষ, ১৩৩৩ বাংলা। ২৩৮, মানিকতলা মেন রোড্, স্যুট্-১২, কলকাতা-৫৪। **জীবিকা** সাহিত্য ও সাংবাদিকতা। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** মন্বন্তরে ১৯৪৩ সাল। **প্রকাশ সন:** ১৯৪৩। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:** কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত একটি ছোট পাক্ষিক পত্রিকায়। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** নিশ্চিতই রবীন্দ্রনাথ এবং পরে নজরুল

ইসলাম। **প্রিয় বিদেশী কবি:** বেরটোল্ট ব্রেখট। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** কবিকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে বলে মনে করি। কারণ তিনি সংস্কৃতির ধারক এবং নির্মাতা। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** কবিতাকে বাস্তব অস্তিত্বের প্রতিফলন হতে হলে কবিকে নিশ্চিতই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অংশীদার হতে হবে। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:** কোনো একটি কবিতার নাম বলা অসম্ভব। সব কবিতাকেই প্রিয় বলে মনে করি। তবে 'যার নাম ভালোবাসা' কবিতাটি নির্বাচিত করলাম। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** পাঠকেরা এর উত্তর দেবেন। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** অতীতে যেমন ছিল ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ, প্রকাশ সন: অংগীকার (১৯৪৮) প্রথম ধরেছে কলি (১৯৫৬) এ জন্মের নায়ক (১৯৬১) এক রাত্রির জন্যে (১৯৬৭) কালের নিসর্গ দৃশ্য—কাব্য-নাটক (১৯৬৮) আমার হাতে রক্ত (১৯৬৮)।
সম্পাদিত সংকলন: স্বদেশ, আমার স্বদেশ। (১৯৭০)

যার নাম ভালবাসা

তাতেও মাধুর্য আছে দিনরাত্রি মৌমাছির মতন
গুন গুন করা কানের কাছে
নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।
কিন্তু তাও সবটুকু নয়
জন্ম থেকে কেই বা বধির, কেউ কেউ
স্বেচ্ছায় কানে খাটো
প্রতি মুহূর্তের এই বানানো কথার চতুরালি থেকে
মুক্তির সহজ উপায়
কিছু কম শোনা
যদিও মাধুর্যে তার পরিপ্লুত হতে পারে শরীর, চেতনা।

খুবই সহজে যাকে ডাকা যায়, ট্র্যামের ঝুলন্ত ভিড়ে
কিংবা কোনো নদীর কিনারে
এই যে আসছি বলে বিনা নোটিশেই
যার কাছে গিয়ে বসা যায়
সহজ দুঃখের গল্প, সুখের টুকরো কথা
রাজ্যের স্বপ্নের ছবি দেখা
তাকে কোনো উপমার জাদুমন্ত্রে ধরে রাখা যায়।

কিংবা এক যুগ যার সঙ্গে দেখা নেই
যার জন্য চিত্রকল্প সর্বদাই তুলির ডগায়
রঙে ও রেখার টানে অনুপম
তার অন্য কোনো নাম জানা নেই ভালোবাসা ছাড়া।

অথবা এমন অপরিহার্যতা কিছু
যাকে ছাড়া জাগরণ শুধু এক জ্বলা
সবটুকু অস্তিত্ব দিয়ে যাকে ঘিরে রাখা
সে-মহিমা শব্দ এবং ভাষায় ফোটে না।
এবং এমনও হয়, দিনরাত্রি কান্না চেপে রাখা
কলকাতায় শোকার্ত মিছিলে
যার ছায়া হেঁটে যায় পায়ে পায়ে ক্রিমেটোরিয়ামে
এপারে ওপারে
কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায় ঝাপসা হয়ে আসে মুখ
দুরন্ত কিশোর
তার সঙ্গে মিল খোঁজা নিজেদের অস্তিত্বের
স্মৃতির আগুনে পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া
সেও এক আত্মসমর্পণ
যে নামেই ডাকা হক—বিদ্রোহ কি নাশকতা
অন্য কোনো অন্বয় খুঁজি না তার
অন্তহীন ভালোবাসা ছাড়া।

দুর্গাদাস সরকার

সহজ সুন্দর ভাবময় রচনা দুর্গাদাস সরকারের সহজাত ক্ষমতা। তিনি বিশ্বাসে উদ্বেল হয়ে ওঠেন দাবীর মিছিল দেখে। কখনো দেখেন চাষী বউএর মতো ক্ষেতে যখন নামে ট্রাকটর। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখে আন্তরিকতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর কবিতা। 'মৃত সৈনিকের ডায়েরী' থেকে জানতে পারা যায় প্রতিটি মানুষই আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচতে চায়। সমাজের কাছে নিপীড়িত মানুষের হয়ে দুর্গাদাস সরকারে দাবীও তাই। ছন্দ ও শব্দের ওপর অত্যন্ত দখল থাকার দরুন দুর্গাদাস সরকারের কবিতা অতি সহজেই মন জয় করে নেয়।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: তেলেণ্ডা (বাঁকুড়া)। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, ১৪ই অগ্রহায়ণ, বুধবার। ২১০ (নিউ), বেচারাম চ্যাটার্জী রোড, বেহালা, কলকাতা-৩৪। **জীবিকা:** সাংবাদিকতা। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** আগমনী। **প্রকাশ সন:** ১৯৪৭ ? **কবিতাটি কোন্ পত্রিকায় মুদ্রিত:** দৈনিক বসুমতীর ছোটদের পাতায়। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** জসীমউদ্দীন, রবীন্দ্রনাথ। **প্রিয় বিদেশী কবি:** বয়স-বৃদ্ধি ও মননের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কবি স্থান গ্রহণ করে থাকেন। উপরন্তু পাঠক হিসেবে আমার মর্জি যখন যেদিকে আকৃষ্ট হয়, সেখানে ভিন্ন ধাতের ও ভিন্ন কণ্ঠের কবি সেই মর্জির সপক্ষে মনকে আন্দোলিত করতে থাকেন—তখন হয়তো তিনিই হন আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কবি। বিদেশী ভাষার কোন্ কবি আমার সবচেয়ে প্রিয় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে দ্বিধা বোধ করছি। কারণ আমার বিদেশী ভাষা-জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। বাংলা-অনুবাদের মাধ্যমে বহুবিধ ভাষার বিদেশী কবিদের কবিতা পড়ে আনন্দিত হই। যেমন, চীনা ভাষা না জানলেও শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের তর্জমায় ঐ ভাষার কবির কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। তবে মোটামুটিভাবে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত থাকায় ঐ ভাষার বিভিন্ন কবি আমার প্রিয়। যেমন শেলি, কীটস্, বায়রন, তেমনি একালের টি. এস. এলিঅট। রুশভাষা জানি না। তবু মায়াকোভস্কি আমার ভয়ানক প্রিয় কবি। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** কবিরা সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। কবি ঐতিহ্যাশ্রিত চলতি সংস্কৃতিতে রূপান্তর সাধন করতে পারেন, কিন্তু সবাই তো শেক্সপীয়র, দান্তে, কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ নন। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** কবিতার ক্ষেত্রে সংস্কৃতির প্রভাব কি অস্বীকার করা যায়? তবে অপসংস্কৃতিকে বিদায় দিতে না পারলে, কবিতায় যদি তার প্রভাব ঘটে তাহলে সে কবিতা হবে প্রাণহীন মাংসপিণ্ড—ইতিহাসের আস্তাকুঁড়েই যার ঠাঁই মিললেও মিলতে পারে। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:** আমার কবিতার বিচারক আমার সহৃদয় পাঠকেরাই। আমার কাছে আমার কোন্ কবিতা প্রিয় বা অপ্রিয়, তার বিচারের দায় থেকে আমাকে রেহাই দিন। তবে এই সংকলনে যে কবিতা যাচ্ছে তা বিশেষ এক সময়ে আমার মর্জিকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। পরে দেখলুম, যুদ্ধ যদ্দিন থাকছে, ততোদিন এ কবিতার আবেদন থাকতে পারে। এই কবিতার রচনাকাল: ১৯৬৫ খৃঃ। কলকাতায়। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** আধুনিক শব্দটি ব্যবহার করে সেই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা হয়েছে। সচেতনতা, অভিজ্ঞতা ও জীবনসংগ্রামের প্রকাশ একালের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঐ কবিতার স্থান আগামীকালেও বেদখল হয়ে যাবে না—সেকাল যদিও নিজেকে

আধুনিক বলে বড়াই করবে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: আধুনিক অর্থাৎ একালের কবিতার ভবিষ্যৎ শুধু উজ্জ্বল নয়, গৌরবময়ও বটে।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: অশোকের সময়ের গ্রাম (১৯৫৩), দ্বিতীয় সন্ধি (১৯৫৮), একটি গাছ, এক শ' ফুল (১৩৭৫ বঙ্গাব্দ)।
সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশ সাল: গঙ্গোত্রী, ত্রৈমাসিক কবিতাপত্র (১৯৬৫)।

নিহত সৈনিকের ডায়েরি থেকে

ক্রমাগত হচ্ছিলুম ফ্রাস্ট্রেটেড। পা দিয়ে উনিশে
দেখলুম কোথাও নেই পার হবার কাঠের তরণী।
ফুটপাতে গণৎকার হাত দেখে খুঁজে পেলে শনি
লেখালুম একদিন নাম রিজিওনাল আপিসে।
আজ কড়া পড়ার সে-হাতে দাগ। তেলের মালিশে
তবু প্রয়োজন নেই। হাত রেখে ট্রিগারে এখনি
লক্ষ্যভেদ করতে পারি। নিমেষেই দু'চোখের মণি
তুলে ফেলে দিতে পারি। দুঃখ নেই আমার ছাব্বিশে।
অথচ এখনো কেন প্যারেডের সময় দামামা
বেজে উঠলে মনে হয়, কেন সেই মাদল বাজে না
বাউরি পাড়ায়? কই সেই সন্ধ্যা? আমি কেন সেনা-
বাহিনীর টু হান্ড্রেড ছাড়া আর অন্য কিছু নই?
কে জানে কপালে আছে অলিখিত কী আদেশনামা?
এতো কথা ভাবছি বলে হেঁটমুণ্ডে দিতে হবে সই!

পদোন্নতি হয় যদি, বড় জোর হবো জমাদার।
মেজর হতেও পারি একদিন—বন্ধুরাই বলে।
সুবেদারী দূর অস্ত, যে যাই বলুক ঠাট্টা-ছলে,
আমার যা কেরামতি, তার আগে নিজেই সাবাড়
হয়ে যাবো। মনে পড়ে, কতোবার শত্রুর থাবার
কাছাকাছি মুখ থুবড়ে বেঁচে গেছি। হয়তো আসলে
সৈনিক হবার কোনো যোগ্যতাই নেই। অন্তঃস্তলে
মাটির মমতা নিয়ে স্বপ্ন দেখি ফুল ফোটাবার।
বাইরে ঘর্ঘর শব্দ। রাশভারি ট্যাঙ্ক যাচ্ছে একা।
এখন অনেক রাত। তাঁবুতে সবাই নিদ্রাগত।
আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছি, জমাদার কখনো অন্তত

যদি হই—মাকে চিঠি লিখে বলবো, কবে হবে দেখা
কিছুই জানি না। আজ নতুন দায়িত্ব, বেশি ঝুঁকি।
কলম নামাতে দেখি ভাঙা মেঘে চাঁদ মারছে উঁকি।

এবার লিখবো চিঠি মাকে: আমি গতকাল থেকে
জমাদার। এ-খবর জানাবে না গ্রামে আপাতত।
বাড়তি মাইনে পেলে পাঠাতে পারবো আমি কতো
এখনো জানি না। তবু অবশ্য ছাড়াবে একে একে
বন্ধকী জমিটা, সেই ছোট্ট থালা অন্নপ্রাশনের।
তারপর নতুন করেই যেন ঘরের দেয়াল
দেওয়া হয়। চালে খড়। ভাঙা ঘরে আছো কতোকাল।
উঠোনে পুদিনা চারা পুঁতে যেন দেওয়া হয় বেড়।
উত্তরে সংবাদ পাবো, ভাঙা ঘর হোল কিনা জোড়া।
চোখে তা দেখব কবে? আমি যে জীবন্ত বর্তমান।
অতীত আমার হাসে। নগদ অর্থে সদা যুধ্যমান।
অতএব ভবিষ্যৎ?—তাও ব্যক্তিগত নয়। গোড়া
কেটে জল ঢালি তবুও আগায়; জমাদার হ'লে
জীবনকে তুচ্ছ করে সুবেদার হবো বাহু-বলে!

সামান্য সৈনিক মাত্র। লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট অথবা ক্যাপ্টেন
আমি নই। এই ডায়েরির পাতা তবু কেউ যদি
খোলে কোনোদিন—পাবে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় নিরবধি
স্থিতি-অস্থিতির কথা। মধ্যদিনে যারা মেল ট্রেন
ফেল করে প্লাটফর্মে ঘুরে ফিরে কাটিয়ে সময়
নিরুপায় প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যেতে যেতে শুধু দ্যাখে,
ছোট-বড় ইস্টেশনে কারা সব নামছে একে একে!...
সৈনিক-বৃত্তিতে আজ নিজেকেও যাত্রী মনে হয়
তাদের মতোই। আমি দেখছি এই ফাঁকা এরোড্রামে
ভাঙা-চুরো ক'খানা বিমান। প্রশ্ন করলো একজন
বলো তো কোথায় সেই যোদ্ধৃবেশে পাইলটগণ
একমাত্র ছিল যারা পরিচিত এখানে স্বনামে।
না। না। অবিশ্বাস্য নয়। ডিসিপ্লিন ভেঙে যে বেকার
এখন মাঠের মধ্যে, হাসছে সেই বুড়ো সুবেদার॥

রাজলক্ষ্মী দেবী

রাজলক্ষ্মী দেবী অসম্ভব চিন্তা করছেন, অধ্যাপনা সংসার আর কবিতা, কোনটা রাখবেন? আদৌ আর লেখা হবে কি না। অথচ আজকে নয়, সেই ছেলেবেলায় বাবার মুহুরীর অনুরোধে কবিতা লেখা সুরু করে আজ বাংলার কাব্যজগতে একটি উজ্জ্বল নাম রাজলক্ষ্মী দেবী, প্রজ্ঞায় ব্যঞ্জনায় গঠনরীতিতে তিনি একজন আধুনিক কবি যিনি নিজের পাঠকগোষ্ঠী তৈরী করতে পেরেছেন। কবিতারচনায় আন্তরিক, কবি মনে করেন—'লিখে টাকা করার জন্যে যে পরিমাণ ও যে মানদণ্ডে লিখতে হবে, তাতে আমি নারাজ, তার চেয়ে পানের দোকান দেওয়া ভালো, সৎপথে উপার্জন করা যায়।'

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: ময়মনসিংহ, পূর্ব-পাকিস্তান। ১৯২৭। বাংলো নং ডি-ওয়ান/নাইন, এন্. ডী. এ. এস্টেট্, খরক ভাসলা, পুণা-২৩। **জীবিকা:** অধ্যাপনা। অবশ্য জীবিকা প্রধানতঃ গৃহরক্ষণের। স্বামী এন্. ডী. এ-তে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। আমি পুণায় নওয়োস্‌জী ওয়াডিয়া কলেজের দর্শনবিভাগের অধ্যাপক। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** 'মহাসাধক'। **প্রকাশ সন:** ১৯৪৫ অথবা ১৯৪৬ (লেখাটি হারিয়ে গেছে)। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:** 'দেশ'। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** রবীন্দ্রনাথ, Shelley প্রমুখের। কৈশোর ছাড়াবার পর বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ এবং আরও অনেক বিদেশীয় কবি। **প্রিয় বিদেশী কবি:** বর্তমানে William Blake এবং Robert Frost। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** কবির ভূমিকা যুদ্ধক্ষেত্রে বাদ্যকরের মতো। কবিকেও এগুতে হয়, কিন্তু কবির পক্ষে অগ্রগতি একটা উদ্দেশ্য নয়। কবির চিন্তাধারায় কোনও অতীত বা ভবিষ্যতের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক স্থাপন অস্বাভাবিক। কবিগ্রাহ্য সংস্কৃতি চিরন্তন। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** অতএব, আমার মতে, কবিতা সাংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রভাব থেকে মুক্ত হ'তে পারে। কবি back-dated হলেও অকবি হয়ে যান না। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:** বহু কবিতাই আমার প্রিয়। তবু বাছাই করতে বল্‌লে 'ওথেলো'কেই বাছবো। সেটি আঠারো বছর বয়সের ইচ্ছায় ১৯৪৫এ রচিত। 'কবিতা' পত্রিকা—যার প্রতি গভীর আস্থা ছিলো,—তাতে ১৯৪৬-এ প্রকাশিত। তবে এখন প্রিয় কবিতা বলতে 'কফেটুয়া'র কথা মনে হয়। এটি এখানে বসে রচিত ১৯৬২ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত, 'ভাব ভাব কদমের ফুল' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** বর্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রাণস্পন্দন পাওয়া যায় একমাত্র আধুনিক কবিতায়। অন্যান্য সাহিত্যশিল্পে নিষ্প্রাণ পুনরাবৃত্তি চল্‌ছে। কিন্তু বাংলা কবিতা প্রত্যেক দশকে নতুন কবিদের ভাবে ও ভাবনায় নতুন করে বেঁচে উঠ্‌ছে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** বর্তমান উজ্জ্বল—কিন্তু ভবিষ্যৎ? কাল নিরবধি, পৃথিবী বিপুলা—এই আশা ভবভূতি দেখালেও কথাটা সমভাবেই নৈরাশ্যজনক। আজ বাঙালীর মনে বঙ্কিম আর বেঁচে নেই, কিন্তু বঙ্কিম অমর তাঁদের মধ্যে, যাঁরা বাঙালী পাঠকের মন এখনও হরণ করে চলেছেন। আধুনিক কবিদের মধ্যে ক'জন ব্যক্তিগত অমরতা পাবেন জানি না, কিন্তু কবিতা যতোদিন বেঁচে থাক্‌বে ততোদিন,—রবীন্দ্রনাথ থেকে আদি ক'রে সব ক'জন সৎকবি তাঁদের নির্যাসিত চিন্তাধারার মধ্যে বেঁচে থাক্‌বেন। কিন্তু নামে বাঁচবার জন্যে যে পরিমাণে এবং যে উল্লাস নিয়ে লেখা চাই, তার মতো বলিষ্ঠপ্রাণ অধুনা অনুপস্থিত। যুগের

প্রয়োজনে বড়, মেজ এবং ছোট কবিরা আসেন। আবার ভিন্ন যুগের প্রয়োজনে ছোট কবি বড় হ'য়ে যান; বড় কবিকে ছোট হ'তে হয়। এইসব নজির সাম্‌নে থাকায় -এমনকি রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ সম্পর্কেও,—ভবিষ্যদ্বাণী করতে আমি নারাজ।

ধন্যবাদ।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: হেমন্তের দিন (১৯৫৭), ভাব ভাব কদমের ফুল (১৯৬৭)।

কফেচুয়া

'This beggar-maid shall be my queen

'এই ভিখারিণী হবে রাণী'—আহা, উচ্চারণ ধ্বনিত করলো দশ দিক্।
উজ্জ্বল রেশম, মুক্তা, মাণিক্যের থালি হাতে নতজানু সহস্র সৈনিক।
চীরবাস দরিদ্র হৃদয়, তোর দ্বারে এলো নরোত্তম নৃপতি প্রেমিক।

সমস্ত প্রেমের মধ্যে এই প্রেম অন্তর্লীন। প্রেমের এম্‌নি এক ধারা।
একজন হবে ঝরা ভোরের শিউলি, আর অন্যজন অবিচ্যুত তারা।
সব দিয়ে একজন হবে কারুণিক,—তবু,—অন্যজন হবে সর্বহারা।

না হয় তোমার মন ঔদাসীন্যে সুশীতল কোনো এক মর্মর প্রাসাদ,
হাতির দাঁতের সিঁড়ি বেয়ে উঠে শেষে পাবো তোমার কুয়াশা-ঘেরা ছাদ,
না হয় তুমিও এক রহস্যের সিংহমূর্তি। মিশরের বিলুপ্ত সম্রাট।

তবু, কিছুই কি আমি দিই নি? নিবিয়ে দিয়ে কুটীরের একমাত্র বাতি,
ঝাড়লণ্ঠনের নিচে বিপন্ন বিস্ময়ে আমি আরব্য গালিচা এনে পাতি।—
তোমার ঐশ্বর্যে ভেসে কোথায় কোথায় যায় ভাঙা খেলনার সঙ্গী সাথী।

সম্রাট্,—উন্মত্ত এক প্রলাপ বক্‌বো? আমি আজকে অত্যন্ত দুঃসাহসী।
এর চেয়ে ঢের ভালো হয়, যদি খুলে দাও রেশমে-কিংখাবে মোড়া রশি।
ভিক্ষুকের কাঁথা পেতে কুটীরের আঙিনায় দুইজনে মুখোমুখি বসি।

অরবিন্দ গুহ

অনেকটা গদ্যে চলে গেছেন বলেই কবিতার সংগে প্রায়-সম্পর্কহীন পঞ্চাশের প্রথম সারির কবি অরবিন্দ গুহ। ভাবনায় সিরিয়াস, মেজাজে লিরিকধর্মী, অ-দুর্বোধ্য, তীর্যক বাগ্‌রীতির এই কবির লড়ে যাওয়ার ভংগী নেই, আছে এক বিনম্র কণ্ঠস্বর। পঞ্চাশের কবিরা যখন তুংগে তখন অরবিন্দ গুহ ছিলেন দক্ষিণ নায়ক তারপর পরবর্তী সময়ে নানা ঢেউয়ের দোলায় দুলে তাঁর কাব্যভাবনা নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত হয়েছে।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: বরিশাল। ২০ ডিসেম্বর, ১৯২৮। পি-৪০, দক্ষিণ বেহালা রোড, কলকাতা-৬১। **জীবিকা**: সরকারী আপিসে চাকরি। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা**: মনে নেই। **প্রকাশ সন**: মনে নেই। **কবিতাটি কোন**

পত্রিকায় মুদ্রিত: মনে নেই। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: মাইকেল মধুসূদন। **প্রিয় বিদেশী কবি**: হাইনে। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: পরোক্ষ কিন্তু গভীর ও ব্যাপক। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: কিন্তু সংস্কৃতি কবিতাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত**: প্রকাশের অল্পদিন আগে কলকাতায় রচিত। আনন্দবাজার পত্রিকা বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৭১। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: সর্বাগ্রে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: উজ্জ্বল।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: দক্ষিণ নায়ক। নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত।

ক্ষমাপ্রার্থী

কোথায় তোমার মুখ, আহা, তুমি এত কাছাকাছি
তবু কেন নিস্তাপ, বিমুখ।
হাজার শব্দের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বেঁচে আছি;
তুমি কাছে আছ, বড়ো সুখ।

হাজার শব্দের কাছে আমি পাপী, নিষ্ঠুর, উন্মাদ।
শব্দ স্রোতে ভাসে, শব্দ ঝড়ে
ছিন্নভিন্ন। তুমি কাছে, কোথায় তোমার স্পর্শ, স্বাদ!
শুধু জল পড়ে, পাতা নড়ে।

আগে দেখিনি তো তুমি রক্তের পাথর কর্ণমূলে
কবে দিলে—আষাঢ়ে? শ্রাবণে?
রক্ত স্নিগ্ধ শব্দ করে পাথরের একূলে-ওকূলে,
প্রেমিকেরা কান পেতে শোনে।

কেউ তৃপ্ত নয়, কেউ তৃপ্ত নয়, কেউ তৃপ্ত নয়,
পাথরে পিপাসা, রক্তে ক্ষুধা;
আকাশ ক্ষুধায় দুঃখী, আর্তস্বর ত্রিভুবনময়,
পিপাসায় ব্যাকুল বসুধা।

তুমি এত কাছে আছ? হাজার শব্দের কাছে পাপ,
এত পাপ কেউ ক্ষমা করে?
ক্ষমা নেই ব'লে তুমি কাছে তবু বিমুখ, নিস্তাপ,
শব্দ নেই প্রশ্নের উত্তরে।

জয়ন্তী সেন

দীর্ঘকাল অনুশীলনের পর কাব্যজগতে অতিসন্তর্পণে প্রবেশ করেছেন শ্রীমতী সেন, তাঁর দেখা জগতে আকাশ আলোয় ভরে ওঠে, পাখি গান গায়, আবার কোন বিষণ্ণ ঋতুর পাতা-ঝরা বিকেলে তাঁকে বিষাদাচ্ছন্ন মনে হয়। জয়ন্তী সেন মূলতঃ গীতিকবি, ছন্দে সচেতন। তাঁর কবিতা অযথা উল্লাসে অযথা উচ্ছৃংখলতায় চটুল হয়নি বরং জীবনদর্শনে স্থিত কবি, পেছনের ফেলে-আসা সময়টাকে আলগোছে সামনে রেখে স্মৃতি রোমন্থনে বলতে পারেন—'বুকেও গোলাপ ফোটে যখন তোমার মুখ মনে করি।' জয়ন্তী সেন তথাকথিত আধুনিক কবিদের মত দুর্বোধ্য নন। তাঁর কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতি রোমান্টিকতার সুরে উপস্থাপিত। তাই তাঁর কবিতা অন্তরের অন্তঃস্থলে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই পাঠক-মনকে অনুরণিত করে।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: কলকাতা। ১৯২৮। ৫নং লোয়ার রডন স্ট্রীট, কলকাতা ২০। **জীবিকা:** সম্পাদিকা, 'সাপ্তাহিক বসুমতী'। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** প্রতীক্ষা। **প্রকাশ সন:** বোধহয় ১৯৫৪। **কবিতাটি কোন্ পত্রিকায় মুদ্রিত:** 'মাসিক বসুমতী'। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** রবীন্দ্রনাথ। **প্রিয় বিদেশী কবি:** ব্রাউনিং, ডি. জি. রসেটি, জন ডোন, ইয়েট্‌স। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** বিচ্ছিন্নতাবোধ কবির সহজাত বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হলেও এক হিসাবে তিনি অতিমাত্রায় সমাজ-সচেতন। সমাজ ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে তাই কবির ভূমিকাও লক্ষণীয়। যেখানে পদস্খলন ঘটে, সেখানে তিনি স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব** [X]। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:**

২৩।৫।৬৯, কলকাতায়, সাপ্তাহিক বসুমতীতে। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** 'আধুনিক' শব্দটি বিভ্রান্তিজনক এবং আপেক্ষিক। বাংলা সাহিত্য কবিতা তার স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। কবিতাকে দুর্বোধ্য অথবা abstract কেউ কেউ প্রায়ই বলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা কবিতা-সাহিত্য তার নিজস্ব স্থান দখল করেই আছে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** এখন যে কবিতা লেখা হয়, তাকেই কি আধুনিক বলব? তা যদি হয়, তাহলে বলব আধুনিক কবিতা সম্পর্কে আশাবাদী না হয়ে উপায় নেই। সবচেয়ে বড় কথা এ কবিতার গতিশীলতা লক্ষণীয়। থেমে থাকেনি বলেই এর দুর্বার প্রাণশক্তির প্রখরতা অনুভব করতে দেরী হয় না। তরুণ থেকে তরুণতম কবিদের কি ভাবে, কি আঙ্গিকে, এমন চোখ ঝলসানো, মন চমকানো কিছু-কিছু অংশ আমাদের চোখে পড়ে যখন ভাবতে ইচ্ছে করে অবক্ষয়ের অশুভ প্রভাব আমাদের জগতে যতই স্পষ্ট হয়ে উঠুক না কেন, কবির মানসিকতাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করতে পারেনি।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: তুষারে রোদ (১৯৬৮)।
সম্পাদিত পত্রিকা ও প্রকাশ কাল: সাপ্তাহিক বসুমতী (১৯৬৩)।

সওদা

সকাল থেকে ফেরিওয়ালার শব্দ শুনতে পাই—
সুখের ঝুড়ি, দুঃখের ঝাঁপি বয়ে আমার ঘরের সামনে
ওরা দিনরাত ডেকে যায়! রঙচঙে মোড়কের তলে
সেই সুখ দুঃখকে সাধ করে ঘরে তোলার সময়
দাম মেটানোর প্রশ্ন মনেও পড়ে না।
সুখকে বুকে রাখার যন্ত্রণায়
যন্ত্রণাকে বুকে রাখার সুখে
আমি দিনরাত তাদের দুমুঠিতে আঁকড়ে ধরে থেকে
তারপর চমকে দেখি
আমার হৃদয়কে ওরা কখন উপড়ে নিয়ে গেছে।
অথচ যাকে যে অর্থে কিনেছিলাম
মোড়ক খুলে খুলে হিসেব মিলিয়ে দেখি আমি কিছুই পাইনি।

সকাল থেকে ফেরিওয়ালা হেঁকে যায়
রোদ্দুর-ছায়া আশা-নিরাশা সত্য-মিথ্যার সওদা নিয়ে

মোড়কের চটক দেখে লোভীর মত হাত বাড়াই
তারপর বুকের ভেতর খালি করে, নিঃস্ব করে
সারা জীবনের ভুলের বোঝা ব্যর্থতায় জমিয়ে তুলি।

হৃদয়ের অভাবে সুখ দুঃখ বুকেও বাজে না।
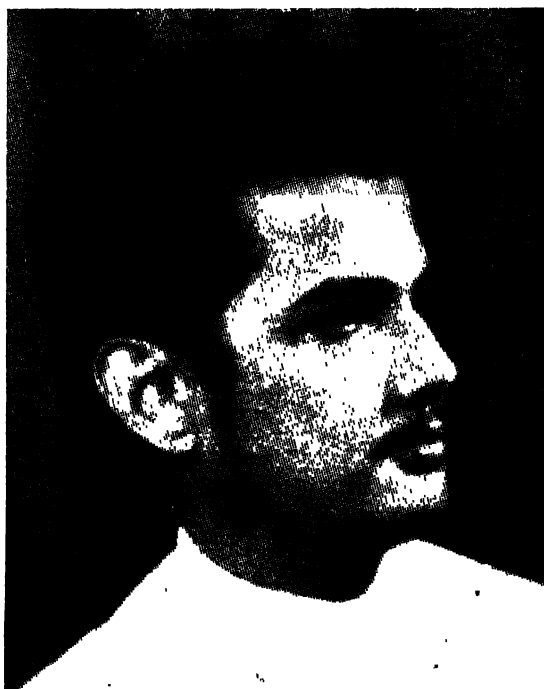
নচিকেতা ভরদ্বাজ

প্রথম শ্রেণীর কোন কাগজের ডাকের অপেক্ষায় না থেকে ক'লকাতা, মফঃস্বল থেকে সুদূর বাংলার বাইরের তামাম লিটিল ম্যাগাজীনে নচিকেতা ভরদ্বাজ নিয়মিতভাবে লিখে থাকেন। দেশী-বিদেশী ভাষায় প্রাজ্ঞ এই কবি প্রকৃতি প্রেম নিসর্গ চেতনায় লীন। যে তামস-চর্চা অস্তিত্বকে দীর্ণ করে, নচিকেতা ভরদ্বাজ তাকে সযত্নে পরিহার করেছেন: কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, একান্ত নিরিবিলিতে একক সংগীতে মগ্ন নচিকেতা এখনো আশাবাদী।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: আলতা, বানারিপাড়া, বরিশাল। ১৩৩৬। ১১২, কেন্দ্রিয় রাজগৃহ, বেলভেডিয়ার, কলকাতা-২৭। **জীবিকা**: কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের সহ-গ্রন্থাগারিক [বাংলা বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ] **প্রথম প্রকাশিত**

কবিতা: মনে নেই। **প্রকাশ সন**: মনে নেই। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত**: মনে নেই। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: সমস্ত সত্তা জুড়ে আমার কবি জীবনানন্দ, এমন কি আমার বিপন্ন রক্তের অন্তরালে তিনি। **প্রিয় বিদেশী কবি**: হুইটম্যান এবং কীটস-এর নাম মনে আসছে এই মুহূর্তে তবে কোনো এক বা দুজনকে প্রিয় বলে উচ্চারণ করা বোধ হয় সঙ্গত নয় সম্ভবও নয় কারণ একটু ভাবলেই অনেক প্রিয় কবির নাম স্মৃতিতে এসে ভিড় করে। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: যেহেতু যথার্থ কবিতা আমাদের চিত্তকে বৃহতের দিকে উন্মুখ করে, বোধ এবং বোধির দিগন্তকে প্রসারিত করে দেয়, সেইহেতু প্রত্যহ-জীবনের সাম্য, স্থিতি এবং সুস্থ সন্নিধির জন্য কবিতার ভূমিকা একান্ত অপরিহার্য বলে আমার মনে হয়। যেহেতু যথার্থ কাব্য বর্তমানকে বিগত এবং আগামীর সঙ্গে যুক্ত করে দিতে পারঙ্গম, বিশেষ দেশকে বিশ্বভূমির সঙ্গে, ব্যক্তি-হৃদয়কে বিশ্ব-হৃদয়ের সঙ্গে, সেইহেতু স্বভাবতঃই কবিতার সংস্পর্শে এসে জীবনের বৃহত্তর পরিধি স্পর্শ করার আকুলতা জন্মে আমাদের বুকের মধ্যে। এবং যেহেতু মানুষের কর্মে, চিন্তায় এবং সমস্ত রকম জীবনপ্রয়াসে শুদ্ধ মানবিকতাই শেষতম অন্বিষ্ট, সেইহেতু কবিতা ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগতভাবে সমাজকে সম্পন্ন হতে সাহায্য করে। এবং সম্পন্ন সমাজই তো সংস্কৃতির যথার্থ উৎসভূমি। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: আমার কবিতায় এঁদের কার কতটা প্রভাব সে বিচার কালের হাতেই সমর্পিত থাক। আমার পক্ষে নৈঃশব্দের ভূমিকাই শ্রেয়। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত**: সমগ্র রচনা থেকে বিশেষ বা প্রিয় একটিমাত্র কবিতা নির্বাচন করা দুঃসাধ্য নয়, আমার মনে হয়, অসাধ্য ব্যাপার কারণ সমস্ত কবিতাই সন্তানের মতন প্রিয়, অথবা কোনো কবিতাই ভালো লাগছে না। একজন কবির কাছে, প্রকাশিত হয়ে যাবার পর, কোনো কবিতাই আর ভালো লাগে না। তবু অনেক গল্প, ব্যক্তিগত জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা জড়িয়ে থাকার ফলেই এই কবিতাটির নির্বাচন 'একটি শুদ্ধ ভালবাসার কবিতা' 'ধ্রুপদী' ১৩৭৬ শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত। রচনাকাল লিখে রাখি না বলে সঠিক বলতে পারব না। তবে যতদূর মনে পড়ে তিন চার বছর আগের (ইংরেজী ১৯৬৬/১৯৬৭ সালের) কোনো সময়ের রচনা। এবং এই কলকাতায় বসেই। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: সত্যি কথা বললে, শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, কোনো দেশের কোনো সাহিত্যেই আজ আর কবিতার কোনো স্থান নেই। কারণ, যথার্থ কবিতা পাঠকের কাছে যে সহৃদয়তা এবং শ্রদ্ধা দাবী করে তার সামান্যতম আজ আর অবশিষ্ট নেই আমাদের চৈতন্যের অন্তরালে। এবং যেহেতু ভালোবাসাই যথার্থ কবিতার উৎস-

ভূমি এবং কবিতার রসাস্বাদনেও সহৃদয় একটি শুদ্ধ অস্তির অহংকার একান্ত অপরিহার্য অথচ যে ভালোবাসার অমল উত্তরাধিকার অনেক কাল হল হারিয়ে ফেলেছি আমরা সেইহেতুই একালে কেউ আর কবিতা পড়ে না। হয়তো আমরা কবিরাও আর যথার্থ ভালোবাসার কবিতা লিখতে পারছি না। তাই পাদপূরণের জন্য কিছু কিছু কবিতা পত্র-পত্রিকায় ব্যবহৃত হলেও—কেউ তা পড়ে বলে মনে হয় না। কবিতাগ্রন্থের প্রকাশক নেই। কবিতার বই কবিরা ছাড়া প্রায় কেউ কেনেন না। আশ্চর্য, কবিতা তবুও বেঁচে আছে। আমাদের মত কিছু আহাম্মক লোক আছে—যাদের গোয়ালার ছেলের মত ৮০ বছরেও জ্ঞান হয় না, তারাই কবিতা লিখে চলেছে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: কবিতার সমস্ত বিদীর্ণ ভবিষ্যৎ জেনেও ব্যক্তিগতভাবে কাব্যরচনাকে আমি হবি হিসেবে গ্রহণ করেছি বলে খুব বিচলিত হই না। কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সামান্যতম আশান্বিত না হয়েও তবুও যে অজস্র কবিতা লেখা হচ্ছে আজো এবং কেউ কেউ যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে নিদিধ্যাসনা করে বলেছেন এটি সুসংবাদ সন্দেহ নেই।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ. প্রকাশ সন: ফরমান (১৩৬১)।
সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা: পরিবেশক (১৯৫০-৫১) গ্রামের ডাক (১৯৫২-৫৩) নক্ষত্রের রাত যুগ্মভাবে।

একটি শুদ্ধ ভালোবাসার কবিতা

সুনয়নী, কে তোমার নাম রেখেছে জানি না,
তোমার চোখের দিকে তাকালে, আমার কেন যেন নীল আকাশ,
প্রথম ঊষার সূর্যোদয়, উন্মীলিত শ্বেত পদ্ম, মন্দিরের
সামনে বহতা নদীটির কথা মনে পড়ে। বিশ্বাস কর,
তুমি কাছে এলে পদ্মের গন্ধ পাই, ধূপবাতির নীল গন্ধ,
শান্ত একটি রূপায়িত দূর দিগন্ত কাছে এসে দাঁড়ায়।
এবং একটি পবিত্র সারস্বত বিষাদ কেন যেন
আবৃত করে রাখে আমাকে, অব্যক্ত একটি সুখকর
দুরূহ যন্ত্রণা আমার রক্তের সমুদ্র তোলপাড় করে।
মনে হয়, উজ্জ্বল সোনার মত রৌদ্র-ঝরা আকাশের
নীচে---রহস্যময়ী আর এক পৃথিবী স্পষ্ট হয়ে উঠছে
আমার চোখের সামনে। দেখতে পারছি ছবির মত
ছড়িয়ে আছে। কিন্তু যেতে পারছি না! —মনে হয়,
ততোধিক রহস্যময় একটি খেয়া নৌকা—সবাইকে

বুকে করে যেন ওপারে চলে যাচ্ছে। সবাইকে নিয়ে গেছে। কেবলমাত্র একা আমি পড়ে আছি নির্জন সৈকতের নগ্ন উপকূলে। লক্ষ ঢেউ অসহায় ভেঙে পড়ছে আমার চারদিকে।

জানো সুনয়নী, তোমার কথা মনে হলেই রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত তিনটি গান রূপময় হয়ে ওঠে আমার বুকের মধ্যে। আবার অন্যদিকে যখনই ঐ আশ্চর্য সুন্দর গান তিনটি আমি শুনি, আমার চোখের সামনে পদ্মবন, পদ্মায়ত লোচনা, পদ্মময়ী তোমার প্রতিমা নিরন্ত এক জলকল্লোলের অন্তরাল থেকে, চারিদিকের অন্ধকার উদ্ভাসিত করে, প্রমূর্ত হয়ে উঠতে থাকে। আর আমার বুকের মধ্যে কেমন করে!

অস্তায়মান শেষ সূর্যের স্বপ্নময়ী সপ্তবর্ণে বিচ্ছুরিত আষাঢ়ের আকাশের দিকে তাকিয়ে আমারও যেন মনে হয়—তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা!

কখনো বা পাখী-ডাকা ভোরের প্রচ্ছদপটে রেকর্ড প্লেয়ারে যখন বেজে ওঠে—'তোমায় চিনি গো চিনি, ওগো বিদেশিনী',—মনে হয় তোমার সম্পর্কে আমার নিভৃত বুকের শেষ কথাটি যেন উদ্ধৃত হয়ে আছে ওখানে। ওখানেই।

কখনো বা উজ্জ্বল কোমল একটি অপর্যাপ্ত বিষাদে আচ্ছন্ন—রাত্রির জানালায় দাঁড়িয়ে বার বার, মনে হয়েছে আমার—'জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে'। এবং মাতাল সমীরণে পরিপ্লাবী অমৃত-যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত আমি অনন্তকাল ধরে যেন অপেক্ষা করে আছি আমার পরম ঈপ্সিতার, যে কোনোদিন আসবে না, যাকে কোনোদিন আমি পাব না।

তুমি তো জানো না, আমার এই জীবন যৌবনের সমস্ত অঞ্জলি যে তোমার জন্য। ভালোবাসার অন্য নাম বোধ হয়—বিষাদ, অন্ততঃ এই রক্ত-মাংসের পৃথিবীতে।

বার বার মনে হয়েছে আমার ভালোবাসার রহস্যময়ী
উপত্যকায় যন্ত্রণার নীল চাঁদ দাউ দাউ করে জ্বলছে।
অথচ তার কত বর্ণ, কত গন্ধ, কত আলো, কত দুঃখ!
এবং প্রতিটি মুহূর্তে কত উন্মোচনের অসহ্য আনন্দ!
উন্মোচনের নিরন্ত অপ্রাবৃত্তির অন্বয়ে ক্রমশঃই আমি
হয়ে উঠব। কিন্তু না, আমি হোল্ডার্‌লিনের মত
উন্মাদ হয়ে যাব না তোমার জন্য, ওগো দিওতিমা
আমার! কারণ, অনেক অজস্র আকাশের মধ্যে আমি এখন
অন্য আকাশ হয়ে ফুটে আছি। আকাশকে তো কেউ
বিদ্ধ করতে পারে না॥
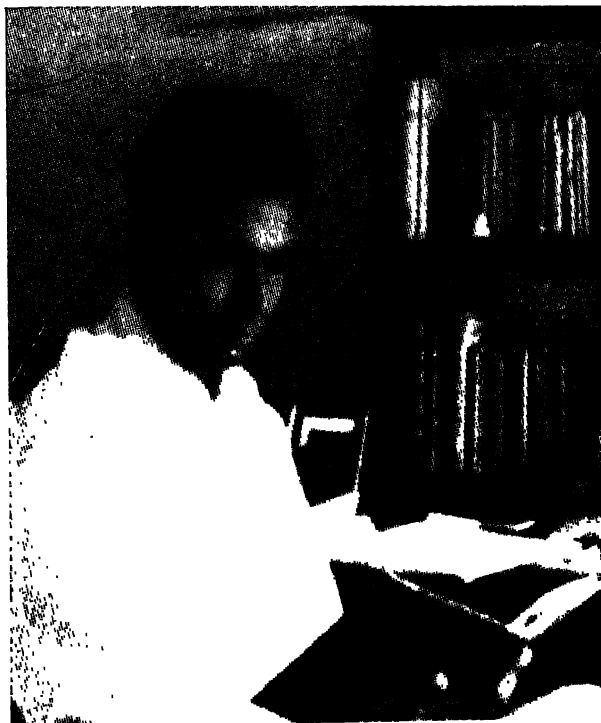
সুনীল বসু

ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক সুনীল বসুর কবিতায় প্রেম ভালবাসা সম্বন্ধে চলতি ধ্যানধারণার বাইরে এক বেপরোয়া প্রেমের জ্বালা, তীব্র ক্ষোভ, যন্ত্রণার এক বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমান সমাজের প্রতি গভীর বীতরাগ থেকে সুনীল বসুর কবিতার জন্ম যা যুক্তি দিয়ে নয় গভীর অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। মিতবাক, প্রচারবিমুখ পঞ্চাশের এই কবি শব্দচয়নে, ছন্দে পারঙ্গম।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: যশোর, পূর্ব-পাকিস্তান। ৩১ বৈশাখ, শনিবার, ১৯৩০। ঠিক নেই। **জীবিকা:** সাংবাদিকতা। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** তরবারি। **প্রকাশ সন:** আনুমানিক ১৯৪৪। **কবিতাটি কোন্ পত্রিকায় মুদ্রিত:**

অধুনালুপ্ত শ্রীযুক্ত মুরারী দে সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'আজকাল' পত্রিকায়। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: তেমনভাবে কেউই করেনি। করলে মনে থাকত। এখন তো মনে করতে পারলাম না। **প্রিয় বিদেশী কবি**: একাধিক: লুই আরাগঁ, লুই ম্যাক্‌নীস্‌, স্টীফেন স্পেন্ডর, ডি. এচ্‌. লরেন্স, ওগ্‌ডেন ন্যাস্‌, ই. ই. কামিংস, ওয়লেস্‌ স্টীভন্স, ওয়ল্ট হুইটম্যান, কার্ল স্যান্ডবার্গ। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: সার্থক কবিতা সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত থাকা। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব** |×| **প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত**: নিজের তিনতলার চিল্‌কুঠুরিতে। বেলা বারোটার সময়। গ্রীষ্মকাল। তখন খিদেয় নাড়ি চোঁ চোঁ করছিল। স্নান করিনি, ভাত খাইনি। মনে মনে আমি সারা পৃথিবী ঘুরি। নিজেকে কখনো কখনো নিষ্ঠুর দস্যু ভাবতে খুব ভাল লাগে। কবিতাটি 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: একেবারে শীর্ষে। সাহিত্যের নানাবিধ উপ-করণের মধ্যে আধুনিক কবিতাই সবচেয়ে চমকে দেবার মত আইটেম। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: এসব প্রশ্ন আমি বুঝি না। কবিতার ভবিষ্যৎ অতীত বর্তমান—এসব কথা ভাবতে একদম ভাল লাগে না। কবিতা বদলে গিয়েছে—আরো বদলাবে—বদলে গিয়েও যদি কবিতা রসগ্রাহীর মনে চার্জ করে—অবিরাম বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে দেয়—তাকে স্মৃতির মধ্যে দিয়ে বেশ কিছুদিনের জন্য যাত্রা করিয়ে দেওয়া যায়—তাহলে কবির একটা কাজ হয়।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ, প্রকাশ সন: সিন্ধুসাবস (১৩৬২), তিমির তরঙ্গ (১৩৫৮)। সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা: অধুনা (১৯৫০)।

সমুদ্র-নেকড়ে

ফার্নাণ্ডিজ নামে যুবা ছিল এক জলদস্যু ভূমধ্যসাগরে
পাল তোলা জাহাজের জঠরে গোপন ছিল পঞ্চাশ নাবিক
লাক্ষা-দ্বীপে পারা-দ্বীপে, যেত তারা সেলিবিস
কিম্বা মালাক্কায়
শান্ত কোন জাহাজের পাল ওড়াত কামানের অতর্কিত ঝড়ে

ফার্নাণ্ডিজ মূর্তিমান ধূর্ত ক্রূর শয়তান, রূপোর গেলাসে
আগুনের মত মদ গিলে খেত অট্টহাসে, নৈশভোজে তার
লাগত তিনটে আস্ত মুর্গি উননে ঝলসানো,
আর বিছানার পাশে
থাকা চাই ছিন্নভিন্ন লজ্জাবস্ত্র, লুঠ করা কোন অন্ধকার—

গাঢ় চুল, ভিনাসের মত দক্ষ নারীর শরীর;
একদা একটি তেজী আরবী ঘোটকীর মুখে লাগাম পরাতে
ধারাল ছোরার ঘায়ে খুব জব্দ হয়েছিল দস্যু ফার্নান্ডিজ
তবে চুমো খেতে গিয়ে মেয়েটিকে টেনে ছিঁড়ে
ফেলেছিল দাঁতে।

সমুদ্র-নেকড়ের দল ঘুরত লবণাক্ত জলে, পঞ্চাশ নাবিক
দাঁড় টানত হল্লা করে, মশাল জ্বালিয়ে খেলত দীর্ঘ তলোয়ার,
রাত্রিগুলি লুঠ করা নারীদের সঙ্গে সুরা আর বেলেল্লায়।
জাহাজ দাউ দাউ জ্বলত দস্যুর কামানে,
পুঞ্জ ধোঁয়া-একাকার।

কখনো কখনো হত লুঠের বখরা নিয়ে রক্তারক্তি খুন
কেহ কেহ কাহাকেও খুন করে ফেলে দিত সমুদ্রের জলে;
মাস্তুলের গায়ে বেঁধে পিস্তলের টিপ হত ঘোড়া টিপে টিপে
বিশ্বাসহন্তার খুলি, শেষে বোতলের সুরা হত্যার বদলে।

সমুদ্রের তলদেশে অকস্মাৎ পেয়েছিল ডুবুরির হাত
একটি জাহাজের ছাঁচ, সুন্দর জাহাজ এক, ভাঙা তলোয়ার;
(সম্ভবত সেলিবিসে, মালাক্কায়, কিংবা মাদাগাস্কারের ধারে)
কুরে কুরে লেখা ছিল 'জলদস্যু ফার্নান্ডিজ,
ষোলো শ পঞ্চাশ- '

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

গৌরাংগ ভৌমিক কাব্য জগতে নিয়মিতভাবে এসেছেন একটু পরে, তাই তাঁর মূল্যায়ন করতে গিয়ে অনেকেই তাঁকে ষাটের কবির আলোচনায় নিয়ে এসেছেন। সৎ কবিতা কোনো দশকেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এ একটা মাইল-স্টোনের মত দূরত্ব চিহ্নিত করে- -সুতরাং গৌরাংগ ভৌমিক জীবনযন্ত্রণার অনেকগুলো মাইল পেরিয়ে এসে এখন কবিতায় স্থিতধী হয়েছেন। গৌরাংগ নিজেকে ব্যক্ত করেন, বাক্যচাতুর্যে পথ হারান না। নিরহংকারী কবি শুধু নিরলস কবিতা-চর্চা করেন নি, কবিতা নিয়ে ভেবেছেন, তাঁর কাব্যে, চিত্রকল্প ও শব্দের দোতারা বাজে।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: অখণ্ড বাংলাদেশে, ১৯৩০। ৪এ, গোলোক দত্ত লেন, কলকাতা-৫। **জীবিকা**: শিক্ষকতা, 'অমৃতে' 'বৈকুণ্ঠের খাতা' লেখা, ছদ্মনামে ফীচার লেখা ইত্যাদি। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা**: মনে নেই, বলতে পারবো না। তবে বেশ কিছুসংখ্যক কবিতা লিখেছি। ১৯৪৯-৫০-এ। **প্রকাশ সন**: ঐ ১৯৪৯ থেকে ১৯৫০। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত**: মনে নেই।

প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল: রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ ও দিনেশ দাশের কবিতা ভালো লাগতো, এখনো লাগে। হ্যাঁ যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতা আমাকে নাড়া দিতো। **প্রিয় বিদেশী কবি**: সঠিক কারো নাম বলা মুসকিল। তবে জর্মন-ফরাসী কবিদের কবিতায় আমি বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: কবি মাত্রই অত্যন্ত সেনসেটিভ। স্বভাবতই অনুভবের গাঢ়তা, প্রকাশের অপূর্বতা, সংযত শিল্পমাধ্যমের অভিব্যক্তিতে অগ্রগামী। বাংলা সংস্কৃতির রূপান্তরে সেজন্যেই কবিতার স্থান সর্বোচ্চে। তার প্রতিফলন ঘটেছে জীবনে, চিন্তায় ও আচরণে। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত**: আমার কোনো প্রিয়-অপ্রিয় কবিতা নেই। প্রায় প্রতিটি কবিতার জন্য আমি লজ্জিত ও গর্বিত। লেখার পরে কোনো কবিতাই আমার ভালো লাগে না। অথচ তাদের অস্বীকার করতে পারি না। আসল কথা, আমার প্রিয় কবিতাটি এখনো লেখা হয়নি। হয়তো কোনোদিন লিখে উঠতে পারবোও না। তবে 'নতুন ঘরে যাবার সময়' কবিতাটি আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়, এটি নিতে পারেন। কবিতাটি ১৯৬৯ সালে 'অমৃত' শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: আধুনিক কবিতা চিরকালই সমকালে নিন্দিত ও উত্তরকালে প্রশংসিত হয়েছে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: যেমনটি লক্ষ্য করা গেছে মাইকেল মধুসূদনের ক্ষেত্রে। সাম্প্রতিক কবিতার চেহারা বদলটাকে আমি আধুনিকতা মনে করি না। স্বভাবতই একই ভাবপ্রবাহ বিভিন্ন বর্ণবৈচিত্র্যে প্রকাশিত হতে থাকে দীর্ঘকাল। কখনো আশ্রয়ের বদল হয়, হৃদয় পালটায় না। যখন পালটায়, বুঝতে হবে আধুনিকতার পূর্ববর্তী ধারাকে অস্বীকার করে নতুনতর চেতনার জন্ম নিচ্ছে ভেতরে ভেতরে। তার প্রকাশ ঘটে কেবল কবিতায় নয়, শিল্পসাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে। কেননা, আধুনিকতা কোনো একটি শ্রেণীর ব্যাপার নয়। তার ভবিষ্যৎ এখন কে বলবে?

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ সন: বৃষ্টিপাত (১৯৬৮)।
সম্পাদিত পত্রপত্রিকা: অনুভব, সাহিত্যচর্চা (১৯৬৮)।

নতুন ঘরে যাবার সময়

নতুন ঘরে যাবার সময় মনে পড়ল : চাবিটি নেই,
দরজা খোলার রূপোর চাবি
কোন তরঙ্গে রাখা ছিল?
এই মুহূর্তে তোমার কথাই মনে পড়ল

এখন আমি দুপুর রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে ঃ
আকাশ দেখছি, উড়ন্ত মেঘ, কোন সুদূরে
কেমন যেন কি আশ্চর্য সূর্য জ্বলছে

তবু কাউকে রাখা যায়না মুঠোর ভেতর
দুঃস্থ-স্মৃতি শুশ্রূষা চায়, যজ্ঞভূমির পাশের আসন।
তুমি যদি আসতে এখন চাবি হাতে
সকাল বেলার রৌদ্র কাঁপতো ঠোঁটের উপর
নতুন ঘরে যাবার আগে তোমার মুখটি মনে পড়ল।

সে কোন কালে গ্রাম ছেড়েছি, আল বাঁধা পথ, তীরের ভূমি।
শুনছি তুমি শহরবাসী কলের জলে স্নান করেছ।
আমিও ঠিক তোমার মতোই নতুন ঘরের খোঁজ পেয়েছি।
সেই চাবিটি কাছে থাকলে ভালো হতো।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলা কবিতার পাঁচ দশকের তরুণ কবিরা যখন বেপরোয়া ভংগীতে পূর্বসূরীদের গতানুগতিকতার বাঁধ ভেঙে নতুন করে কিছু বলার চেষ্টা করছেন, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে সমসাময়িক কবিদের অত্যন্ত কাছে থেকেও কবিতার বাচনভংগী, প্যাটার্নে শরৎ মুখোপাধ্যায় পৃথক একটি সুর সংযোজন করেছেন। মূলতঃ লিরিকধর্মী এই কবি, জীবনের অত্যন্ত গূঢ় কথাবার্তাগুলো বলতে গিয়ে যে চিত্রকল্পের সৃষ্টি করেছেন তাতে শব্দকে ব্যবহার করা হয়েছে চাবুকের মতো। অপরদিকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো দুঃখ বেদনাগুলো তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি। কবিতা ছাড়া অন্য কোন মিডিয়ামে শরৎ মুখোপাধ্যায় নিজেকে এভাবে প্রকাশ করেন নি।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: পুরী। ১৯৩১ (১৫ আগস্ট)। আর ৯০৩ নিউ রাজেন্দ্রনগর, নিউ দিল্লি-৫। **জীবিকা:** বেসরকারি দপ্তরে অর্থসচিব। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** মনে নেই। **প্রকাশ সন:** সম্ভবত ১৯৫২। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:** কোনো নগণ্য পত্রিকায় সম্ভবত। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** জীবনানন্দ দাশ, সমর সেন। **প্রিয় বিদেশী কবি:** একাধিক। যথা—এলিয়ট, ইয়েট্স্, র‍্যাঁবো, রিল্‌কে প্রভৃতি। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** নেই। কোন্ গতিকে অগ্রগতি বলবো, তাই তো জানি না। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** (অস্পষ্ট প্রশ্ন) সুকুমার পাঠককে সত্যের সঙ্গে সংযুক্ত রাখা ছাড়া কবি আর কী পারেন! **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও প্রকাশিত:** সাম্প্রতিকতম কবিতাটি আমার প্রিয়তম কবিতা। এখনো প্রকাশিত হয় নি। সুতরাং সংকলনের জন্যে 'রুগ্‌নদের কাছাকাছি' কবিতাটি দিলাম। এটি 'লা পয়েজি'র তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত। এখানেই লিখি। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** সর্বোচ্চে—অন্তত আধুনিক কবিতা বলতে আমি যে-সমূহ রচনাকে বুঝি। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** আধুনিক মানুষের ভবিষ্যতের মতো। হয় উজ্জ্বল নয়ত অন্ধকারাবৃত।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: সোনার হরিণ (বাং ১৩৬৮), র‍্যাঁবো ভের্লেন এবং নিজস্ব (১৩৭০), আহত ভ্রূবিলাস (১৩৭২), কোথায় সেই দীর্ঘচোখ (১৩৭৬)।
সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশ কাল: কৃত্তিবাস—দু'টি কি তিনটি সংকলন (১৯৬৪ বোধ হয়)।

রুগ্‌ণদের কাছাকাছি

আমি আছি, আমি থাকবো, আমি তোমাদের কাছে কাছে
বাগানে শোবার খাটে কার্পেটের আনাচে-কানাচে
নীরবে ঘুরঘুর করবো; ছোট-ছোট নরম থাবার
চিহ্ন দেখবে, কিন্তু তোমরা জানতেও পারবে না
সেই চিহ্ন কার।
জানবে না, প্রত্যহ রাত্রে কচি দাঁত দিয়ে কে ঠুকরোয়
গোড়ালি অঙ্গুষ্ঠ গাল—কে ঝাঁপায় কোলে,
কার শাদা ওষধি-শরীর
ঘুমের ভিতরে দূর নৌকার মতন ভেসে যায়।
এইভাবে রুগ্‌ণদের কাছাকাছি আমার ভ্রমণ—
অলক্ষ্যে নিভৃতে, যতদিন

হঠাৎ না জেগে ওঠো; যতক্ষণ
'খরগোশ খরগোশ' ব'লে তাড়া ক'রে না ফেরো আমাকে,
বাগানে শোবার খাটে কার্পেটে নক্‌শার ফাঁকে-ফাঁকে
আমাকে ধরার জন্য ভয় দেখাও!
আমি ধরা দেবো না কিছুতে—জেনে রেখো,
'খরগোশ খরগোশ' ব'লে যদি জোর ক'রে
কোলে তুলে নিতে চাও, দেখো—

অমনি মার্বেল দুটি চোখ থেকে খসিয়ে পালাবো॥

কবিতা সিংহ

পূর্বসূরীদের সৃষ্টিশীল ক্ষমতার উপর শ্রদ্ধা রেখে অত্যন্ত বিনীতভাবে কবিতায় এসেছেন কবিতা সিংহ। এই শহরের ক্লেদ যন্ত্রণা আত্মবিমুখতার পাশাপাশি প্রকৃতি-সৌন্দর্য তীব্র প্রেম-ভাবনায় তাঁর কবিতা অনন্য, বলার ভঙ্গীতে তাঁকে আলাদা করে চেনা যায়। ছন্দে চিত্রকল্পে, ভাবনায় তিনি উজ্জ্বল। কবিতা সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান-ধারণা একটু স্বতন্ত্র—কবিতা যখন আসবে লাইন ধরেই আসবে, সব সময়ই যে প্রসঙ্গ মনে আসে তাও নয়, সব মিলেমিশেই থাকে। প্রসঙ্গ প্রকরণকে তাই আলাদা করতে পারি না।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: কলকাতা। ১৯৩১। ১৬বি গোবিন্দ ঘোষাল লেন, কলকাতা-২৫। **জীবিকা:** চাক্‌রি। ফ্রি-লান্স্‌ সাংবাদিকতা, বিজ্ঞাপনের কপি লেখা। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** সম্ভবতঃ একটি ইংরেজি কবিতা। **প্রকাশ সন:** ১৯৪৬। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:** 'নেশন'। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ এবং খুব ছোট-বেলায় ফাল্গুনী রায়ের ১২টি কবিতা নামক বইটি। **প্রিয় বিদেশী কবি:** রিল্‌কে। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** মানুষ হিসেবে নিশ্চয়ই সচেতন ভূমিকা থাকতে পারে—কিন্তু কবিতা-লেখক হিসেবে কোনো সচেতন ভূমিকা এবং বিশেষ ভূমিকা নেই। থাক্‌লে কবিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। যদিচ অন্যান্য

স্বীকৃতি মেলে। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: অথচ কবিতার মধ্যেই সংস্কৃতির অগ্রগতির অনেক প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে পড়ে। এমন আপনা থেকে হয়ে ওঠা কবিতা দেখেছি হয়ত একটি আধটি লিখেছিও। তার প্রভাব পাঠকের ওপর —কি ভাবে পরবে তা তাঁর রুচি এবং চেতনার উপর নির্ভর করবে। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত**: সহজ সুন্দরী (১), (২) কলকাতায় লেখা ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৭, ১৩ই আগস্ট ১৯৬৯। 'দেশ'। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: শিখরে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: কবিতা সাহিত্য প্রকাশের সবচেয়ে বলশালী ধারা হতে চলেছে।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: সহজসুন্দরী (১৯৬৭)।
সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশ সন: ইদানীং (১৯৫৪), দৈনিক কবিতা (১৯৬৮)।

সহজ সুন্দরী ১

যে কথা বলতে পারিনে
আমি তার নাম দিয়েছি।
আমি যে নাম দিয়েছি
সে নামের ভাষা জানিনে।

যে নামের ভাষা জানিনে
তাকে যে চক্ষে দেখেছি।
আমার সে দুচোখের দেখা
এ পোড়া নয়ন মানেনা।
মানেনা নয়ন মানেনা।
যাকে এ দু-চোখ জানেনা
আমি তাকে হাতে ছুঁয়েছি।
আমার এ সত্যিকার ছোঁয়া
এ পোড়া দেহ জানে না।

জানে না দেহ জানেনা॥

ভাবি এ দেহ না হ'ত
সে কথা বলতে কি পারতেম!
ভাবি যে নামটি দিয়েছি
সেই নাম লিখে দেখাতেম!
ভাবি যে ভাষা বুঝেছি
সে ভাষা বলে বোঝাতেম!
ভাবি যে-রূপটি দেখেছি
সেই রূপ এ'কে জানাতেম!
ভাবি যে কান্তি ছুঁয়েছি
সে ছোঁয়া ছুঁইয়ে বোঝাতেম!
ভাবি যে দুঃখ বুঝেছি
সে সুখে কেঁদে ভাসাতেম!

সহজ সুন্দরী ২

চোখে যদি মন ফোটালে
মনেতে চোখ দিলেনা
বদলে তার বদলে
লজ্জায় ভুঁয়ে নোয়ালে।

লজ্জায় ভুঁয়ে নোয়ালে
তবু কেন ছেড়ে দিলেনা
বদলে তার বদলে
দুনিয়ায় বেঁধে ঘোরালে।

দুনিয়ায় বেঁধে ঘোরালে
কালা মুখ ঢেকে দিলে না
বদলে তার বদলে
রক্তে প্রেমের বিষ মেশালে।

রক্তে প্রেমের বিষ মেশালে
বিষে কাল ঘুম দিলে না
বদলে তার বদলে
চোখে মন ফুটিয়ে দিয়ে
বুকে কাণা হৃদয় দিলে
আঁজলায় যাচ্না দিয়ে
দুনিয়ায় বেঁধে ঘোরালে
দুনিয়ায় বেঁধে ঘোরালে।

শংখ ঘোষ

বাংলা কবিতার পঞ্চাশের কালের অগ্রজ-কবি; মিতভাষিতা ও সংহতি শংখ ঘোষের কাব্যের প্রধান গুণ। আপাতঃ সরল সাদামাঠা তাঁর কাব্যপংক্তিগুলির আড়ালে চাপা আবেগ, নিষ্ঠুরতা ও প্রেমের এক তীব্র সঞ্চার সতর্ক পাঠকের কাছে অসামান্য আধুনিকতায় দীপ্তি পায়। স্বপ্ন ও আঘাতময় জীবনবোধের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়েছে কবির ইতিহাস চেতনা। শংখ ঘোষ বহু ক্ষেত্রে লৌকিক ছন্দের সুদক্ষ ব্যবহার করেছেন।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: চাঁদপুর (পূর্ব পাকিস্তান)। ১৯৩২ ৫ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার। ১০৩ই বিধান সরণি। কলকাতা-৪। **জীবিকা:** অধ্যাপনা। বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:**

নাম মনে নেই। **প্রকাশ সন:** ১৯৪৬। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:** যুগান্তর। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** রবীন্দ্রনাথেই ছিল উদ্বোধন। **আপনার সবচেয়ে প্রিয় বিদেশী কবি:** দান্তে। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** আজকের দিনে কবির আর সে-রকম কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু কেবল কবিই জানে এর ন্যূনতম শিহরণের চিহ্নটুকু, এর উত্থানপতনের সমস্ত ইতিহাসটুকু কবি তার নিশ্বাসে নিয়ে নেয়। তবে লোকে আর তা টের পায় না, কিংবা ভুলে যায়। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:** আরুণি উদ্দালক। জলপাইগুড়ির বন্যার থেকে ফিরবার পর ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কবিতাটি লেখা হয়েছিল দুর্গাপুরের একটি হোটেলঘরে। 'এক্ষণ পত্রিকায় প্রকাশিত। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** বাংলা নাটক গল্প উপন্যাসের তুলনায় বাংলা কবিতা যে অনেকটা বেশি পরিণত ও নির্ভরযোগ্য তাতে সন্দেহ নেই। আরো একটু এগিয়ে বলা যায়, সাম্প্রতিক নাটক গল্প উপন্যাসের পাঠযোগ্য অংশটুকু কোনো-না-কোনো ভাবে কবিতারই দ্বারা স্পৃষ্ট। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** অনেকে ভাবেন, পৃথিবীর কবিতা-সমাজে বাংলা কবিতা এরই মধ্যে খুব বড়ো একটা সম্মানের আসন পাবার যোগ্য। আমার তা ধারণা নয়। আমার কেবল এই মনে হয় যে আর অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা কবিতা আধুনিকতা ঠিকমতো ধরতে পারবে তার স্বভাবে।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: দিনগুলি রাতগুলি (১৯৫৭), এখন সময় নয় (১৯৬৭), নিহিত পাতাল ছায়া (১৯৬৭), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭০)।
সম্পাদিত সংকলন: সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত—যুগ্মভাবে।

আরুণি উদ্দালক

[আরুণি বললেন, আমি জ্ঞানার্থী। গুরু আদেশ করলেন, যাও, আমার ক্ষেত্রের আল বাঁধো। পরে তাঁর ব্যাকুল আহ্বানে উঠে এসে বললেন আরুণি, জলপ্রবাহ রোধ করতে না পেরে আলে আমি শুয়ে ছিলাম, এখন আজ্ঞা করুন। ধৌম্য জানালেন কেদারখণ্ড বিদারণ করে উঠেছ বলে তুমি উদ্দালক, সমস্ত বেদ তোমার অন্তরে প্রকাশিত হোক॥ পৌষ্যপর্বাধ্যায়, আদিপর্ব, মহাভারত]

তবে কি আমিই ভুলে যাই? দিকচক্রবাল শুধু বাসা বানাবার অন্য ছল?
তবে কি অস্তিত্ব বড়ো অস্তিত্বের বেদনার চেয়ে? কার বাসা? কতখানি বাসা?
তোমার সমগ্র সত্তা যতক্ষণ না-দাও আমাকে
ততক্ষণ কোনো জ্ঞান নেই
ততক্ষণ পুরোনো ধ্বংসের ধারে অবসন্ন শরিকের দীঘি।

নীল কাঁচে আলো লেগে প্রতিফলনের মতো স্মৃতি, রাজবাড়ি
কবুতর ওড়ানো চত্বর
ভাঙা গ্রামে পড়ে আছো, শোনো
তবু একজন ছিল এই ধুলাশহরে আরুণি
সে আমাকে বলে গিয়েছিল আল বেঁধে দেবে সে শরীরে।

আমি গুরু অভিমানে বসে আছি সেই থেকে, দিন যায়—রাত
আবার রাত্রির পরে দিন, অস্পষ্ট দুহাত
নেমে আসে জানুর উপরে
জানা ও কাজের মধ্যে বহু সেতু, দেখাশোনা নেই
ঘরে ঘরে সকলেই নিঃসঙ্গ প্রস্তুত করে লক্ষ্মী-উপাসনা
যে যার আপনসুখে চলে যায় পূর্ণিমার দিকে
আমার নিঃশীল বসে থাকা
বিকল্প বন্ধুতা দেয় ঘটে জমেথাকা জল অলস মন্থর
হৃদয়ের কাছাকাছি মুখ নিলে ঘুরে যায় পাঁচটি পল্লব পাঁচ দিকে
আর সেই অবসবে ফেটে যায় জলস্রোত, কেননা প্রকৃতি না কি শূন্যের বিরোধী।

হাঁটুজল বুকজল গলাজল
শান্তিজল হয়ে ওঠে নীলজল পীতজল গলাজল
ঘট ভেঙে আমাদের ধরে ফেলে অতর্কিতে ভাসমান শূন্যের বিরোধী
মধ্যরাত ছুঁড়ে দিলে নিজের পায়ের ভর খুলে যায় পঞ্চশীলময়
আর সেই অবসরে ছোটে বাণিজ্যের ঢেউ ছলনা প্রস্তুত থাকে দিগন্ত অবধি
যে-কোনো আঘাত লেগে উড়ে আসে চালচিত্র ধ্বসে যায় প্রাচীরের তল
কে কোথায় আছো বলে টলে পড়ে যায় সব কবুতর ভাঙা রাজবাড়ি
তোমাদের হাতেগড়া একালওকালজোড়া ব্রিজগুলি ঝলকে মিলায়
পাশের বাড়ির বৌ শেষরাতে অন্ধকার ডানা ঝাপটায় খোলা স্রোতে
এদিকে সকাল আসে প্রায় পরিহাসময় কাঞ্চনজঙ্ঘার যোগ্য রুপালি ঠমকে।

বলে গিয়েছিল বটে. আছে কি না আছে কে বা জানে
ভুলে যায় লোকে।
আবার সমস্ত দিক স্থির করে জল
এ-ও এক জন্মাষ্টমী যখন দুহাতজোড়া নীলশিশু হাতে নিঃস্ব দেহ
জল ভেঙে যায়
আলোর কুসুমতাপে ছড়ানো গো-কুল
যে-কোনো যমুনা থেকে পায়ে বাজে বিপরীত চৌকাঠে জড়ানো তিন বোন

মুহূর্তের তুড়ি লেগে উড়ে যায় সমূহ সংসার
কেননা দেশের মূর্তি
কেননা দেশের মূর্তি দেশের ভিতরে নেই আর!

গড়ে তুলবার দিকে মন দেওয়া হয় নি আর কী
সহজেই বাঁধ ভেঙে যায়
চেতাবনী ছিল ঠিক, তুমি-আমি লক্ষই করি নি
কার ছিল কতখানি দায়
আমরা সময় বুঝে ঝোপে ঝোপে সরে গেছি শৃগালের মতো
আত্মপতনের বীজ লক্ষই করি নি
আমার চোখের দিকে যে ভিখারি হেসে যায় আমি আজ তার কাছে ঋণী
এতো দ্বিধা কেন বলে লাঞ্ছনা করেছে যারা তাদের সবার কাছে ঋণ
অবনত দিন
ভাবে, একা বাঁধ দেবে, তা কি কখনোই হতে পারে?
আমাদের বিশ্বাস ঘটে না
আমাদের ঘরে ঘরে প্রতি পায়ে জমে ওঠে পলি
আর অলিগলি
আতুর বৃদ্ধের হাতে খুঁজে ফেরে হারানো শরীর
আমাদের ঠোঁটে ওঠে হাসি
দুপুরে বাতাসভরা কেঁপেওঠা অশথের পাতা
যেমন নির্জন শব্দ তোলে
এখনো অম্বার স্বর ততখানি ঝরে পড়ে 'সুমন, সুমন'
আমাদের চোখে ভাসে সাবেক করুণা
অথবা কখনো
নিজেরই অথর্ব দেহ যেমন ধিক্কারে টেনে প্রতি রাত্রিবেলা
তোমার মুক্তির পায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই
তেমনই দূরের জলে দিয়ে আসি মৃত গাভী গলিত শূকর আর তোমাকেও মা
মুখে যে আগুন রাখি তত পুণ্য রটে না আমার
মৃত্যুশোকে কার অধিকার
কেবল অম্বার কণ্ঠ এখনো নদীর জলে 'সুমন, সুমন'
আর আমি বলে উঠি এসো এসো উঠে এসো উদ্দালক হও
স্পষ্ট হও, বাঁচো—
শুধু মূর্খ অভিমানে বসে থেকে জলস্রোতে কখন যে আরুণি সুমন
তৃষ্ণাদেবতার মূলে একাকার হয়ে যায় তা আমার বোধেও ছিল না।

কখনো চোখের জল হয়ে ওঠে সোনা।
কিন্তু কখন? সে কি এই আচ্ছন্ন বিলাপে?
দীর্ঘ আলপথ ঘুরে এই কুব্জ ক্যারাভান তোমার দুয়ারে এসে ভিখারি দাঁড়ায়
আর তুমি
শোকের আতসগড়া তুমি কী সুন্দর মজ্জাহীন
রাত্রিগুলি ওড়াও আকাশে
বণিকের মানদণ্ড মেরুদণ্ড বানাও শরীরে
বেতন জোগাও চোখে প্রত্যহযাপনছলে রাজপথে অন্ধকার ঘরে
তখন?
হে নগর, দীপান্বিতা ভাস্বতী নগরী
আকণ্ঠ নাগরী
মহিষের ধ্বস্ত দেহে যত লক্ষ রক্তবিন্দু জ্বালায় শকুন
তোমার রাত্রির গায়ে তার চেয়ে বেশি ফুলঝুরি
পোহালে শর্বরী
তোমারই প্রভাতফেরী মেতে ওঠে ত্রাণমহোৎসবে!

হবে, তাও হবে। মাথা খুব নিচু করে সবুজ গুল্মের ছায়া মুখে তুলে নিলে
ওর দেহ হয়ে ওঠে আমাদেরই দেহ, তাছাড়া এ অভিজ্ঞতার
অন্য কোনো মানে নেই
যখন আঙুল থেকে খুলে পড়ে নির্মল নির্ভর
তখনো দুখানি হাত দুঃখের দক্ষিণ পাশে স্থির রাখা
আরো একবার ভালোবাসা
এই শুধু, আর কোনো জ্ঞান নেই
আর সব উন্নয়ন পরিত্রাণ ঘূর্ণ্যমান অগণ্য বিপণি দেশ জুড়ে
যা দেয় তা নেবার যোগ্য নয়
আমাদের চেতনাই ক্রমশ অস্পষ্ট করে সাহায্যের হাত।
আছে সব সমর্পণে—এমন কী ধ্বংসের মধ্যে—আবার নিজের কাছে
ফিরে আসা, বাঁচা। তাই
যে বলেছে আজও এই প্লাবনে সংক্ষোভে মেঘে আমার সমস্ত জ্ঞান চাই
সে বড়ো প্রত্যক্ষ চোখে আপন শরীর নিয়ে বাঁধ দিতে গিয়েছিল জলে—

লোকে ভুলে যেতে চায়, সহজেই ভোলে!

আলোক সরকার

আলোক সরকার বিশ্বাস করেন—যে অমূর্ত উপলব্ধির জগতে সংগীত আমাদের উন্মুক্তি ঘটায়, কবিতার অমূর্ততা মৌল প্রতিন্যাসে সেই জগতের পাশাপাশি এক দ্বিতীয় ভিন্নতা দাবি করে। কবিতা কিছু বলে না, কবিতা বেজে ওঠে। আলোক সরকার সেই জাতের কবি যিনি অন্ধকার উৎসব কিংবা আলোকিত সমন্বয়, সব কিছুই প্রবীণ চোখে দেখেন। তিনি উদ্দাম, বেপরোয়া নন, যুক্তিনিষ্ঠ প্রতীকি ভাবনায় স্থিত, যেখানে কবির স্বতন্ত্র জগতে অশ্বত্থ গাছের গা বেয়ে সকাল গড়িয়ে বিকেল নামে, পাখি গান গায় কিংবা নাম-না-জানা ফুলের সৌরভ বারবার ঘুরে ফিরে তার কবি-মনের দরজায় কড়া নাড়ে।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: ৩০, মহিম হালদার স্ট্রীট, কালিঘাট, কলকাতা। ১৯৩২। ৪৫এ রাসবিহারী এভিনিউ। **কলকাতা-২৬। জীবিকা:**

অধ্যাপনা। শ্যামসুন্দর কলেজ, বর্ধমান। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** ঘুম। **প্রকাশ সন:** ১৯৪৭। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:** 'প্রভাতী'—পাটনা থেকে প্রকাশিত। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। **প্রিয় বিদেশী কবি:** জার্মান কবি হ্যেল্ডারলিন। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** প্রত্যক্ষত থাকতে পারে, না থাকলেও ক্ষতি নেই। অন্যদিকে কবিতারচনা কর্মটিই তো সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির একটা বড় অবদান। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির প্রত্যক্ষ ভূমিকা যদি কবিতার ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করতে চায়, ফল ভালো না হওয়ারই সম্ভাবনা। কবিতাকে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পকর্ম হিসাবে ভাবাই ভাল। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:**.'অস্বীকার'। ১৯৬১ সালে কলকাতায় রচিত। 'কবিপত্রে' প্রকাশিত। পরে 'অন্ধকার উৎসব' নামক কাব্যগ্রন্থে সংকলিত। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** এককথায় আমার কাছে, আধুনিকতার সংজ্ঞা, বিশ্লেষণী মন্ময়তা। এটা কোনো আত্মসমীক্ষা নয়, আত্মা, ব্যক্তিগত জীবন এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির যুক্তিশুদ্ধ পর্যালোচনা। বাংলা কবিতায় এই ধরনের চেতনা ঠিক কবে থেকে কাজ করছে বলা শক্ত, ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনো এক সময় থেকে হয়তো কাজ করছে, আধুনিকতার জন্ম তখন থেকেই। যথার্থ কবিতা একমাত্র এই ধরনের চেতনা-সম্ভূত বলেই আমার ধারণা, বাংলা কবিতায় একমাত্র এই ধরনের চেতনাসম্ভূত কবিতা, অর্থাৎ আমার সংজ্ঞায় আধুনিক কবিতারই স্থান আছে বলে আমার বিশ্বাস, আর সবই হয় পণ্ডশ্রম, অথবা শিশুসুলভ আবেগের মনোমোহন কৌতুক। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** কবিতা বলতে আধুনিক কবিতাই বুঝি, সুতরাং ভবিষ্যৎ একমাত্র আধুনিক কবিতারই।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: উত্তলনির্জন (১৯৫০), আলোকিত সমন্বয় (১৯৫৮), ভিন দেশী ফুল (১৯৫৫) যুগ্মভাবে, অন্ধকাব উৎসব (১৯৬৫) বিশুদ্ধ অরণ্য (১৯৬৯) শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭০)

সম্পাদিত সংকলন, পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশ কাল: শতভিষা (প্রথম প্রকাশ ১৯৫১), নির্বাচন (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫)।

অস্বীকার

দেখবো গোলাপফুল ফুটে আছে, পরিচিত বাগানের ঘর
কিন্তু কোনো মালী নেই। বিকেলবেলায় ছিলো, পোষা
তিনটে বেড়াল ঘোরেফেরে, নেভানো উনুন, বারান্দার দড়ির উপর
ভিজে কাপড়ের নিস্পৃহতা। অরক্ত বেদনা
চিরদিন কোন অস্বীকার জ্বালো বিস্তৃত ডালায়? বকুল-বেলার অভিমান।

আর প্রলোভন নেই যেন আকর্ষণ মনে হ'তো
একদিন। আজ স্বাভাবিক বাড়ি-ফেরা, সন্ধ্যায় সপ্রাণ
সিঁড়ির বিষাদে শুধু ছায়া নড়ে, কোথায় প্রান্তর ভ'রে ছায়া নড়ে!
অন্তরালে বিশাল আঁধারে কোন ভ্রমরের মলিন আনত!
বেদনা, নিভৃতে চাও অস্বীকার? অবচ্ছিন্ন ঘরে?

যেন স্তব্ধ দুপুরবেলার শীত জানালার পাশের উঠোনে
আকন্দ ফুটেছে, ভীরু শালিকের দরিদ্র প্রয়াস।
সারাদিন সম্পূর্ণ সংসার স্থির কর্মরত, বিকেলবেলায় অকারণে
মেঘ হ'লো। বেদনা, এনেছো হীরা, অশ্রুজল, আর একবার যাবো?
দেখবো গোলাপ ফুল ফুটে আছে, মালতীলতার অনায়াস।

তরুণ সান্যাল

কোনো কোনো কবি কাব্যজগতে আসবার আগে থেকেই তাঁর ধ্যানধারণায় প্রাজ্ঞ হন, তরুণ সান্যাল সেই জাতের কবি যিনি নানাজাতের নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সাম্যবাদী চেতনায় আজ স্থিত হয়েছেন। ছন্দ ও শব্দব্যবহারে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রমী। সংগ্রামী মানুষের উল্লাস, এবং আন্তর্জাতিকতা, তাঁর কবি-চেতনায় একটি প্রধান অনুভব। গীতি-কবিতা রচনায় কবি যথেষ্ট পারঙ্গম।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: পোরজনা, পাবনা জেলা। ২৯শে অক্টোবর, ১৯৩২। ৩২।১, হরতুকিবাগান লেন, কলকাতা-৬। **জীবিকা**: অধ্যাপনা। স্কটিশ চার্চ কলেজ। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা**: 'নূতন যুগের মাঝি'। [নিজে অবশ্য মনে করি প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কবিতা, ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত 'অগ্রণী' পত্রিকায়। কবিতাটির নাম 'বিদ্রোহী'] । **প্রকাশ সন**: সম্ভবত ১৯৪৬।

কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত: 'রামধনু' নামে ছোটদের পত্রিকা। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: রবীন্দ্রনাথ। **প্রিয় বিদেশী কবি**: পাবলো নেরুদা, এলিয়ট—এ দুজনেই। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: সময় জীবন ও ইতিহাসের সারাৎসার ধরতে পারেন কবি। তাই কবি ঐহিক ও মানসিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টিতে বিপুল প্রভাব রেখে প্রথমটিকে পরিবর্তিত হতে সাহায্য করেন। কোন এক সময়ের ঐহিক সংস্কৃতি (Material Culture) যদিও মানসিক সংস্কৃতির মৌলভূমি কিন্তু সেই মৌলভূমিটি বদলে দিতে গিয়ে মানসিক সংস্কৃতিও এগিয়ে যায়। কবির ভূমিকা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: যে কোন জাতির মধ্যেই পরস্পর-বিরোধী জাতি থাকে। শোষিত ও শোষক জাতি। শোষকজাতির কবি শোষণ-ভিত্তিক ভাবাদর্শের তাৎপর্যে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি বিঘ্নিত করে। শোষিত মানুষের কবি মানুষের গণতান্ত্রিক ও সমাজতন্ত্রী অভিব্যক্তিকে আজকের দিনে অর্গলমুক্ত করে, উন্নততর সংস্কৃতি ও জীবনের লক্ষ্যে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায় রচিত ও কোথায় প্রকাশিত**: আমার প্রিয় কবিতা কোনটা মনে করতে পারলাম না। এই মুহূর্তে 'করতলে রুদ্র' ১৯৬৭র নভেম্বরে কলকাতায়। অলিন্দ (আষাঢ়-আশ্বিন ১৩৭৫)। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যে, কবিতা ছাড়া সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ আর কিই বা লেখা হচ্ছে? বুর্জোয়ার টাকার থলি গল্প-উপন্যাস লেখকদের খোসগল্প, যৌন সুড়সুড়ি ইত্যাদিতে ঠেলে দিয়েছে। কবিতাকেও। তবু কবিতার মধ্যেই আছে এই সময়ের ব্যাধিনিরাময়ের পথ। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: আধুনিকতা দু-ধরনের। পশ্চিমী দেশগুলিতে পুঁজিবাদ তার মুমূর্ষু ধাপে এসে একচেটিয়া মূলধন—সাম্রাজ্যবাদের রূপ নিয়েছে। মূলধনের আক্রমণের দাপটে পশ্চিমী দেশগুলিতে কবিও অন্যান্যদের মতো নিজভূমে পরবাসী মনে করছেন। তাঁদের কাছে আধুনিকতা অনেকখানি আত্মকথন শোনানো বা পরাস্ত, দেয়ালে-পিঠ মানুষের হিং টিং ছট্ বুকনি, শূন্যতাবাদ, দুর্বোধ্যতা ইত্যাদিতে পরিত্যক্ত ভূমির কাহিনী বলা। আরেক আধুনিকতা আছে। সত্যিকারের সাচ্চা আধুনিকতা। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, শ্রমজীবী মানুষের বিশ্বদর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে সমাজের মূল প্রধাবনের রূপটি বুঝতে শেখা। বুঝতে শিখলে নিজেকে আর অতখানি পরবাসী মনে হবে না। যৌথ মানবজীবনের উচ্চতর স্বাধীনতার তাৎপর্যে যে জীবন আকাঙ্ক্ষিত, তার দিকেই কবিতাকে নিয়ে যাবেন। মানুষের ইতিহাসের প্রতিটি মহৎ উত্তরাধিকার সেখানে কবির অন্বিষ্ট। এ যুগ তো সমাজতন্ত্রেরও যুগ।

তাই প্রথম ধরনের আধুনিকতার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। দ্বিতীয় আধুনিকতার ভবিষ্যৎ বিপুল। আর আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ সে-দিকেই প্রসারিত। সেটাই ইতিহাসের শিক্ষা সময়ের দাবি। সত্যেরও।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন· মাটির বেহালা (১৯৫৬), অন্ধকার উদ্যানে যে নদী (১৯৬২), রণক্ষেত্রে দীর্ঘবেলা একা (১৯৬৮), তোমার জন্যেই বাংলা দেশ (১৯৬৮)।
সম্পাদিত সংকলন. লেনিনের যুগ (১৯৬৯)|যুগ্মভাবে।
পত্র পত্রিকা ও প্রকাশ সন: কবিপত্র (১৯৫৮-৬০), সীমান্ত (১৯৬২-), পরিচয় (১৯৬৮-)।

করতলে রুদ্র

সকলেরই হাতের মুঠোয় সূর্য থাকে
অথচ হা কেবা জানতে চায়
যেমন বালিকা কবে জানেনা যুবতী হয়ে ওঠে
যেমন জানেনা বীজ কোন জ্বালা ফুল হয়ে ফোটে
ছলছল নদীর জল বহে যায়
ছলছল নদীর জল অবিরল
তবু
নদী জানে নাকি কবে কোন চাপ
টার্বাইনে বিদ্যুৎ নাচায়?

এই সব দিনরাত্রি নিয়ত মুঠোয় ধরা আছে
যেন পয়সা ট্রামের টিকিট
হাতের মুঠো না খুললে জানা যায় না
ফড়িং না লঙ্কাজবা কীট না গ্র্যানিট
স্মৃতি না নিশ্চিতি নাকি
পার্থেনন আল্‌হামরা
অরোরা ক্রুজার শীতপ্রাসাদ

অথচ সবারই হাতে দিনগুলি
মুঠো খুললে দিনগুলি
ঝমঝম ছলছল দিনগুলি
কীনাঙ্ক কর্কশে নাকি ভাঙা আয়ুরেখা আর্দ্র ঘাম
অথচ কে জানে হাতে সূর্য ওঠে
সূর্য ডোবে
ভাস্কর মার্তণ্ড ইত্যাকার যার নাম

যেমন বুকের মধ্যে সবারই বাগান থাকে
কিন্তু সে বাগানে ঠিক চারাগুলি ডাঁটো হয়ে
ওঠেনি ওঠেনা
অথচ সবাই চাই প্রতিশ্রুতি পরিণতি
কিন্তু জল সার বীজ ঋতু পার হয়ে ফুল
ফোটেনি ফোটেনা
অথচ সবাই মালী
অথচ সবাই নিজ সংসারের রাজা
অথবা রাজাই হতে চায়

কারো ঠিক জানা নেই তবু হাতে অজান্তেই
সূর্যই নাচায়

ফুলগুলি
দিনগুলি
কাঁচা রোদ কচি যুবতীর ডাঁসা পেয়ারা চিবুকে খেলা করে
অথবা প্রথম আত্মসচেতন যুবকের
লক্ষ্যবেধে পাঞ্চালে অর্জুন পরবাসী
না-দেখা অপাঙ্গ যেন তরুণীরও সারঙ্গগ্রস্ততা

মাঝে মাঝে সূর্যগুলি দারুণ ধমক
মন্দির মসজিদ গীর্জা স্বর্গ ও সংসার টলে পড়ে
রাস্তাগুলি বাঁকা টান টান শুয়ে গান্ডীব যেনবা
রাস্তার প্রতিটি ল্যাম্পপোস্ট বা ট্রাফিক দ্বীপ
বেঁকে যায় দেবে যায়
হাতের ট্রিগার

সূর্যগুলি সূর্যগুলি কেমন অদৃশ্য হয়ে থাকে তবু
বিভাস চাঁদের হয়ে মুখ রক্তচ্ছটায় চন্দ্রিম
সে জ্যোৎস্না ধবলে দিনগুলি যেন প্লাবন বিথারে স্বপ্ন
ছায়া ছায়া রহস্য উদ্ভাস
সে জ্যোৎস্নায় রক্তপাতে ভরাপানসী তামসী জাহাজ ইতিহাস
উড়ে যায় অবহেলা টান পোল প্রপেলারে
চলছলচ্ছলাৎ

সূর্যগুলি এইবার তাহলে জ্বলুক, আমি
দিনগুলি তুলে নিয়ে যাই কাঁধে বাউল ঝুলিতে
আকাশ ও মেঘে ও কি জলদার্চি
শতরঞ্জ তালি ও রিফুর

একা যাই
একা একা

হে সূর্য হে পাবক পাপঘ্ন
ওহে জবাকুসুমসংকাশ দাহ
করতলে রুদ্র

সূর্যগুলি ॥

শোভন সোম

বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা থেকে হাজার মাইল দূরে থেকেও শোভন সোম সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে নিয়মিতভাবে চিন্তা করছেন। কোন সাতপাঁচের মধ্যে থাকেন নি, কফি হাউসে ঝড় তোলেন নি, কবিতার রাজ্যের কূটনীতি থেকে নিজেকে দূরে রেখে প্রচারবিমুখ এই কবি, কবিতা-বর্জিত অঞ্চলে থেকেও সৃষ্টির নেশায় উন্মুখ, দেখে ভালো লাগে। ব্যক্তিগত জীবনে শিল্পী, তাই শোভন সোম কবিতায় ছবি আঁকতে ভালবাসেন। অল্পকথায় কবিতায় স্বতন্ত্র মেজাজ ও ভাবনা পাঠককে গভীরভাবে ছুঁয়ে যায়।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: শিলচর, আসাম। ১৯৩২। ১২৮, অভ্যংকর নগর, নাগপুর-৩, মহারাষ্ট্র। **জীবিকা:** পেশাদার চিত্রী। **প্রথম**

প্রকাশিত কবিতা: 'মহামৃত্যুর মাঝে অমর'। **প্রকাশ সন**: ১৯৪৬। **কবিতাটি কোন্ পত্রিকায় মুদ্রিত**: আবাহনী, মৌলবীবাজার, শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: না। আমার বাল্য ও কৈশোর কেটেছে বাংলাদেশ থেকে দূরে মফস্বলের অখ্যাত সব জায়গায়। বাড়িতে শুধু 'প্রবাসী' আসত। সেটা বড়রা পড়তেন। কবিতা বলতে পড়তুম স্কুলের বইয়ের কবিতা, যা তখনি আমার কাছে অপাঠ্য বলে মনে হতো। অন্যের সত্যিকার কবিতা পাঠের অনেক আগেই আমি কবিতা লিখতে শুরু করেছি। **প্রিয় বিদেশী কবি**: কেউ না। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তির আত্মবিকাশই সংস্কৃতি এবং কবিতা আত্মবিকাশেরই অন্যতম প্রকৃষ্ট পন্থা। কবিতাকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতির অগ্রগতি নিরূপণ সম্ভব নয়। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: অমোঘ, অনস্বীকার্য, অপরিসীম, অপরিমেয়। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত**: যে কবিতাটি পাঠালুম। তিনবছর আগে, কলকাতায় ক্যানসার হাসপাতালে শেষবার অপারেশনের টেবিলে যাবার মুহূর্তে কবিতাটির জন্ম। এর চেয়ে অধিক রক্তমাংসের কবিতা, সেই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, আর কি লিখেছি? কবিতাটি 'চতুরঙ্গে' ছাপা হয়েছিলো। **বাংলাসাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: সবচেয়ে উপরে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: এখন যে-সব কবিতা লেখা হচ্ছে, সেগুলো সবই আধুনিক। ত্রিশে প্রাচীন পন্থী কবিতার বিরুদ্ধে যাঁরা নেমেছিলেন, তাঁদের কবিতাকে চিহ্নিত করার জন্যে 'আধুনিক' বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়েছিলো। এখন সেটা খারিজ করা উচিত, সব কবিতাই এখন আধুনিক, তাই আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ জানতে না চেয়ে কবিতার ভবিষ্যৎ জানতে চাওয়া উচিত ছিলো। আমার মনে হয়, কবিতায় গুরুদেবদের যুগ চিরতরে চলে গেছে। এখন সমষ্টিগতভাবে ভালো কবিতা লেখা হচ্ছে। আমি এটাকে কবিতার স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে মনে করি। তাই কবিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি আস্থাবান।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: শরবিদ্ধ (১৯৬৪)।

আপনি কি পারবেন!

আপনি কি শরীর থেকে সমস্ত যন্ত্রণা
নির্মূল করবেন,
যতখানি রোগের বিস্তৃতি
কেটে ছেঁটে বাদ দিয়ে রেডিয়ম দিয়ে তাড়াবেন!

রোগের উপান্তে স্নিগ্ধ নাম নিরাময়,
তন্ন তন্ন করে তাই দেখছেন আমায়!

রোগের মতন সারাক্ষণ
আমাকে জড়িয়ে আছে শরীরের আরো কিছু অসহ্য যন্ত্রণা
আরো ভয়াবহ,
তন্ন তন্ন করে কেটে দেখুন না, ডাক্তার
কোন্‌খানে এত তাপ এত ঘৃণা ভালোবাসা বাঁচবার বাসনা
আমাকে জ্বালায়...
কেটে ছেঁটে বাদ দিয়ে পুড়িয়ে এদের
তাড়ান না, ডাক্তার!

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
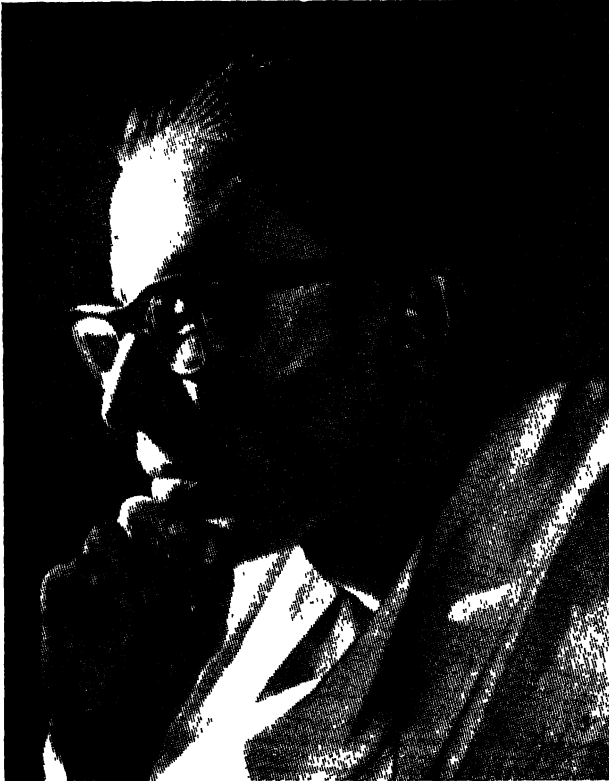
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতাবলীর প্রধান বিষয় ঈশ্বর। কবি-চরিত্রে তিনি বৃহত্তর অর্থে মানবিক। তাঁর ছন্দ-নির্মিতির দক্ষতা ঈর্ষণীয়। সূক্ষ্ম ভাবনাকে আকারে ইংগিতে ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুলতে তিনি রীতিমতো কৃতি। বাংলা-কাব্যের আধুনিকতার নৈরাশ্যময় রূপ অলোক-রঞ্জনের কবিতায় অত্যন্ত নীরব ভংগিতে ধরা দেয়। সংলাপে পটুতা, ব্যঞ্জনাময় অন্তরংগ চিত্রকল্প, তাঁকে উল্লেখযোগ্য করেছে।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: কলকাতা। ৬ অক্টোবর, শুক্রবার, ১৯৩৩। ১৪৫ই প্রিন্স গোলাম হুসেন শাহ্ রোড, কলকাতা-৩২। **জীবিকা:** অধ্যাপনা।

প্রথম প্রকাশিত কবিতা: 'তিন সুর'। **প্রকাশ সন:** যতোদূর মনে পড়ে, ১৯৪৭। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:** দৈনিক বসুমতী। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** জানি না। **প্রিয় বিদেশী কবি:** রিল্‌কে। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** অবনীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করে বলতে পারি জাতির সঙ্গে কবি, শিল্পী এদের যোগ ঘুমন্তের সঙ্গে জাগ্রতের যোগ। সংস্কৃতির অগ্রসৃতি ব্যাপারে কবি নিঃসন্দেহে পথপ্রদর্শক। কিন্তু ঐ কবিভূমিকার পাথুরে প্রমাণ দেওয়া শক্ত। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ মাধ্যমই তো কবিতা। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:** 'ঘুম'। সঠিক সময় মনে নেই। কলকাতায় রচিত। সম্ভবত বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** আধুনিক কবিতা বাংলা সাহিত্যের পবিত্রতম অহঙ্কার। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** জানি না।

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: যৌবন বাউল (১৯৫৯), নিষিদ্ধ কোজাগরী (১৯৬৮), রক্তাক্ত ঝরোখা (১৯৬৯)।
সম্পাদিত সংকলন: সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত (যুগ্মভাবে)।

ঘুম

আবার কখন ঝড়ের শেষে নিজের শরীর ফিরে পাওয়া—
সমস্তপ্রাণ বকুলবেদী বকুল-ছাওয়া,
ডিঙি নৌকোর শান্তি শান্তি   দাঁড়ের শব্দ, শান্তি শান্তি,
নারিকেলের পাতায় পাতায় দীঘল হাওয়া।

তোমায় নিয়ে গিয়েছিল তিনটি পুরুষ, একটি নারী
বলেছিলে: "সবার বন্ধু হ'তে পারি;
তিনটি পুরুষ নারীটিকে   নিয়ে গেল খালের দিকে,
তোমায় তখন করেনি কাণ্ডারী।

আর শেষে ঐ নারীটিকে বিকেলবেলায় তোমার কাছে
রেখে গেল তিনটি দস্যু, তোমার বুকে জায়গা আছে
মনে ক'রে বনের ভিতর তারা
দৃশ্যের রোমাঞ্চ খুঁজে চলে গেল মাতাল আত্মহারা।

তুলসীতলার অঙ্গনা সেই বিবর্তিতা প্রাঙ্গনা সেই নারী
এলো তোমার বুকের ভিতর জায়গা নিতে, জানুর উপর
কবরী তার দিলো সে সঞ্চারি,
দেহ তো নয় মোমের ক্ষরণ, রেখেছে তার একটি চরণ
অন্ধকারে, আলোর শরীর পরিপূরক তারি।

ওপারে নীল হলুদ হলো, হলুদ শেষে অবিমিশ্র কালো,
প্রসারিত ভালোবাসা শেষ দুইবার করুণা ঠিক্‌রালো;
নিরালা বন, বনের প্রান্ত ব'লে উঠলো: 'হে অশান্ত,—
কাকে তুমি ভালোবাসার আলো
দিতে চাইছো? তুমি যাকে ভালো ক'রে কখনো জানোনি
তাকে তুমি আলিঙ্গনে বাঁধলে কেন? তোমার আলিঙ্গনই
পাবে যে সে জানতো না, আর সেই তিনটির একজনা তার
লক্ষ্য ছিলো৷ ভেবেছিলো সহজ হবে নীরব নির্বাচনী:
কিন্তু সেজন তৃষ্ণাজীবী, অন্য দুজন তার আদর্শে গড়া
জীবন-অন্য-করা;
তোমার কাছে রেখে গেছে তারা যে-ফুল ঝরিয়েছে
তোমার সমবেদনা তার বিশল্যকরণী।'

হঠাৎ শব্দ থেমে গেল, একটু জ্যোৎস্না পাতার জানালার
মধ্য দিয়ে এসে পড়ল, তুমি দেখলে নগ্ন শরীর তার
শিশুর মতো প'ড়ে আছে, গভীর ঘুমের কারুকাজে
চোখের দুটি নম্র নদী, ভ্রূযুগে ভৃঙ্গার।

শিশুর চেয়ে আরো সহজ কি যেন কোন কাজল পরেছে সে
সারা শরীর যেন শুধু একটি নয়ন, তোমার চোখে এসে
একটু ঘুমের ঘর বেঁধেছে মাকে ছেড়ে সকল ত্যেজে
তোমার কাছে ঘুমোতে আজ এসেছে সে মানুষ ভালোবেসে॥

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

চলন, বলন এবং কবিতায় পঞ্চাশের লোকপ্রিয় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় কবিতা-বাজারে এক সময় যথেষ্ট আলোড়ন এনেছিলেন। বাংলা কবিতায় এত সাহসের সংগে অন্ত্যজ, লৌকিক, উপেক্ষিত শব্দকে তাঁর মতো খুব কম কবিই ব্যবহার করেছেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা একাধারে, বিদ্রোহী, সোচ্চার, অপর দিকে নিসর্গ চেতনায় লীন, তাঁর উদাসীন অন্তরে এক গভীর আস্তিক্য বোধ কাজ করে। গীতিময়তা তাঁর কবিতায় প্রধান উপজীব্য। প্রেম, যন্ত্রণা তাঁর কবিতার মূল বিষয়, বিষাদ তার কবিতাশ্রিত। এক ভূতগ্রস্থ নিশি পাওয়া অনুভব তার অচেনা-লোক, ভ্রাম্যমাণ কবি-চরিত্রের মগ্ন অস্তিত্বে।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: বহড়ু, ২৪ পরগণা। ১৯৩৩, বার: ২৫শে নভেম্বর, রবিবার। ৪৬।৪ ব্রাহ্মসমাজ রোড, কলকাতা-৩৪। **জীবিকা:** লেখাপত্র।

প্রথম প্রকাশিত কবিতা: যম। **প্রকাশ সন**: মনে নেই, তবে ১৯৫৬-৫৭-র কোনো সময়। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত**: 'কবিতা' পত্রিকা। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: অনেকেরই। **প্রিয় বিদেশী কবি**: রিল্‌কে। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: কবির ভূমিকা কখনো পদাতিকের, কখনো একঘরের। একঘরে বলতে আমি স্বেচ্ছানির্বাচিত—এমন একটি পদ বসাতে চাই। কবি সেরা সাংস্কৃতিক—অর্থাৎ সংস্কৃতির সার নিয়েই তিনি কাজকর্ম করেন. ক'রে থাকেন। পদ্য প্রভৃতি সংকুল কাগজাদি বের করা যদি সাংস্কৃতিক ভূমিকার অন্যতম হিসেবে গ্রাহ্য হয়, তাহলে দেখা যাবে প্রায় সব কবিই কোনো না কোনো ভাবে পত্রপত্রিকা প্রকাশ করেছেন বা প্রকাশে সাহায্য করেছেন। হয় গোষ্ঠী গড়েছেন, নতুবা অন্যের গড়া গোষ্ঠীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া ঠিক আর স্পষ্ট সাংস্কৃতিক আন্দোলন বলতে আমাদের দেশে আজ কিছুই নেই। রাজনীতির সংস্কৃতি? হ্যাঁ, তাতেও আছে কোনো কোনো কবির বেশ সক্রিয় ভূমিকা। ভালো-মন্দের কথা নয়। যে যেখানে সংলগ্ন, সে সেখান থেকে অন্তর্গত শক্তিই আহরণ করে। কেউ কি একাকী থাকতে চায়? হয়তো তাই কেউ রাজনীতির কুঁড়েঘরে জমে, কেউ বা তন্ময় হয় দক্ষিণেশ্বরের চাতালে, ছোটেন কেউ দেওঘর-আশ্রমে। কোনোটিই দূষ্য নয়, কোনোটি নয় অকারণ। আমি যদি শান্তি পাই, রোজ একটি ক'রে ময়দানে মুচকুন্দ গাছের পাতা ছিঁড়ে জীবনযাপন করতে পারি। কে বাধা দেবে? সর্বপ্রকার নতুন, রহস্যময় আর অগ্রবর্তী ভূমিকা কবিরই তো! কে আপত্তি করবে? **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: প্রভাবের প্রসঙ্গে এসেই আপনাদের প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্য মনে হলো পরিষ্কার, আমার কাছে। কবিকে প্রশ্ন করছেন, অথচ স্পষ্ট হচ্ছেন না—এ কেমন কথা? সংস্কৃতি-ফংস্কৃতি ছেঁড়া কথা—বলতে চাইছেন হয়তো বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার ছায়াপাত হয় কিনা কবির মনে! হয় বৈ কি! কবি তো আর সৃষ্টিছাড়া জন্তু নয় কোনো? চিম্‌টি কাটলে তারও লাগে। তবে দেখ্‌তে হবে, কে কবি, কেমন কবি। সব কবিই তো আর কবি নয়! অনেকেই রাজনৈতিক কবি? অর্থাৎ কবিতার সঙ্গে তাঁর সংশ্রব যতো নয়, তার চেয়ে বেশি সম্পর্ক রাজনীতির সঙ্গে, তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই—তবে তিনি কখনো, কোনোদিন কবির পংক্তিতে দাঁড়াবেন না। বিশ্বাস এক কথা আর সর্বসমর্পণ অন্য কথা। রাজনীতি অংশে বিশ্বাসী নয়। সমগ্র ধরে তার প্রবল টান। মৌলিক আর স্বাধীনতাপ্রিয় (প্রায় সবাই) কোনো কবি কি এমন এক শর্তে বাধা পড়তে পারবেন? পারলে ভালো। আমি অন্তত পারি না। কেউ যদি পেরে থাকেন বা পেরে আছেন বলেন—তিনি বিবেচনান্তর আমার নমস্য। আমি, বলা যায়, তেমন বিশ্বাসী ও বলবান কোনো রাজনৈতিক কবির জন্যেও বসে আছি। **স্বরচিত প্রিয়**

কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত: সে বড়ো সুখের সময় নয়... বছর ৪।৫ আগে লেখা উল্টোডিঙির বাসায়, 'কৃত্তিবাসে' ছাপা। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: বলতে গেলে বলতে হয় সাহিত্যের প্রথম সারির প্রথম কবিতা। কেন? তা বলতে হলে লাখ কথা খরচ করতে হয়। তার সময় আমার আপাতত নেই, আর সে কর্তব্যও আমার নয়। সুতরাং আমার কথার ওপর বিশ্বাস আপনাকে রাখতে হবে—নচেৎ দূরে যান। এক কবিতার প্রকাশকের সঙ্গে থেকে যেটুকু দেখছি, তাতে কবিতার রুচি ক্রমবর্ধমান, খরিদ্দার প্রভৃত—আর সাধারণ মানুষের মনে কবির সম্পর্কে উৎসাহ। এই প্রমাণই কি যথেষ্ট নয়? আর ফাঁকা কথা কী হতে পারে—যা বললে আপনারা সন্তুষ্ট হবেন? **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন হতে পারি না। যেমন জানি না নিজেরই বা ভবিষ্যৎ কি? ভালো কথা বললে, জ্যোতিষশাস্ত্র ও হাত-দেখায় আমি সন্তুষ্ট, নচেৎ নয়। তাই যদি কেউ বলেন আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ অন্ধকার—আমি তৎক্ষণাৎ সেই অন্ধ ও মূঢ়ের গালে এক থাপ্পড় কষিয়ে দেবো। ঐ আমার গায়ের জোরে উত্তর দেবার রীতি। নমস্কার।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ সন: হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য (১৯৬২), ধর্মে আছো জিরাফেও আছো (১৯৬৭), অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে (১৯৬৭), সোনার মাছি খুন করেছি (১৯৬৮), হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান (১৯৬৯), চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৯৭০)। সম্পাদিত পত্রপত্রিকা: সাপ্তাহিক বাংলা কবিতা (১৯৬৭?)।

সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়

পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ,
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে
বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা,
বুকের ভিতরে বুক
আর কিছু নয় (আরো অনেক কিছু?)—তারও আগে
পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ,
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে
বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা,
বুকের ভিতরে বুক
আর কিছু নয়।
'হ্যান্ডস আপ্'—হাত তুলে ধরো—যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ
তোমাকে তুলে নিয়ে না যায়

কালো গাড়ির ভিতরে আবার কালো গাড়ি, তার ভিতরে আবার
কালো গাড়ি
সারবন্দী জানলা, দরজা, গোরস্থান—ওলটপালট কঙ্কাল
কঙ্কালের ভিতরে শাদা ঘুণ, ঘুণের ভিতরে জীবন, জীবনের ভিতরে
মৃত্যু—সুতরাং
মৃত্যুর ভিতরে মৃত্যু
আর কিছু নয়

'হ্যান্ডস আপ্'—হাত তুলে ধরো—যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ
তোমাকে তুলে নিয়ে যায়
তুলে ছুঁড়ে ফেলে গাড়ির বাইরে, কিন্তু অন্য গাড়ির ভিতর
যেখানে সব সময় কেউ অপেক্ষা করে থাকে—পলেস্তারা মুঠো ক'রে
বটচারার মতন
কেউ না কেউ, যাকে তুমি চেনো না
অপেক্ষা করে থাকে পাতার আড়ালে শক্ত কুঁড়ির মতন
মাকড়শার সোনালি ফাঁস হাতে—মালা
তোমাকে পরিয়ে দেবে—তোমার বিবাহ মধ্যরাতে যখন ফুটপাত বদল হয়
—পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে
দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ।

মনে করো, গাড়ি রেখে ইস্টিশান দৌড়ুচ্ছে, নিবন্ত ডুমের পাশে
তারার আলো
মনে করো, জুতো হাঁটছে, পা রয়েছে স্থির—আকাশ-পাতাল
এতোল-বেতোল
মনে করো, শিশুর কাঁধে মড়ার পাল্কি ছুটেছে নিমতলা—পরপারে
বুড়োদের লম্বালম্বি বাসরঘরী নাচ—

সে বড়ো সুখের সময় নয়—সে বড়ো আনন্দের সময় নয়
তখনই
পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে
বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা,
বুকের ভিতরে বুক
আর কিছু নয়॥

আনন্দ বাগচী

আনন্দ বাগচী যখন কবিতা লেখেন তখন হৃদয়ের সব ক'টা দরজা একসঙ্গে খোলা থাকে। তাঁর চোখে যেমন বি'ধে থাকে আকাশ, তেমন মাটিতে থাকে পা, তাই তাঁর কবিতা কখনো আবেগের অসামঞ্জস্যে মার খায় না, কিন্তু কবি এখন খুব অল্প লেখেন তবু যখন কলম ধরেন, তখনই মনে হয়—'উজ্জ্বল ছুরির নিচে টেবিলে শুয়েছি বুক খুলে' সমাজ সচেতনতা, নিখুঁত ছন্দ, অনায়াস ছবি আঁকার ভূমিকায় আনন্দ বাগচী বিশেষভাবে দক্ষ, তাঁর কবিতা কখনো কখনো শাণিত ইস্পাত হয়ে ঝলসে ওঠে।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: স্বাগতা গ্রাম, জেলা পাবনা। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। প্রসন্ন ব্যানার্জী রোড, বাঁকুড়া। **জীবিকা:** অধ্যাপনা। **প্রথম প্রকাশিত**

কবিতা: মনে নেই। **প্রকাশ সন**: [×] **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত**: [×] **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়। **প্রিয় বিদেশী কবি**: টি. এস. এলিয়ট। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: [×] **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: [×] **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও প্রকাশিত**: বিশেষ কোনো একটি প্রিয় কবিতা আমার নেই। কোনো কবিতাকেই আমি অপ্রিয় জ্ঞান করি না। আসল কথা, কবিতা লেখার পরেই যত দ্রুত সম্ভব আমি তাকে মুক্তি দিই, ভুলে যাই। আষাঢ়, ১৯৬৪। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: প্রথমা; ঘুরে ফিরে এই কবিতায়, কবিতার স্মৃতিতে ফিরে ফিরে আসতেই হবে, কারণ সাহিত্যের প্রাণের কথা, গভীর স্বীকারোক্তি এবং আত্মরতি এই কবিতার মধ্যে। সাহিত্যের রস ও রঙের সোনার দোয়াত এই কবিতা। কবিতায় না ডুবে এবং না ডুবিয়ে কোন কিছুই গাঢ় করে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: নানাবিধ পরীক্ষা সাময়িক, স্বল্পকালীন, এবং বয়সোচিত। কখনো বা আক্ষেপানুরাগ মাত্র। কিন্তু পরীক্ষা পাস আছেই। স্থিত হবেই। জীবনে প্রতিষ্ঠিত, কারণ আধুনিক কবিতা খেলনা নয়, ফেলনাও নয়। সমস্ত সাহিত্যের সোনারূপা তামার তলায় সে কষ্টিপাথর হয়েই থাকবে।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: তিনটি স্বগতসন্ধ্যা (১৯৫৪), তেপান্তর (১৯৫৯), স্বকালপুরুষ (১৯৬৪) [কাব্য-উপন্যাস]।
সম্পাদিত পত্রিকা: সেতু, কৃত্তিবাস, পারাবত।

ব্যক্তিগত, অতি ব্যক্তিগত

পুরনো স্কটিশ চার্চ, ডাকবাংলা, পল্লবিত অর্কিড রোদ্দুর,
নাগরদোলায় ঝুলছে অন্ধনারী, প্রাক্তন বেদনা
ভূতুড়ে সময় খেলে গঙ্গাজলে, উল্টোপাল্টা জলস্রোত ছুঁয়ে
দরজার নম্বরে, নামে, ডাকনামে, অবিস্মরণীয় কবিতার
আত্মহত্যাকারী সব বিচিত্র লাইনে; বেলা যায়।
চকমকি কলকাতা বুকে তাপ দিয়েছে বহুকাল থেকে
নিমতলা লেনের বাড়ি, বাগবাজার, উনিশ বছর
প্রথম চিঠির মত কৈশোরের ডাকবাক্স ভরা
দিনগুলি রাতগুলি চলে গেছে চকখড়ি মুছে রেখে।

সমস্ত খোয়াই স্মৃতি, স্টোন চিপস্, ক্যাকটাস এখন
সমস্ত গল্পের গিল্টি মারাত্মক ভালোবাসাগুলি
আমার সর্বস্ব কেড়ে নিল।
হল না প্রতিমা গড়া, প্রত্যক্ষ পুতুল, কোন কিছু
নক্ষত্রের দিকে চেয়ে নিঃসঙ্গতা চিনেছি এখন
দুরারোগ্য সাহিত্যকে বুকে নিয়ে উত্তাল তিরিশে
জল পড়ে পাতা নড়ে অন্ধকারে, বিশল্যকরণী অন্ধকারে
মর্গ থেকে ফিরে এল নষ্টচাঁদ যৌবন কুড়িয়ে
হাতের ছড়ানো তাস, ক্যারমের ঘুঁটি, সহোদরা
বোনগুলি, পটে লেখা, দিল্লিবাংলা জুড়ে নানাখানে;
ভিলাই রাউরকেলা দুর্গাপুরে উন্মাদ বন্ধুরা
মাঝে মাঝে ডাক পাঠায়,
চমকে উঠি পোস্টেজ জলছবি।
কলকাতার পান্থশালা পড়ে থাকল, রাত দশটার বাসে চড়ে
হুইলের সুতোমুখে ফিরে যাই,
আবার আবার ফিরে যাই;
কিছুই থাকে না প্রিয়, প্রিয়তম, নিশ্বাসের মত।
বাসের জানলায় বসে মুখ রেখেছি অন্ধকরতলে
হাওড়ার ব্রিজ থেকে হাওয়া আসছে উথালপাথাল,
ডালহৌসি শুয়ে আছে জি পি ও-র বিনিদ্র ঘড়িতে
হঠাৎ ডাকনাম শুনে চমকে জেগে উঠি
হাওড়ার সুনীল হাজরা ঈশ্বরী পাটনী চেয়ে আছে।

ফিরতে পারে না কেউ অনাসক্ত বেদনায় মুখ ঢেকে রেখে, জানলাম।

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

স্বদেশরঞ্জন দত্ত কত বড়ো কবি, তরুণ কবিকুলের মধ্যে তিনি কতখানি পরিচিতি লাভ করেছেন সে প্রসঙ্গে না গিয়ে তাঁর সম্বন্ধে এটুকুই বলা যায়, কবিতা রচনায় তাঁর নিরলস সাধনা এবং বাংলা-কবিতা প্রসারে স্বদেশরঞ্জন দত্ত একনিষ্ঠ নীরব সাধক। বিশ্বাস ও বিশ্বাস-ভঙ্গের বেদনাজনিত নষ্ট অনুভূতি, তিক্তবোধ ও শোকাচ্ছ্বাস দীর্ঘদিন তাঁর কবিতায় প্রধান প্রধান বিষয় ছিল। এখন আত্মস্থ মানবিক-কবিতা রচনায় ব্রতী। প্রকরণে এক ধরনের কঠিন ব্যঞ্জনা আনায় কবি সচেষ্ট।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: কলকাতা। ১৯৩৩, ১১ই পৌষ, শনিবার। ১৮, পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর, কলকাতা-২০। **জীবিকা:** নিতান্তই সাদামাটা একটা চাকরী আর কিছুই নয়। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** সম্ভবত 'সরস্বতী বন্দনা' গোছের কিছু একটা হবে। সঠিক নাম কি ছিল মনে করতে পারছি না।

প্রকাশ সন: ১৯৪৭ বা ১৯৪৮। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত**: যুগান্তরের শিশুবিভাগে—ছোটদের পাততাড়িতে। বড়দের কবিতা প্রথম কোনটি এবং কোথায় ছাপা হয়েছিল—মনে নেই। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: যতদূর মনে পড়ে বক্তব্যের জন্য নজরুল এবং ছন্দের জন্য সত্যেন দত্ত দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলাম। উদ্বুদ্ধ করেছিল কিনা জানি না। শিশুসাহিত্যে সুকুমার রায়, অবন ঠাকুর। **প্রিয় বিদেশী কবি**: ব্রাউনিং এবং এলিয়ট। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: অসামান্য। কবিই হলেন অগ্রগতির প্রধান পুরোহিত। কবি ছাড়া আর কার এ উদাত্ত হাহাকার। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: কবিতার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক অগ্রগতির কোন প্রভাব হয় বলে মনে করি না। বরং কবিতাই সাংস্কৃতিক অগ্রগতির মূল কারণ। কবিতাই সাংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রাণ-কেন্দ্র। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত**: প্রিয় কঠিন প্রশ্ন। নিজের একটি লেখাকে প্রিয় বলে সনাক্ত করার মতো কঠিন কাজ আর হয় না। তথাপি সম্পাদকের নির্দেশে একাধিক প্রিয় কবিতার থেকে একটির নাম রাখলাম: 'দোকানে ঝুলন্ত মাংসটাকে দেখে দেখে'। ছাপা হয় ১৩৬৫ সালে। কলকাতার পথে ঘাটে এদৃশ্য দেখে দেখে অনুপ্রাণিত হই এবং কলকাতায় বসেই লিখি। ছাপা হয়েছিল 'উচ্চারণ'-এ। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: সর্বোচ্চে। সবার উপরে কবিতার স্থান। কয়েকটি চালু বৈষয়িক কাগজ কবিতা কম ছাপেন তার কারণ সম্পাদকেরা কবিদের ভয় করেন। বোতলের তলানি সাহিত্যকে প্রচারের জন্যই তারা ব্যস্ত। দেখুন না—একখানি চটি কবিতার বই একাডেমি পুরস্কার নিয়ে এলো। যে বইখানি কবিতাগ্রন্থের মধ্যে তেমন আহা মরি গোছের কোন গ্রন্থই নয়। অথচ থান ইঁটের মতো ভুরি ভুরি অন্য কোন বাংলা বই উক্ত প্রাইজ ছুঁতে পারলো না। কবিদের এখন বৃহস্পতি তুঙ্গে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভীত হবার কিছু নেই। আলোচনারও কোন প্রয়োজন নেই। এককথায় বলা যায়—ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: ঈশ্বরের সঙ্গে দু দন্ড (১৩৭১), স্বর্গের পুতুল (১৩৭৪)।

সম্পাদিত পত্রিকা ও প্রকাশ কাল: Poetry Bengali (Dec. 1967).

দোকানে ঝুলন্ত মাংসটাকে দেখে দেখে

প্রতিদিন পথের দুপাশে দোকানে দোকানে
ঝুলন্ত মাংসগুলি দেখে দেখে
বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত মুন্ড ঘোলাটে অমৃত চোখগুলি
ছুঁয়ে হাটতে হাটতে

মনে হয় : আমিও কখন ঝুলে পড়েছি ওখানে
যেন কারো অদৃষ্ট ঝুলছি;
মুনাফা ওজন হবে দাঁড়ির পাল্লায়।

উলংগ শরীরে
বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা সংস্কৃতি নিয়ে ঝুলে আছি;
রক্তহীন পাংশুটে শরীর, পাকানো শুকনো হাড়গুলি, তাই সই,
কেটে কেটে নিয়ে যাচ্ছে ওরা,
পচা লিভার, ফুসফুস, শুকনো নাড়ীভুঁড়িতে
লেপ্টে থাকা, বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষার ঘাস—
থলিতে থলিতে উঠে গেল,

ওদের দারুণ ক্ষুধা;
ঘরের দাওয়ায় ক্ষুধার্ত কুকুর পরিবার গোল হয়ে বসে
চিবোয় সংস্কৃত মাংস, সভ্যতার হাড়,
কস বেয়ে রক্ত গড়ায়
কার রক্ত,—জানলো না ওরা।

প্রতিদিন দোকানে ঝুলন্ত সভ্যতাকে দেখে দেখে
স্বপ্নের চাবুকে হত,
হাতে হেটে পা দুটো আকাশে তুলে
চলেছি নিয়ত।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

চল্লিশের কবিরা যখন মধ্যগগনে দীপ্যমান তখন বাংলাদেশের কিছু তরুণ তুর্কী গতানুগতিকতার ধ্যানধারণা ভেঙেচুরে কবিতায় প্রলয় জুড়ে দিলেন। এই তুর্কী কবিদলের নেতার নাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। প্লাটফর্ম ছিল কৃত্তিবাস। পঞ্চাশের অন্যতম পুরোধা এ কবি, কবিতায় একটি নতুন ধারার সংযোজন করেন। বাচনভঙ্গী কতো ঋজু ও ডেলিবারেট হতে পারে, সুস্পষ্টতর উদাহরণ তাঁর কবিতা। বিষাদ দুঃখ অভিমান সব কিছুর বুকের ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর ভোগী রাজকীয় কবি-মন। বিষয় এবং ফর্মে তিনি যে-কোন ধরনের নৈরাজ্যে বিশ্বাসী। ইদানীং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অনেকটা গদ্যে সরে এসেছেন, হয়তো সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন, তবু তাঁর অবচেতন কবি মন কবিতায় নতুন কিছু সংযোজনে নিয়তই উন্মুখ।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: আঁতুরঘর (ফরিদপুরে)। ১৯৩৪। ঠিকানা জানাতে চাই না। **জীবিকা:** একে কি আর বেঁচে থাকা বলে? **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** 'একটি চিঠি'। **প্রকাশ সন:** ১৯৫০। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:** 'দেশ'। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** রবীন্দ্রনাথ। **প্রিয় বিদেশী কবি:** শেক্সপীয়ার। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** ঠিক জানি না। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** ঐ। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:** এক এক সময় এক একটি কবিতা প্রিয় মনে হয়। আবার কখনো, নিজের সব কবিতাই অতি কাঁচা ও দুর্বল লাগে। এই মুহূর্তে আমার মনোভাব দ্বিতীয় প্রকার। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** বড্ড বেশী জায়গা জুড়ে আছে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** অন্ধকার।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: একা এবং কয়েকজন (১৯৫৭), বন্দী জেগে আছো (১৯৬৯), আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি (১৯৬৪), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭০)।
সম্পাদিত পত্র পত্রিকা: কৃত্তিবাস (১৯৫৩-৬৯)।
সংকলন: অন্যদেশের কবিতা (১৯৬৭)।

কেউ কথা রাখে নি

কেউ কথা রাখে নি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে নি
ছেলেবেলায় এক বোষ্টুমী তার আগমনী গান হঠাৎ থামিয়ে বলেছিল
শুক্লা দ্বাদশীর দিন অন্তরাটুকু শুনিয়ে যাবে।
তারপর কত চন্দ্রভুক অমাবস্যা চলে গেল কিন্তু সেই বোষ্টুমী
আর এলো না
পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায় আছি।

মামাবাড়ির মাঝি নাদের আলি বলেছিল, বড় হও, দাদাঠাকুর
তোমাকে আমি তিন প্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাবো
সেখানে পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর
খেলা করে!
নাদের আলি, আমি আর কত বড় হবো? আমার মাথা এই ঘরের ছাদ
ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর তুমি আমায়
তিন প্রহরের বিল দেখাবে?

একটাও রয়্যাল গুলি কিনতে পারি নি কখনো
লাঠি-লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে লস্করবাড়ির ছেলেরা
ভিখারীর মতন চৌধুরীদের গেটে দাঁড়িয়ে দেখেছি
ভিতরে রাশ-উৎসব
অবিরল রঙের ধারার মধ্যে সুবর্ণ কঙ্কণ পরা ফর্সা রমণীরা
কতরকম আমোদে হেসেছে
আমার দিকে তারা ফিরেও চায়নি!
বাবা আমার কাঁধ ছুঁয়ে বলেছিলেন, দেখিস, একদিন আমরাও...
বাবা এখন অন্ধ, আমাদের দেখা হয়নি কিছুই
সেই রয়্যাল গুলি, সেই লাঠি-লজেন্স, সেই রাশ-উৎসব
আমায় কেউ ফিরিয়ে দেবে না!

বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুণা বলেছিল,
যেদিন আমায় সত্যিকারের ভালোবাসবে
সেদিন আমার বুকেও এরকম আতরের গন্ধ হবে!
ভালোবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি
দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়
বিশ্বসংসার তন্নতন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮টা নীলপদ্ম
তবু কথা রাখেনি বরুণা, এখনো তার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ
এখনো সে যে কোনো নারী!
কেউ কথা রাখে নি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে না!

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ব্যক্তিজীবনে সম্পূর্ণ নাগরিক হয়েও দীর্ঘ ন'বছর ক'লকাতা থেকে সাড়ে তিনশো মাইল দূরে প্রত্যক্ষ কৃষক আন্দোলনের সংগে যুক্ত ছিলেন। কখনো কবিতায় সেই লড়াকু মেজাজ, কখনো তাঁর সামাজিক মন কাজ করেছে। বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ রূপ আবেগের তীব্রতায়, বেমালুম দেশী-বিদেশী শব্দের ঢালাও প্রয়োগ তাঁর কবিতায় অনিবার্যভাবে ধরা দিয়েছে। কবিতা গঠনরীতিতেও তাঁর পার্থক্য ধরা পড়ে।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: কলকাতা। ১৯৩৫। ১/১৯, গোপাল বসু লেন, কলকাতা-৫০। **জীবিকা:** বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক। সেইন্ট্ পল্স্ কলেজ, কলকাতা। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** ক্লান্তি। (বদলেয়রের 'লা স্প্লিন্' কবিতার অনুবাদ)। **প্রকাশ সন:** ১৯৫৪। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:** দেশ। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা। **প্রিয় বিদেশী কবি:** পোল ভালেরি। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** একটি যুগের সংস্কৃতিকে কবিই সবচেয়ে তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ করতে পারেন। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** 'তার'-এর ত-এর মাথায় চন্দ্রবিন্দু নেই ব'লে প্রশ্নটি অস্পষ্ট ঠেকছে। কবির কথা বলা হচ্ছে বলেই ধরে নিচ্ছি। কবিতা কোন অর্থেই যৌথ বা সমবায় ভিত্তিতে

রচিত হতে পারে না। কবি-পুরুষ যেখানে সফল বা সার্থক, সেখানে তাঁর সমসাময়িক বা পরবর্তীকালে সেই সার্থকতার কম্পন কমবেশি ব্যাপকভাবে অনুভূত হবেই। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায় রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:** ভাসান ভাসান সারাবেলা ১৯৬৭-তে জলপাইগুড়ি-তে লেখা। 'বাংলা কবিতা'-র দীর্ঘকবিতা সংকলনে প্রথম প্রকাশিত। পরে আমার কাব্যগ্রন্থ 'মধ্যরাত্র ছুঁতে আর সাত মাইল'-এ সংকলিত হয়। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** অসংখ্য যুবক-যুবতী কবিতা লিখেছেন। ফলে কবিতার পাঠক ও প্রসার দু-ই হচ্ছে। খুব বস্তুগত অর্থে বললাম, 'কবিতা' কতোখানি হচ্ছে—এই 'হওয়া'-র ব্যাপারটা আমি একদম বুঝি না। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** যা ছিল বা আছে. তাই হবে। বাঙলা সাহিত্যে চিরকালই কবিতা স্বরাট ও সম্রাট। বঙ্গ-সন্তানেরা কবিতা ছাড়া আর অন্যকিছু খুব একটা লিখতে পারেন না। এশিয়ার 'পারী' আমাদের বাঙলা!

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: সমুদ্র থেকে আকাশ (১৯৫৭), মৃত শিশুদের জন্য টফি (১৯৬৪), মধ্যরাত্র ছুঁতে আর সাত মাইল (১৯৬৭)।
সম্পাদিত কবিতা সংকলন: কবিতার পুরুষ (১৯৭০)।

ভাসান, ভাসান সারাবেলা

সাক্ষী থেকো মহানিম, বিরিঞ্চির পাতা,
সাক্ষী থেকো গো-শালার উদুখলে দাঁড়ানো যক্ষিণী,
কোমল গোলাপ-ছাপ টিনের তোরঙ্গ হাতে
ভাঙা আল-নাবালের পথে
কোনোদিন নেমে গেছি
কোনোদিন ফিরবো না ভেবে।
গাজনের মেলা ভেঙে
পথে দেখা হয়েছিল শ্মশান-চণ্ডাল,
তারই শুদ্ধতার দাবি—একমাত্র দাবি আছে তার
যে শাশ্বত নাভিকুণ্ড
ছাই ঘেঁটে আঙার উখ্‌রে আনে নির্ভুল আবেগে,
সে হঠাৎ সুরা-নীল চোখে
বলেছিল, 'কোথা ধাও',
সেই প্রশ্ন উত্তর-বিহীন
হেঁকে হেঁকে ফিরে আসে বাতাসে-পঞ্জরে,
সুষমার স্নিগ্ধ শবে—পাটভাঙা গরদে তসরে।

বনপথ ফুলে ফুলে ঢাকা কারা গিয়েছে মাড়িয়ে,
সেই পথে চোরা-জ্যোৎস্না আসে,
এসে, কিছুক্ষণ রয়ে, হলুদ গাই-এর তৃষ্ণা থেকে
পানার সরের মতো খুব চাপা, মন্থর আবেগে
ভীরু পায়ে চলে যায়—
পাছে কোনো ত্যক্ত দেবালয়
দক্ষিণা-প্রয়াসী হয়, চলে যায় মন্থর আবেগে।

যেন গ্রাম্য-বালিকার অনায়াস উলু দেয়া
জলে খই ভাসানোর অবাধ রীতিতে
সরলতা এসেছিল ভারী অকপট, সাবলীল,
সহাস্যে দেখিয়েছিল দুধের বলক দেয়া আধফোটা কুঁড়ি,
রেশমি কাঁচের চুড়ি—লাল নীল সুতোর আসন,
অর্থাৎ যা কিছু প্রিয়,—নয় গোপনতার সভ্যতা।

এখন এ মুখ দ্যাখো,
চুন-কালি মাখা দুই গাল
চোয়ালে দাড়ির রাজ্য—আমি অতি-নাটকীয় ক'রে
ভেজাতে তোমার চোখ
এ চেহারা ধরি নি ফেরারী;
আমার ভুবন ভরে
ঘৃতকুমারীর পাতা ভেসে চলে দক্ষিণ বাতাসে,
নেবুর সবুজ গন্ধ আসে,
হেমন্ত কম্পিত স্বরে কানে এসে বলে গেলে, 'চমৎকার রাত'
নীরব বকুল-বীথি আজো কেঁপে ওঠে ঝাউবনের আড়ালে,
তবু কোন ব্যাকুলতা রজনীগন্ধার ডাল তুলে
উঠেছে বুকের পাশে,
শন্ শন্ বহে গেছে ঘর-ভেদী-বিভীষণ হাওয়া
'তুমি কি প্রস্তুত'?

ভাসান, ভাসান সারাবেলা।
কখন গর্জন-তেল মাখা মুখে সমস্ত প্রতিমা
শোলার মুকুট খুলে ভেসে যায় গাঙুরের নীরে,
অলক্তে ফোটায় পদ্ম, সেই পদ্মে সুতাশঙ্খ সাপ
প্রবীণ খোলস ভেঙে উঠে আসে,

নষ্ট দড়ি-খড়ে

ঢেউ আনে অতলতা,

বারবার ডুবগলা তোলে ক্লান্ত চোখে

রবীন্দ্রনাথের সেই উপমা-বিখ্যাত রাজহাঁস,

কখন গর্জন-তেল মাখা মুখে ভেসে গেছে পাথর-প্রতিমা,

জল আঁতিপাঁতি চুঁরে

কি ক'রে ফেরাই তাকে—

ভাসান, ভাসান সারাবেলা।

বিনয় মজুমদার

বিনয় মজুমদার খুব বড় ইঞ্জিনীয়ার হলেও হতে পারতেন সেভাবেই ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু রক্তের মধ্যে ছিল তাঁর কবিতা। প্রচারবিমুখ পঞ্চাশের দুর্ধর্ষ কবি বিনয় মজুমদার ব্যক্তিগত জীবন অদ্ভুত। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কফি হাউস যাঁর ঘরবাড়ি। যিনি প্রথা ভেঙে বিনা পাসপোর্টে সীমান্ত পেরিয়ে পায়ে হেঁটে চলে গিয়ে ছ'মাস জেলে থেকে সর্বস্ব খুইয়ে আবার কফি হাউসে এসে নির্বিকারভাবে সিগ্রেট ধরান। অথচ কবিতা রচনার সময় তিনি অন্য এক জগতের মানুষ। সাম্প্রতিক কালে সং অর্থে শুদ্ধ কবিতার অন্যতম প্রতিনিধি বিনয় মজুমদার—গাছের কান্ড থেকে ডালপালা গজানোর মতো অনায়াস ভাবেই যন্ত্রণাময় কবিতা, যাঁর ভেতরের তাগিদে ফুটে ওঠে।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: থেডো (মান্দালয় জেলায়), ব্রহ্মদেশ। ১৯৩৪। ৪০/১এ, ব্রড স্ট্রীট, কলিকাতা-১৯। **জীবিকা:** কবিতা আঁকা ও ছবি লেখা। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** পাখি। **প্রকাশ সন:** ১৯৫৮। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:** 'সাহিত্যপত্র'। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** না। **প্রিয় বিদেশী কবি:** এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙ। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** কবিতা প্রকৃতপক্ষে জননীরাই লেখেন, পরে নামধাম যারই যুক্ত হোক। কবির ভূমিকা উক্ত জননীদের সহিত থাকা এবং পরস্পর তুরীয় একত্ব বজায় রাখা। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** সকল কবিতাই কবির জীবনী সুতরাং বোঝা যায় কবির ক্ষেত্রে কবিতার প্রভাব কি। আর যখন এক পদক্ষেপে মাত্র মর্ত্য থেকে স্বর্গে যেতে হয় সুতরাং কবিতাই স্বর্গ। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:** 'অঘ্রাণের অনুভূতিমালা-৪' ১৯৬৮ অক্টোবর। গোরাবাজার, কলকাতা। কৃত্তিবাস। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** কচি পাতা প্রথম প্রাতে কী কথা কয় আলোর সাথে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** স্বরই কবিতা। এই স্বর দেখে বোঝা যায় কবিতার ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল কিন্তু 'কথার চেয়েও বেশি আদেশের মতো রূপ দেয়াল জানালা কড়িকাঠ......এবং এখানে এই ভিতর বাহিরে দেখা হতে থাকে আত্রেয়ীর দেহের তোরণে'।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: গায়ত্রীকে (১৯৬১), ঈশ্বরী-র কবিতাবলী। নক্ষত্রের আলোয় (১৯৫৮), ফিরে এসো চাকা (প্রথম প্রকাশ), ফিরে এসো চাকা (নবসংস্করণ ১৯৬৯)।

স্বর্গে যাবার পথ

১৪ সব শেষে যেতে হয় নিরবধি সরলে বা ঘুরলেই দেখা যায় সে উদয়াচল
১৩ অর্থাৎ লিঙ্গের মতো পথ ধরে পথ পদতলে একে স্বর্গে যেতে হয়
১২ পিঙ্গল রয়েছে পায়ে বগলে বুকের 'পরে হাঁটুর ভাজে ও তলপেটে
১১ গদের সুরুতে আছে হ্রস্ব কিছু স্বরবর্ণ আত্রেয়ী তোমার
১০ গোল হয়ে রয়ে যাবে দুপায়ের মতো জোড়া তোমার ছবিতে আঁকা ঢাকা
৯ এইখানে বাস করি গদগদ হয়ে দুই কোনোদিন খুলবে না তবে
৮ তাহলে সকলি মুখ সুখ আনবার তরে যা আছে তা সকলি অজ্ঞান
৭ তবে আরো কিছু আছে দুধ বেরোবার ফাঁক অবিকল এতখানি সরু
৬ মুখ যদি ভেবে নিই অন্য মুখে আপনার দুপায়ের গম্ভীর বিধানে

৫ সামান্য আহ্বানমাত্র সরু এক ছিদ্র হয়ে রয়েছে মুখের মধ্যে তবে
৪ এইসব মিল পংক্তি শুধু বোঝা নয় আরো আরো শূন্য কে বলে তোমায়
৩ যদিও কোলের বলে স্পষ্টতই বোঝা যায় অন্তত আগ্নেয়ী বুঝে নিল
২ তোমার আংটিতে তবে আংটি বলে ভালো লাগে নিরাপদ মনে হতে থাকে
১ যদি একবার ঢোকে সত্য সত্য আমার এ কোলের আঙুল
০ তাহলে বললে জোড়া লেগে যেতে পারে ধনে এবং অর্বুদে

মানস রায়চৌধুরী

নিজেদের কাব্যকৃতি, কবিতার পেছনে কোনরূপ ঢাকঢোল বাজতে না থাকায় অনেক পঞ্চাশের কবি অন্তত কিছু সময়ের জন্যে খোলনলচে পাল্টে গগনবিদারী আওয়াজ তুলে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। এ ট্র্যাজেডী প্রত্যেক দশকেই ঘটে, মানস রায়চৌধুরীর সময়েও ঘটেছিল কিন্তু সৎ কবির মতো নিজের বিশ্বাসবোধের উপর গভীর আত্মপ্রত্যয় রেখে স্বধর্মচ্যুত হননি বলেই ওকে ভালো লাগে। এসব কবিকে এড়িয়ে যাওয়া সহজ কিন্তু পেরিয়ে যাওয়া সোজা নয়। ছন্দোবন্ধ চিত্রকল্প, সমাজচেতনায় তাঁর কবিতা চিহ্নিত।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: ভবানীপুর, কলকাতা। ১৯৩৫। ১৩৬-এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৫। **জীবিকা:** অধ্যাপক ও উপদেশক-

মনোবিদ। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা, প্রকাশ সন, কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:** ঠিক মনে নেই। ১৯৫১-৫২তে "শতভিষা" বা "পূর্বাশা"য় প্রকাশিত কোনো লেখা। কোনদিন এসব তথ্য কাজে লাগবে জানলে মনে রাখার চেষ্টা করতাম। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল?** নিশ্চয়ই। তবে একজন নয় নিশ্চয়ই। একাধিক নাম মনে আছে। বিষ্ণু দে...নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী... বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শেষোক্ত কবির প্রেরণার ছাপ আমার একেবারে প্রথমদিকের লেখায় খুঁজে পাওয়া যায়। আর প্রেরণাদাতা আমার অগ্রজ স্বর্গত ডঃ দিলীপ রায়চৌধুরী, যিনি কখনো নিজের নামে কবিতা ছাপাননি। **প্রিয় বিদেশী কবি:** কবির কোনো দেশ নেই। তবু ভিন্ন ভাষার কবির কথা উঠলে জর্মান কবি রাইনের মারিয়া রিলকে-র কথা ভাবি। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা— কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** ভূমিকা তো আছেই, যদি ধরে নেওয়া যায় কবিতা সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংগ। কিন্তু সে ভূমিকা এত জটিল ও ব্যাপক যে এই পরিসরে তা লিখে ফেলার ভাষা আমার কলমে নেই। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি— কবে, কোথায়, রচিত। কোথায় প্রকাশিত:** "১৯৬৬-সেপ্টেম্বরের দুটি স্তবক" —শিরোনামেই এর উত্তর। কলকাতায়, অগ্রজের আকস্মিক মৃত্যুর পর, শোক-তাড়িত এক সন্ধ্যায় অশ্রুপাতের বিকল্প এই রচনায়, আমি বহু ব্যক্তিক-স্মৃতিকে উদ্ধার করতে চেয়েছি। এর সামগ্রিক আবেদন সম্পর্কে আমি সংশয়ী আজো। প্রকাশ: শারদীয় গণবার্তা, ১৩৭৩॥ **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** খুবই উঁচুতে, এমন কথা প্রায়শই শুনে থাকি। কিন্তু সেই উচ্চতা-নিরূপণের জন্যে "সাহিত্য-বৈদ্য"দের কাছে যাওয়া দরকার। আমি এ বিষয়ে এখনো বিভ্রম আছি। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** গ্রহ-সংস্থান বিচার করা দরকার। রাশি-ই বা কি লগ্ন-ই বা কি আধুনিক কবিতার?

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: অনিদ্র গোলাপ (১৯৬২), আবহ সময় শিখা (১৯৭০)।

১৯৬৬—সেপ্টেম্বরের দুটি স্তবক

১. তুমি এতো তাড়াতাড়ি ছবি হয়ে যাবে কখনো ভাবিনি
আকাশ, শৈশব, দূর সুরভির অবক্ষয়ে ইন্দ্রিয়ের অননুভূতিতে
জেগে থাকবে এ-ও তো ভাবিনি
যেন স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে হঠাৎ তোমার ঘুম পাওয়া...
এতো নিদ্রালস কখনো তোমাকে আমি ভাবতে শিখিনি

একটা চাদর উড়িয়ে দিয়ে বাজিকর তুমি অতর্কিত
চরম উদাসী খেলা দেখালে আমাকে
মাঠ সরে যায় সামনে থেকে, জলে ডুবন্ত নৌকার হাল,
আর শব্দ হায়, হায়, হায়
এক মুহূর্তেই যেন রঙ্গমঞ্চে স্নায়ুর ধনুক ছিঁড়ে তোমার অন্তিম পরিহাস।

২. তোমার জন্যে এক মিনিটের নীরবতা
ভারি ভারি পাথর গড়ায়
বুকের মধ্যে একটি মিনিট
যেন সুদূর বীরভূমের মেলার উপর প্রাক্-বৈশাখ
বৃষ্টি আসার পূর্বাভাসে একটি মিনিট থমকে আছে
যেন আমার মাথার মধ্যে ক্রমাগতই বজ্রপাত
এক মিনিট, এক মিনিট তোমার জন্যে নীরবতা।
কপাল দিয়ে রক্ত চুঁয়োয়, শিরদাঁড়ায় বিদ্ধ ত্রিশূল
কত আণব মুহূর্তের সমন্বয়ে একটি মিনিট
তোমার জন্য হেঁটমুণ্ডে দাঁড়িয়ে আছি সভাস্থলে
হৃৎপিণ্ডে ষাটটি পাথর, এক মিনিটের নীরবতা।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অনায়াস-কথন ভঙ্গীমাটি লক্ষণীয়। খুব গভীর অথচ সংযত সূক্ষ্ম কারুকার্যে কবিতা খোদাই করতে পারেন। তীব্র উত্তেজনায় নয়, সন্ধ্যায় বিলীন তর্কহীন বিষাদের ব্যাপ্তিতে তাঁর কবিতা আচ্ছন্ন। জীবন সম্বন্ধে গভীর চেতনা, চিত্রকল্প, পরিমিতি বোধে তাঁর কবিতা সমৃদ্ধ। কবিতা থেকে অনেকখানি নাটকে চলে গেছেন, ফলে তাঁর সাম্প্রতিক কবিতায় বিষয় ও প্রকরণে নাটকীয় গুণগুলি বর্তমান। স্বল্পবাক, লাজুক এই কবি যখন কলম ধরেন তখন প্রতিটি কবিতাই হয়ে ওঠে স্বাতন্ত্র্যবোধে গভীর।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: বরিশাল। ১৯৩৫। ৫৫/৫, কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০। **জীবিকা:** অধ্যাপক, আনন্দমোহন কলেজ, কলিকাতা।

প্রথম প্রকাশিত কবিতা: আটবছর বয়সে, হাতে লেখা পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম--'ওরে ওরে দৈত্য'। প্রথম মুদ্রিত কবিতা—মধ্যবিত্ত (গদ্য কবিতা)। **প্রকাশ সন**: ১৯৪৮। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত**: 'প্রদীপ' (অধুনালুপ্ত ?)। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: কবিতা লেখার প্রথম জীবন? এককভাবে নাম করতে হ'লে 'জীবনানন্দ'। আসলে উদ্বুদ্ধ করেছিল জীবনানন্দ-সমকালীন কবিগোষ্ঠীর আধুনিক বোধের সামগ্রিক রহস্য এবং রচনা-শক্তির নবত্ব। **প্রিয় বিদেশী কবি**: র‍্যাঁবো। [যে কোন দিন মত বদলের স্বাধীনতা কিন্তু মেনে নেবেন এক্ষেত্রেও এককভাবে কারুর নাম জানতে চাওয়া অনেকটা জুলুম। তাই না?] **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ—দুরকম ভূমিকাই আমি স্বীকার করি। রুশো যতই চেঁচান কবিকে বাদ দিয়ে কিছুই হয় না। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: স্পর্শকাতরতা কবির অন্যতম চরিত্র। সবকিছুর প্রভাবই তার উপর পড়ে। কবি প্রভাবিত হন কবিতায় প্রভাব বিস্তারের জন্য। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায় রচিত, ও কোথায় প্রকাশিত**: শিকার কাহিনী/কবিতা সাপ্তাহিকী/প্রথম বর্ষ, ২য় সঙ্কলন, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৬৬ সাল। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: সম্মানিত সম্মুখভাগে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: গত কয়েক বছরের মধ্যে চমকে দেবার মতো কবি আসেননি। সমকালীন কবিরাও কেমন ক্লান্ত। এতো বর্তমান। ভবিষ্যতের কথা বলার অভ্যাস তেমন নেই। তবে কবিতা খুব বেশিক্ষণ ঘুমুতে পারে না, হৈচৈ করে জেগে উঠবেই।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: আষাঢ়ে শ্রাবণে (১৯৫৭), গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (১৯৬২), শবাধারে জ্যোৎস্না (১৯৬৬), অঙ্কন শিক্ষা (১৯৬৮)।

শিকার কাহিনী

হয়তো হাতের কাছে খুঁজে পাইনি একতারা অথবা খঞ্জনী
রাইফেল বন্দুক নিয়ে বিলে ঘুরছি ক'জন বৈরাগী।
বন্দুকের গুলি লেগে ছিটকে পড়ল নিরীহ হপার
বালিহাঁস থুবড়ে পড়ে বিপন্ন ডানায়...
রক্তপাত ঘটে যায় উদাসীন পদ্মার জোয়ারে।
আমরা চাইনি কেউ অমন সুন্দর স্নাইপ মরে যাক গোধূলি বেলায়
প্রণয়-নিরত ঘুঘু দম্পতির মৃত্যুও ভাবিনি
ভূলুণ্ঠিত হাঁসগুলি ভেবেছিল সাইবেরিয়া ফের চলে যাবে
ওদের মায়ের দুঃখ কোনকালে চাইনি কখনো।

হয়তো হাতের কাছে খুঁজে পাইনি একতারা অথবা খঞ্জনী
রাইফেল বন্দুক নিয়ে বিলে ঘুরছি ক'জন বৈরাগী।

প্রেমের মতোন সূর্য অতি লাল জ্বলে ওঠে বিদায়ের আগে—
বালিতে অদ্ভুত রঙ, জলে আরো ভয়ংকর মায়াবিনী আলো
বুকের ভিতর কেউ দপ্ করে জ্বলে ওঠে, হয়তো সবুজ;
সবুজ রঙের কোন রেশমের ফাঁস?
অসম্ভব শ্বাসকষ্টে কেঁপে ওঠে লক্ষাধিক হৃদয়ের হাঁস।

অশ্রুপাতের মতো অন্ধকার নেমে এলে ঘরে ফিরতে হবে—
কোনমতে দিনক্ষয় ঘটালেই হোল!
নিজেকে বলের মতো ছুঁড়ে দিয়ে ড্রপ খাচ্ছি শক্ত মাটিতে
কতক্ষণ এরকম ঘর্মপাতে খেলা চলে, কতক্ষণ দ্রুত
ধাবমান গাড়িদের পিঠে মূঢ় ছবির মতোন
এঁটে থেকে ভ্রমণের সুখ হয় গতিহীনতার,
কতক্ষণ আয়নার কাঁচে দোষ দিয়ে
নিজের মুখের দৃশ্য ভেবে যাব অভঙ্গুর, স্থির!
অথচ প্রভাতবেলা বেজেছিল রঙিন মাদল
আঁচলের থেকে চাঁদ উঠেছিল বুকের ভিতর।
নীরব আঙুল ছুঁয়ে ভ্রমণ সহজ ছিল ব্রহ্মাণ্ড অবধি
রঙিন সাইকেল ছিল, অলৌকিক চাকা
বহুবার চলে গেছে পূর্ণিমার চাঁদের ভিতর।
সহসা আঙুল থেকে উড়ে গেছে পুরনো বয়স
কোমল পায়ের থেকে খুলে গেছে রুপোলি নূপুর।
অন্য কারো জামা গায়ে পথে হাঁটছি একা
অন্য কারো চোখ যেন, অন্য কারো ব্যথা—
আমাকে কে বিক্রী ক'রে দিয়ে গেছে ঘুমের ভিতর।
চাঁদের ভিতর কারা ডাকবাক্স রেখে যায় রাতে
বহু চিঠি বিলি হোল পূর্ণিমার ভিড়ে।
চমৎকার নিদ্রাতুর ওরা সব হেঁটে যায় রঙিন বাড়িতে
হাততালি দিয়ে ভোরে ফুল ফোটে ওদের বাগানে।
আমাদের চিঠি নেই, বহুকাল চিঠি নেই কোন
সম্ভবত ডাকটিকিট খুন হয় চরিত্রের দোষে
খামের ভিতর থেকে সরে যায় গোলাপী বাতাস।

আমাদের মতো বহু রক্তপাতে ভিজে যায় পদ্মার বালিতে।
বন্দুকের গুলি লেগে ছিটকে পড়ে সরল হংপার
প্রণয়-নিরত ঘুঘু-দম্পতির মৃত্যুও ভাবিনি
আমরা চাইনি কেউ অমন সুন্দর স্নাইপ মরে থাকে গোধূলিবেলায়।
হয়তো হাতের কাছে খুঁজে পাইনি একতারা অথবা খঞ্জনী
রাইফেল বন্দুক নিয়ে বিলে ঘুরছি ক'জন বৈরাগী।

তারাপদ রায়

তারাপদ রায় যখন চলেন, ভাবেন, কথা বলেন, তখন আঙুল দেখিয়ে বলে দেওয়া যায় ওই যাচ্ছেন তারাপদ রায়। যিনি কবিতায় সিরিয়াস কথাবার্তাগুলো অত্যন্ত হালকা মেজাজে এবং হালকা ব্যাপার-স্যাপারগুলো অত্যন্ত সিরিয়াসভাবে বলতে পারেন। দৈনন্দিন দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, সর্বোপরি সমাজের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণায় গম্ভীর চলতি দেশী বিদেশী জগঝম্প শব্দের ঢালাও প্রয়োগে, স্যাটায়ারের কংক্রিট মিকশ্চারে তারাপদ রায় শক্ত বুনিয়াদ গড়ে তোলেন। তাঁর ব্যংগ-বিদ্রূপ চাবুকের মতো শপশপিয়ে ওঠে।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: টাংগাইল, পূর্বপাকিস্তান। ১৯৩৬। ১১।৪৯ পণ্ডিতিয়া রোড, কলকাতা-২৯। **জীবিকা:** সরকারি চাকুরি। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** ঠিক খেয়াল নেই। **প্রকাশ সন:** বোধ হয় ১৯৫৩ অথবা

১৯৫৪। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত**: মনে নেই। মফঃস্বলের কোন পত্রিকা সম্ভবত। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: তেমন একজন কেউ ছিল না। **প্রিয় বিদেশী কবি**: তেমন একজন কেউ নেই। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা, কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: প্রশ্ন দুটি বুঝতে পারছি না। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত**: স্বরচিত প্রায় সব কবিতাই প্রিয় কবিতা। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান, আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: জানি না।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: তোমার প্রতিমা (১৯৫৮), ছিলাম ভালোবাসার নীল পতাকা তলে স্বাধীন (১৯৬৮), কোথায় যাচ্ছেন তারাপদবাবু (১৯৭০)।
সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশ সন: পূর্বমেঘ। কয়েকজন (১৯৬৮)।

নিঝুমপুর

চলেছি নিঝুমপুর, নিঝুমপুর কোথায় কে জানে,
কে জানে?
তবু যেতে হবে, শালবন,
হয়তো ফুটেছে ফুল, শালফুল কখনো দেখিনি,
শালফুল হয়তো ফোটে না,
ফুটলেও যাবে না চেনা, কেন না এপথ
চলেছে নিঝুমপুর।
পথের পাশের শোভা, আকাশ বা পাখি
বাদাম গাছের নিচে বাদামি আঁধার
কিছুই দ্রষ্টব্য নয়।
নিঝুমপুর গ্রাম না নগর
কিছুই জানি না শুধু,
নিঝুম, নিঝুমপুর চলো, চলো, চলো।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
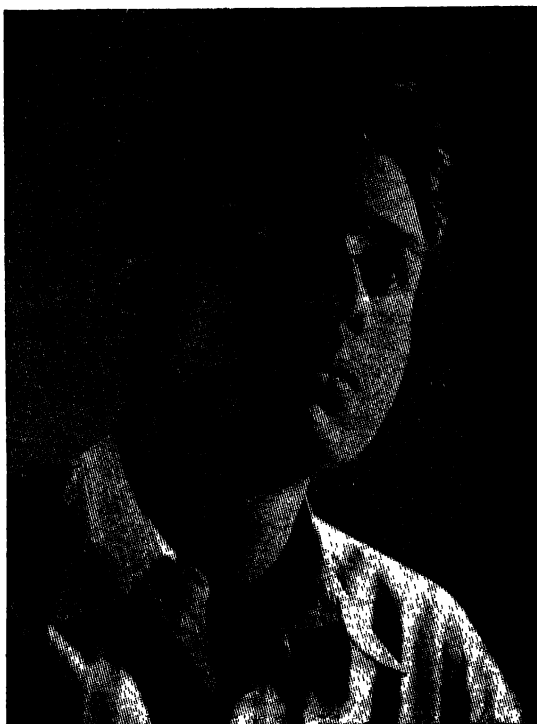
শব্দচয়ন, পরিণত দৃষ্টিভঙ্গী, ও চৈতন্যের ভূমির উপর নির্ভর করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা কবিতায় স্বীয় আসন যেমন অধিকার করে নিয়েছিলেন ঠিক তেমনিভাবেই নিজেকে ক্রমশই গুটিয়ে নিচ্ছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান কবিতার রবরবা বাজারে ইনি স্বতঃ-উচ্চারিত নাম না হলেও পঞ্চাশ-কবিকুলের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

জন্মস্থান; জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: দক্ষিণ কলিকাতা। ১৯৩৬। ৮০ গঙ্গা-পুরী, পূর্ব পুটিয়ারি, ২৪ পরগনা। **জীবিকা:** এখন চন্দননগর কলেজে শিক্ষকতা করি। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** প্রথম প্রকাশিত রচনা-কবিতা নয় গল্প। প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'ভোর'। **প্রকাশ সন:** বোধ করি ১৯৫৩ বা ৫৪। **কবিতাটি**

কোন পত্রিকায় মুদ্রিত: 'ময়ূখ'। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: প্রথম জীবনে একই সঙ্গে অনেকের কবিতা আমি মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। পুরণো কবিতার তখন আমি ছিলাম ভক্তপাঠক। আধুনিক কবিদের মধ্যে আমার প্রিয় কবি ছিলেন অনেকেই। কবিতা লিখতে গিয়ে অসচেতনভাবে হয়তো অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছিলাম—মোহিতলাল সুধীন্দ্রনাথ জীবনানন্দকে। **প্রিয় বিদেশী কবি**: আমি কোন বিদেশী ভাষাই এত ভালো করে জানি না যাতে সেই ভাষার কোন কবি আমার প্রিয় হয়ে উঠতে পারেন। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: এ নিয়ে কবিতা লেখকের কিছু বলা সাজে বলে আমার মনে হচ্ছে না। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: কবিতার ক্ষেত্রে 'তার' প্রভাব বলতে আপনি কার বোঝাতে চাইছেন বুঝতে পারলাম না। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত**: যিনি কবিতা লেখেন তিনিই জানেন কোন একটি কবিতাকে প্রিয় বলে বেছে নেওয়া কতখানি অসাধ্য। কোন একটি হাতে তুললেই তার ঐটি এবং অপর আরেকটির উজ্জ্বলতায় দিশেহারা হয়ে উঠতে হয়। নির্দেশ মান্য করে চোখ কান বুজে একটি নির্বাচন করে দিলাম।
এলিজি—'জয়শ্রী' জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০। **বাংলাসাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল। একথা প্রায় সর্ববাদি-সম্মত। এখন ভালো গদ্য বা ভালো গল্পের তুলনায় ভালো কবিতা অনেক বেশী এবং অনেক উজ্জ্বলতরভাবে লেখা হচ্ছে। এদিক থেকে আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ নিশ্চয় আশা করার মতো। কবিতার বাইরের বিক্রি তো দিনে দিনে আগের তুলনায় বাড়ছে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: এমন একদিন খুবই আসন্ন বলে মনে হচ্ছে যখন আধুনিক কবিরা অন্যকারণে নয় শুধু কবিতার খাতিরেই খুব মাননীয় সামাজিক আসন পর্যন্ত পাবেন, যদিও সামাজিক প্রতিপত্তির সুবিধার্থে কেউ কবিতা লেখেন এমন কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করছি।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: নীলাম্বরী (১৯৫৭), বৃষ্টির শব্দ ও অন্যান্য কবিতা (১৯৫৯), কবিতা (১৯৫৬-১৯৬১, ১৯৬২)।

এলিজি

ভেবো না তোমায় ভালোবাসিনি, তোমার
দুই স্তন ভরে সাক্ষ্য আছে।
—জানে প্রত্ন পদাবলি টুকিটাকি অর্থহীনতায় ভরা ঢাউস স্যুটকেস।

রাস্তায় রাস্তায় ক্ষয়ে আসে শীত—হঠাৎ-হঠাৎ
জেগে ওঠে স্ফূর্ত বন্‌ফায়ার।
সাঁওতালি পাড়াগাঁ ছেড়ে মহুয়া-ভারানো দু-পা নিয়ে
সন্ধ্যা পার হয়ে গেছি উদ্ভিন্ন মানুষীটির নিষুতিগভীর
বনদেশে,
তারও কাছে রয়ে গেছে কিছু সুখ
একখন্ড চাঁদিনী।

রাজ্ঞীর মতন রয় অন্ধকার—না পাওয়া ইচ্ছার
তীক্ষ্ম ক্ষণগুলি।
মাঝনদী-বরাবর নৌকোয় হঠাৎ নামে অকৃতার্থতার
প্রথম আষাঢ়।
সব লুট হয়ে গেছে, ভেজে শুধু নিরিন্দ্রিয় হতাশা অঝোরে।
খন্ড খন্ড স্বপ্নার্ত পল্লীর মধ্যে ছোট ছোট বাড়ি
এলোমেলো হয়ে যায়,
তোমার বিনানো চুল—
দেহগন্ধ—
নাভির গভীর শীতলতা -
স্বপ্নের ভিতর ছিঁড়েখুঁড়ে যায়।

শুধু থাকে হাওয়া-বদলের জন্যে দুধারি পাহাড়-ঘেরা
য়ুরেনিয়ামের খনি
চারদিকে দেহাত-জাদুগুভা,
সব শেষ হয়ে এলে গড়ে ওঠে
শব্দের নতুন টাউনশিপ।

সামসুল হক
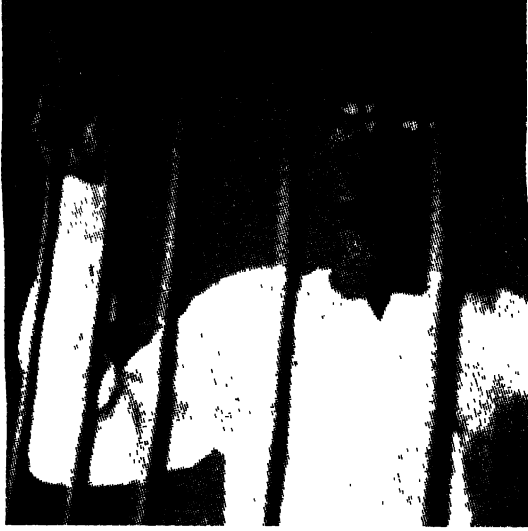
কবিতার প্রাণকেন্দ্র ক'লকাতা থেকে দূরে, এক এলাকা থেকে আরেক এলাকা করেও বাংলা কবিতা রচনায় একটু ভাটা পড়েনি সামসুল হকের। যেখানেই গেছেন সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার জোর হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন। কবিতার প্রতি তাঁর গভীর প্রীতি স্মরণযোগ্য। সামসুল মূলতঃ গীতিকবি। কথ্য-ভাষার ঢালাও ব্যবহারে তাঁর কবিতা উজ্জ্বল।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: একজন কবির জন্মস্থান জানানোর কোনো প্রয়োজন আছে মনে করি না, মায়ের হিসাব মতো বাংলা ১৩৪৩ সালের ১লা পৌষ। এখন কাকদ্বীপ, ২৪ পরগনা। **জীবিকা:** শিক্ষকতা, এবং নিজের লেখা বই (এবং নিজের খরচায় ছাপানো) অশোভনভাবে জোরজবরদস্তি করে পরিচিত ও অর্ধপরিচিতকে গছানো। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** 'একটি স্বপ্নের জন্য'। **প্রকাশ সন:** ১৯৫৫। 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকায় মুদ্রিত (ঐ বছর ঐ পত্রিকার কবিতা বিভাগের সম্পাদক ছিলুম; কাজেই, দেখা যাচ্ছে, কবিতাটি অন্য কোনো

সম্পাদকের কাছে নতজানু হয়নি, কিংবা বলা যায়, নিজের কবিতা ছাপতে নিজেকেই সম্পাদক হতে হয়েছিল—যেমন হতে হয় আর কি!) **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** কোনো বিশেষ কবি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেননি, বা আমিও সুযোগ পাইনি। তবে, এই কবিতাগুলো আমাকে আনন্দ দিতো, আবেগে কাঁপাতো: শৈশবে: 'ভোর হলো দোর খোল', কৈশোরে: 'কাজলা-দিদি, প্রথম যৌবনে: 'তোমাকে চাই আমি তোমাকে চাই': অরুণকুমার সরকার (কবিতাটির নাম মনে পড়ছে না)। **প্রিয় বিদেশী কবি:** সামান্য ইংরেজী ছাড়া কোনো বিদেশী ভাষা জানি না, আর ইংরেজীতে অনূদিত অন্যান্য ভাষার কবিতা পড়তে ভালা লাগে না। তাই, খুব বেশি বিদেশী কবিতা পড়ি নি, কাজেই, কোন বিদেশী কবি আমার সবচেয়ে প্রিয়—এ-প্রশ্নই ওঠে না। একান্তই যদি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তবে বলবো—চার্লি চ্যাপলিন, অবশ্য তাঁকে কবি বলে স্বীকার করতে আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** ধরুন, প্রশ্নটাকে আপনারা যদি এ-ভাবে রাখতেন: কবির বা কবিতার অগ্রগতিতে সংস্কৃতির ভূমিকা কি?—তাহলে যে উত্তর দেওয়া যেতো, একই উত্তর এ-ক্ষেতে দেওয়া চলে। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** এ-প্রশ্নটাকে আলাদাভাবে রাখার কোনো মানে হয় না। আগের প্রশ্নের উত্তরই এর উত্তর। **স্বরচিত আপনার প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:** ১৪ই মার্চ ১৯৭০। গড়ের মাঠে লিখেছিলুম। 'নহবৎ' পত্রিকায় প্রকাশিত। **বাংলাসাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** তিনটে উত্তর হতে পারে: ১। একেবারে উপরে, অর্থাৎ শীর্ষ-দেশে, ২। একেবারে নিচে, অর্থাৎ বাড়ির ড্রেন যেখানে রাখা হয়েছে, ৩। দোতলার ড্রইংরুমে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** ভবিষ্যৎদ্রষ্টারা বলতে পারেন।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: হৃদয়ের গন্ধ (১৯৬৪), নিজের বিপক্ষে (১৩৭১ পৌষ), প্রটোপ্লাজম (১৩৭৩ পৌষ), বিদেশী কবিতা (১৩৭৪ পৌষ), সময় (১৯৭০)। সম্পাদিত পত্রিকা ও প্রকাশ কাল: নক্ষত্রের রাত (১৩৬৭), পাক্ষিক বাংলা কবিতা (১৩৭৩), পোস্টকার্ড সংকলন (১৯৬৬), এ-ছাড়া আরো কয়েকটি পত্র-পত্রিকা সম্পাদন করতে হয়েছে।

গোটা দুই ঘটনা

.যেমন-তেমন ক'রে আমার দু'টো অভ্যাসের কথা লেখা যায়।
দু'টো অভ্যাস, মানে, দু'টো অসুখ। হয়তো দু'টো অসুখ
লেখা ঠিক নয়, একটাই অখণ্ড অসুখ। যদি অভ্যাসের
মানে অসুখ না-ধ'রে দুটোকে কার্য-কারণ-সম্পর্ক ধরা হয়,

তাহলে আবার সেই চলতি প্রশ্নটাই ওঠে : অভ্যাসের জন্যে অসুখ, না, অসুখের জন্যে অভ্যাস? বরং অভ্যাস শব্দটা পালটে 'ঘটনা' লেখা যাক।

১ নং ঘটনা

আমার ঘুমোবার ঘরে চার-পাঁচজন লোকের ছবি টাঙানো থাকে। ঐ চার-পাঁচটা লোককে আমার ভীষণ ভালো লাগে। যতোক্ষণ জেগে থাকি, তাদের উপর চোখ আটকে রাখি, ঘুমুলে তাদের সঙ্গে সারাক্ষণ কথা বলি। এ-ভাবেই তিরিশ বা প'য়ত্রিশ দিন কেটে যায়। মনে মনে কোনো কবিতার তিরিশ বা প'য়ত্রিশ লাইন লিখি। তারপর হঠাৎ একদিন ছবিটাকে নামাই, পিছনের কেঁটকি পেরেক মুচড়ে উঁচু করি, বোর্ড খুলে ফেলি, ছবি বের করে আনি—পাড়ার ছেলেদের বিলিয়ে দি, তারা খেলতে খেলতে ছিঁড়ে ফ্যালে। আমি নোতুন চার-পাঁচটা লোকের ছবি পুরোনো ফ্রেমগুলোর ভিতর আটকে ফেলি, দেয়ালেও পরপর সাজানো হয়ে যায়। তাদের ভীষণ ভালো লাগে, দেখি, কথা বলি, তিরিশ বা প'য়ত্রিশ দিন কাটে, কোনো কবিতার তিরিশ বা প'য়ত্রিশ লাইন লেখা হয়, তারপর হঠাৎ একদিন ছবিকটাকে নামাই। পুরোনো ফ্রেমে আবার নোতুন চার-পাঁচটা লোক, আবার তিরিশ বা প'য়ত্রিশ দিন। এ-ভাবেই তেত্রিশ বৎসর।

[কম্পোজিটার যদি কবিতা-প্রেমিক হন, এখানেই হয়তো কম্পোজ শেষ করতে চাইবেন; কিন্তু, তা হবার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য ডিগ্রির নিচে, সম্পাদকও শুনবেন না, কাজেই ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত বলতে হয়]

একবার কিছুদিনের জন্যে বাইরে না কোথায় যেন গিয়েছিলুম, কাজ থেকে পালাবার জন্যে অথবা কাজের খোঁজে। সর্বস্ব খুইয়ে, প্রায় ভিখারীর মতো, তারপর একদিন বাড়িতেই ফিরে এলুম। আমার স্ত্রীকে প্রথম-প্রথম চিনতেই পারি নি, কোনো কিশোরী দেবী ভেবে তাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলুম; আমার ছেলেটিকে প্রথম-প্রথম

চিনতেই পারি নি, কোনো বেজন্মা খচ্চর বাচ্চা-চাকর ভেবে ঘাড়ধাক্কা দিতে গিয়েছিলুম। তারপর সেই ঘুমোবার ঘরে যেতেই ঘটনাটার শেষ এসে পড়ে। ছেলেটি, সম্ভবত আমার ছেলেটি, সবকটা ছবির ফ্রেম থেকে সবকটা ছবি খুলে নিয়েছে, আর, প্রত্যেকটা ফ্রেমে আমার, সম্ভবত তার বাবার, ছবি আটকে দিয়েছে। প্রত্যেকটা ফ্রেমে আমার মুখ!

২ নং ঘটনা

কবিতার-মতো-পংক্তিতে-ভরা আমার গোটা চারেক বই আছে। অনেকের কাছে ব্যাপারটা সাধারণ ও স্বাভাবিক মনে হলেও আমার নিজের কাছে আশ্চর্য লাগে—বইগুলো আমারই লেখা! আসল রহস্য হলো, এ-গুলোর প্রতিটি শব্দ কয়েকরকম অভিধান থেকে চুরি করা। কেউ কোনো কবিতার পংক্তি চুরি করলে বাড়াবাড়ি রকমের চেঁচামেচি হয়, অথচ কয়েক হাজার অথবা কয়েক লক্ষ শব্দ চুরি করেও দিব্যি জেলখানার বাইরে আছি।
চুরি করা জিনিস ব'লে যেমন-তেমন খরচ বা ব্যবহার করা যায়, যেমন : বইগুলোর মলাট পালটাপালটি লাগিয়ে রাখি, ফলে, প্রেমবিষয়ক বইটির মলাট হয় রাজনৈতিক, রাজনৈতিক কবিতার বইটির মলাটটা প্রকৃতিবিষয়ক হয়ে যায়, ইত্যাদি। শ্রদ্ধেয় অর্থাৎ ঝানু রাজনীতিবিদকে উপহার দি প্রথমটি, দ্বিতীয়টি যায় বান্ধবীর বিবাহে, ইত্যাদি।

একবার কিছুদিনের জন্যে বাইরে না কোথায় যেন গিয়েছিলুম, কাজ থেকে পালাবার জন্যে অথবা কাজের খোঁজে। সর্বস্ব খুইয়ে, প্রায় ভিখারীর মতো, তারপর একদিন বাড়িতেই ফিরে এলুম।
একদিন এক বন্ধু অর্থাৎ কিছুটা পরিচিত ব্যক্তি কী একটা চাপা রহস্যময় কাজ সারতে আমার কাছে এলেন। আমিও সুযোগ বুঝে র‍্যাক থেকে একটা বই টেনে নিয়ে তাঁকে উপহার দিলুম, নাম-টাম না-লিখেই, কারণ, ওসব পছন্দ করি না; তিনিও অন্যমনস্কভাবে ঝোলায় পুরে ফেললেন।

কয়েকদিন পরে সেই বন্ধু অর্থাৎ কিছুটা পরিচিত ব্যক্তিটির কাছ থেকে এই চিঠিটা পেলুম : (অংশ)

> তোমার রসবোধ আমাকে চমকিত করিয়াছে। সুদৃশ্য মলাটের অভ্যন্তরে শ্বেতশুভ্র নিষ্কলঙ্ক চৌষট্টিটি পৃষ্ঠা আমাদের বাড়ির সকলকেই প্রভূত পরিমাণে হাসাইতে সক্ষম হইয়াছে। তুমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করিও।

চিঠিটা ঠিকমতো বুঝতে না পেরে র‍্যাক থেকে আরেকটা বই নামালুম। খুলে দেখি, ছাপার অক্ষরে একটা শব্দও নেই, শুধু কতকগুলো ঝকঝকে শাদা পাতা।

ছেলেটি, সম্ভবত আমার ছেলেটি, সবকটা বইয়ের মলাট থেকে সবকটা বই খুলে নিয়েছ, আর, প্রত্যেকটা মলাটের ভিতর মাপমতো শাদা কাগজ বাঁধিয়ে ঢুকিয়ে রেখেছে।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত
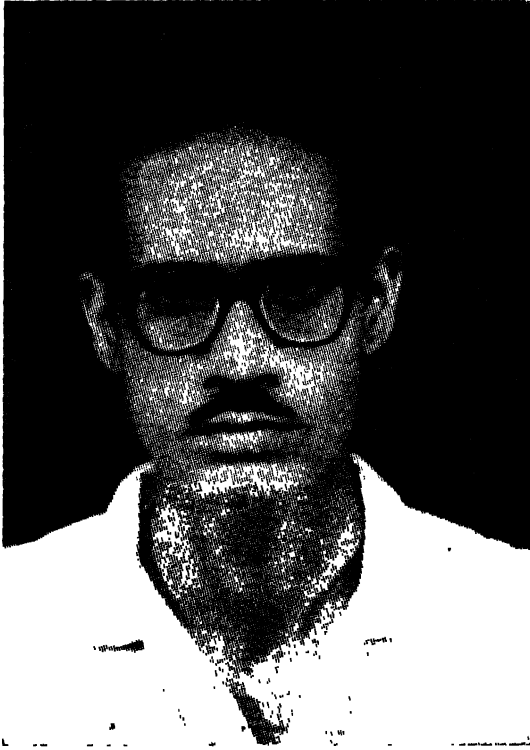
দীর্ঘকাল ধরে কবিতা রচনা, কাব্যপ্রসার সম্পর্কিত সৎ ভাবনা এবং কবিতার ক্ষেত্রে অটল মনোভাব নিয়েও তরুণ কবিকুলের মধ্যে অন্যতম উপেক্ষিত কবি মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত। অথচ গভীর লোকপ্রেম, নিবিড় বস্তুনিষ্ঠ লোকচেতনা, রোম্যান্টিক ভাবনায় ভাবিত এই কবির স্বচ্ছন্দ সরল ভঙ্গিমা দর্শনেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতায় বিধৃত হয়েছে বস্তুজগৎ এবং প্রত্যক্ষ জগৎ। মলয়শঙ্কর কবিতায় ছবি আঁকতে ভালবাসেন, যে ক্যানভাসে, ছবি আকাশ বাতাস ফুল এবং প্রেম স্বচ্ছন্দভাবে আসে।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৩৭। ৪/৪, রসা রোড সাউথ ফার্স্ট লেন, কলিকাতা-৩৩। জীবিকা: সাংবাদিকতা, লেখা ও

চিত্রকর্ম। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা**: মনে নেই। **প্রকাশ সন**: সম্ভবত ১৯৫০/বা আগে পরে কাছাকাছি সময়ে। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত**: মনে নেই। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: মধুসূদন/রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ। **প্রিয় বিদেশী কবি**: এলিয়ট/র‍্যাঁবো। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: 'হৃদয়ে হৃদয় যোগ করা'। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: নানাভাবেই অপরিসীম। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি: কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত**: অবচেতন মনে রাত্রের দূরপাল্লার ট্রেনে কবিতাটির আবির্ভাব। পরে, অন্যসময় ঝাড়গ্রামে বসে লেখা। প্রকাশিত হয় 'উত্তরসূরী' পত্রিকায়। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: গবেষকরা জানেন। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: চন্দ্রাভিযানের মতই দুরন্ত।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: পাখি জানে (১৯৬৪), নৈঃশব্দ্যের প্রতিধ্বনি (১৯৭০)।

সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশ কাল: আশুতোষ কলেজ পত্রিকা (১৯৫৭), ত্রৈমাসিক 'বাংলা কবিতা' পত্রিকা (যুগ্মভাবে) (১৯৬৪-৬৬)।

সেই ব্যথাটা মনে করুন

মনে করুন মধ্যরাতের ট্রেন চলেছে দ্রুততালে
দম নেওয়াটা হয়তো হবে একশো কি.মি.
মধ্যরাতের গতিরাগে দ্রিমি দ্রিমি
ট্রেন চলেছে দ্রুততালে মনে করুন

মনে করুন চুলগুলি তার উড়ছে ঝড়ে
পাশে বসা নিদ্রাতুরা সেই কিশোরীর
শরৎরাতের আলোর জোয়ার বিছায় শরীর
উথাল পাতাল ঢেউগুলি সব দিচ্ছে উঁকি
জানালা জুড়ে
আলোছায়ার কাটাকুটি আঁকিবুকি
কামরা জুড়ে

মনে করুন
একাই আপনি নিদ্রাবিহীন
দৃশ্যাবলী আলোর বেগে পালায় দ্রুত
পিছন পানে ছুঁড়ছে কেউ-বা অবিরত

সব মিলিয়ে কিছু একটা যাচ্ছে ঘটে
মনে করুন

রাতের গাড়ি দম নিয়েছে একশো কি. মি.
গতিরাগের ছন্দ বাজে দ্রিমি দ্রিমি
সেই ব্যথাটা বলতে চাইছে কী যে করি
মনে করুন সেই ব্যথাটা বুকের মধ্যে
কাকে এখন ডেকে বলি

শালের বনে জ্যোৎস্না এখন দিচ্ছে উঁকি
রাতের গাড়ি পৌঁছে যাবে পাহাড়তলি
সেই ব্যথাটা বলতে চাইছে কী যে করি
রাত্রি জুড়ে ঘুম নেমেছে, হায় কিশোরী

মনে করুন সেই ব্যথাটা বুকের মধ্যে

কাকে এখন ডেকে বলি
ডেকে বলি॥

আশিস সান্যাল

আশিস সান্যাল মূলতঃ প্রেমের কবি। প্রেমের রূপকল্পে কবিতাকে নৈসর্গিক চেতনায় চিত্রিত করায় তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। প্রেমচেতনা যখন ব্যক্তিগত সোপান পেরিয়ে এক শুদ্ধ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তখনইতো কবি রূপকার, সেখানেই শুদ্ধ কবিকর্ম প্রতিবিম্বিত হয়। তাই কবির জীবন-যন্ত্রণার বিশাল মরুভূমিতে কোথাও না কোথাও যখন একটা স্বপ্নের উদ্যান থাকে সেই উদ্যান ছুঁয়েই কবির অনুভূতিমালা বাঙ্ময় হয়।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: সুসং দুর্গাপুর, ময়মনসিংহ জেলা (পূর্ব পাকিস্থান)। ১৯৩৮ (৭ জানুয়ারী)। ৫৩, বিধানপল্লী, যাদবপুর, কলকাতা-৩২। **জীবিকা**: অধ্যাপনা। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা**: কোনদিন দেখা হলে (কলেজ

ম্যাগাজিনে)। **প্রকাশ সন:** ১৯৫৯। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:** চারুচন্দ্র কলেজ পত্রিকা। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** প্রথমে নজরুলের ও পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা। **আপনার সবচেয়ে প্রিয় বিদেশী কবি:** কীটস। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** কবিতা যেহেতু সাংস্কৃতিক আন্দোলনে একটি মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে, সুতরাং সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবি মুখ্য স্থান অধিকার করবে তাতে সন্দেহ নেই। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** কবিতাতে এর প্রভাব অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:** বন্ধু আমার উতল আকাশ। ১৯৭০ সালে 'অন্যদিন' (১ম সংখ্যা) পত্রিকায় প্রকাশিত। কবিতাটি রচিত হয়েছে কলকাতায়। আগের দিন গভীর রাত পর্যন্ত রেডিওতে চাঁদে মানুষের প্রথম পদার্পণের খবর শুনছিলাম। পরের দিন সকালে কবিতাটি রচিত। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। আমার ধারণা, কবিতাই বাংলা সাহিত্যকে এত বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** খুব উজ্জ্বল। কবিতাই মানুষকে বাঁচার সবচেয়ে মূল্যবান প্রেরণা দিবে।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: শেষ অন্ধকার ঃ প্রথম আলো (১৯৬১), মৃত্যুদিন জন্মদিন (১৯৬২), আজ বসন্ত (১৯৬৪), স্বপ্নের উদ্যান ছুঁয়ে (১৯৭০)।

সম্পাদিত সংকলন: সূর্যের প্রতিবেশী (নিগ্রো কবিতা-সম্পাদিত—১৯৬৫), ষাটের কবিতা ১৯৬৮)।

সম্পাদিত পত্রিকা: Bengali Literature প্রথম প্রকাশ—১৯৬৯। অন্যদিনে—প্রথম প্রকাশ —১৯৬৪ (যুগ্মভাবে)।

বন্ধু আমার উতল আকাশ

অনেক কিছু সেদিন তোমায় বলেছিলাম;
যেমন নদী চলতে চলতে ছলাৎ ডাকে,
বুকের মধ্যে সঞ্চারিত সমস্ত ভয়
ছড়িয়ে দিয়ে ভেবেছিলাম পথের বাঁকে

প্রতিধ্বনি উঠবে জ্বলে তাৎক্ষণিক—
বলবে হেঁকে: মেঘে মেঘে জোর তুফান;
চন্দ্রে-সূর্যে গ্রহে-গ্রহে তোমার শ্রমে
আন্দোলিত সবুজ বন, সোনার ধান।

অনেক কিছু সেদিন তোমায় বলেছিলাম;
উন্মোচিত পথের প্রেমিক রহস্যময়,
তোমার বুকের শঙ্করত নিপুণ গান
ছড়িয়ে দিলে সঞ্চারিত সমস্ত ভয়

ভেবেছিলাম দিক দিগন্ত তোমার নামে,
তুলবে ধ্বনি নির্ধারিত প্রতি বাঁকে,
অনেক কিছু সেদিন তোমায় বলেছিলাম,
যেমন নদী চলতে চলতে ছলাৎ ডাকে।

বন্ধু আমার উতল আকাশ শূন্যময়
ভেবেছিলাম শব্দ করলে জোর তুফান;
চন্দ্রে-সূর্যে গ্রহে-গ্রহে তোমার শ্রমে
আন্দোলিত সবুজ বন, তোমার ধান॥

তুষার রায়

তুষার রায় যেন হাতে বন্দুক নিয়ে কথা বলেন। হতাশা বিধৃত, বর্তমান সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে অনীহা এবং এক তীব্র বেপরোয়া ভংগীতে তিনি সোচ্চার। শব্দচয়নে তুষার ক্ষমতাবান, মেজাজে সাংবাদিকধর্মী। যে কোন ধরনের দেশী-বিদেশী বেমক্কা শব্দ বসিয়ে কবিতাকে চিত্রায়িত করার তুষারের ক্ষমতা আছে। যে কোন ধরনের ঘটনা তাঁর স্বরগ্রামে তাৎক্ষণিক প্রচণ্ডতায় সাড়া তোলে। সাম্প্রতিক তরুণতর কবিদের মধ্যে তুষার রায়ের ভাষা আলাদাভাবে কানে বাজে। তবে কবিতা-রচনা থেকেও কবিতা পাঠে তুষারের কৃতিত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী। স্ব-রচিত যে কোন ধরনের দুর্বল কবিতাও আকর্ষণীয় পরিবেশনে দর্শকের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: কাশীপুর, কলিকাতা-২। ১৯৩৮, ১৮ই ফাল্গুন, শুক্রবার। ৩০, রতনবাবু রোড, কলিকাতা-২। **জীবিকা**: কমার্শিয়াল আর্ট, ইন্টিরিয়র ডেকোরেশ্যন ও নানা বিষয়ে লেখা। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা**: "নাবিক" ও "ডিগ্রিয়া পাহাড়ের ছায়ায়"। **প্রকাশ সন**: ১৯৫২। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত**: 'নান্দীমুখ' বা অন্য একটি কাগজ---যার নাম ভুলে গেছি। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: কারো কবিতা নয় কিন্তু পড়তে ভালো লেগেছিল রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ এবং দিনেশ দাসের কবিতা, পরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের। **প্রিয় বিদেশী কবি**: ব্রাউনিং, অরিমিশো,

রিল্‌কে, র‍্যাঁবো এবং গীনসবার্গ এবং সাম্প্রতিকের রবার্ট ক্রিলি। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** কবিই তো সূত্রধার। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** ব্যাপ্ত, বিধ্বংসী ও বেমক্কা। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:** 'কবিতাই ক্রমশঃ' 'আনন্দবাজার' পুজো সংখ্যা। **বাংলাসাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** একেবারে শীর্ষে আবার একেবারে পশ্চাদ্দেশে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** আজকের জীবনের যদি কোনো ভবিষ্যত থাকে তবে কবিতারও আছে নয়তো নেই।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন· একটি—ব্যান্ড মাস্টার (১৯৬৯)।
পত্র-পত্রিকা সংকলন: ১৯৬৬ সালে সম্পাদিত সংকলন "সময়ানুপাতিক", কবিতা ত্রৈমাসিক। কৃত্তিবাস (সহযোগী সম্পাদক—১০৭০।

কবিতাই ক্রমশঃ

কবিতা লিখতে আজকাল, প্রথমাংশ থেকেই ভয়
কেননা প্রত্যেকটা লাইন পংক্তি আপনি ভাঙছে বিভাজনে
অনুঘটনও সমান তালে, শক্তির যেন শ্যাফট খুলে যাচ্ছে
কবিতা নিয়ে শেষপর্যন্ত ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে বিস্ফোরকের হাতল
যেন বোম বাঁধবার মতো খানিকটা
আকর্ণ আতা দাঁত বের করে রোমান্টিক হতে গেলে
দন্তপংক্তি ঝরে যাচ্ছে

নেশা জরাতে গেলেই কবিতা বুমেরাং যেন অস্ত্র, কিংবা
সোনা সাফ করতে এ্যাসিড, যেমন মারাত্মক ধোঁয়া বেরোয়
যেন দেহ ঘ্রাণ গান রক্তমাংস পুড়ে উঠছে ধোঁয়া এমন সিপিয়া রং ধোঁয়ার,
কবিতাই তখন গঙ্গার মতো সাফ করছে ফেঁশো পাঠকাঠি
ময়লা কালো ঝুল যতো
কবিতাই ক্রমশঃ গঙ্গার মতো তর্পণ করাচ্ছে তীরে, যখন
ডুব দিয়ে উঠলেই মনে হচ্ছে মন্দির দেখবো সামনে, কিন্তু
চোখ খুলতেই ঝলসে উঠলো ভেসে যাচ্ছে মড়ার পেটে কাক
এবং ড্রেজার ঝনঝন কাজ চলছে ভড় নৌকা খড়ের গাদায়
রন রন করছে রোদ,

আবার ডুবছি, ভয়ে ভাবছি, এবার মাথা ভাসালেই দেখতে পাবো
নিজের শরীর ভেসে যাচ্ছে, সোনা গলানো গঙ্গা যেন
এ্যাসিড হয়ে ফুটে উঠেছে
গাঢ় বাদামী বিষাদ ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে ব্রিজ।

রত্নেশ্বর হাজরা

পঞ্চাশের মাঝামাঝি থেকে লেখা সুরু করলেও ষাটের কবি হিসেবে রত্নেশ্বর পরিচিত। রত্নেশ্বর সংবেদনশীল কবি। শূন্যতা অন্ধকার তার কবিতায় সার্থকভাবে উচ্চারিত। গঠনরীতিতে তার কবিতা স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে চলেছে যার জন্যে রত্নেশ্বরের কবিতা পৃথক করা যায়। কবি তাঁর স্বপক্ষে বলেন—এই অনুভূতিমালার কাছে কখনো আমি বন্দী কখনো মুক্ত, কখনো জয়ী কখনো পরাজিত, এছাড়া আছে নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখা।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: পূর্ব-পাকিস্তানের বরিশাল জেলা। ১৯৩৬। কবীর রোড, কলকাতা। **জীবিকা:** চাকুরী। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:**

মন্বন্তর। **প্রকাশ সন**: ১৯৫৫/৫৬। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত**: 'অঙ্কুর'। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: না। **প্রিয় বিদেশী কবি**: সবচেয়ে প্রিয় বলে আমার কিছু নেই—কবিও না। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: অবশ্যই আছে, তবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকার ব্যাপারটা নির্ভর করে কবির মানসিকতার উপর। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সামাজিক অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল। কবি যত বেশি সমাজ ও রাজনীতি সচেতন তাঁর কবিতায় তত বেশি প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায় রচিত ও কোথায় প্রকাশিত**: 'সম্রাজ্ঞী'—১৯৬৮-র এপ্রিলে; কলকাতায়—২-এ, কবীর রোডের ছোট্ট একটা ঘরে। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৯-এর শারদীয় সংখ্যা 'এক্ষণ' পত্রিকায়। পরে 'গতকাল আজ এবং আমি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার পাশাপাশি। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে কিছু বলতে পারলেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব নয়।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: চারখানা। বিষণ্ণ ঋতু, লোকায়ত অলৌকিক, জলবায়ু, গতকাল আজ এবং আমি। (১৯৬২ থেকে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে)।
সম্পাদিত সংকলন, পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশ কাল 'দৈনিক কবিতা'র একটি সংখ্যা (১৯৭০)।

সম্রাজ্ঞী

পুতুল তোর ঘরে আছে কিংবা তুই-ই পুতুলের ঘরে
বলা মুস্কিল—
এটাও হতে পারে   ওটাও অসম্ভব না
যদি বলি: তোর মন উড়ছে
                    বেলুন স্থির
    কিংবা আকাশ বা সমুদ্র কোনোটাই নীল নয়
        তোর চোখের রঙই অমনি
তাহলেও বোধহয় ভুল হবে না।

মধ্যরাত্রে কে আগে জাগলো   তুই না বাঁশি
বুঝলাম না আজও
সময়মতো কার ঘুম ভাঙে
                    কে কাকে জাগায়—

তখনকার গন্ধটা বাতাবীলেবুর ফুল থেকেই এসেছিল
না বাতাসই ছিল ওরকম--
কেন চিৎকার করলি: হাওয়া বন্ধ ক'রে দাও
আমার অঙ্গ জ্বলছে!

পর্বতশৃঙ্গ দেখেই তোর বুক গড়ে উঠলো   বিশ্বাস করি না
বরং তোর বুক দেখেই পাথর ভেবেছিলো
অমনি হবো--
বলছি তো: সমুদ্র নয় আকাশও না
তোর চোখের রঙই অমনি
কিন্তু কে কাকে চেনায়
বলা মুস্কিল।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

বিশ্বাস এবং মানবিক মূল্যবোধ ক্রমশঃ অর্থহীন অরণ্যে পথ হারায়, এবং এই বাস্তব যুগ-যন্ত্রণার স্পষ্ট আদল কোন কোন তরুণ কবির চারপাশে ঘিরে থাকে কাঁটা লতার মতো, কবিকে বিক্ষত করে। পবিত্র মুখোপাধ্যায় তরুণতর কবিদের মধ্যে সেই নাম যার মধ্যে যুগ-যন্ত্রণা কাজ করেছে। পঞ্চাশের শেষের দিকে পবিত্রের আত্মপ্রকাশ। প্রথম দিকের কবিতায় প্রেম-ভাবনা, দুঃখবোধ এবং পরবর্তী সময় থেকে কবিতা দ্রুত পটপরিবর্তন করে বিক্ষত সংলাপে ধ্রুপদী আঙ্গিকে, নিষাদ, নিষ্ঠুরতা, সমাজের প্রতি তীব্র ঘৃণা যখনই ব্যক্তিগত সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে ব্যাপ্ত হয়েছে তখনই কবি দক্ষ চিত্রকরের সম্মান পেয়েছেন।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার আমতলী নামক দ্বীপবন্দরে। ১৯৪০। ২২বি, প্রতাপাদিত্য রোড, কলকাতা ২৬।

জীবিকা: অধ্যাপনা। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা**: 'বুদ্ধপ্রসংগে' নামক কবিতায় প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবত পরিচিত কাগজে প্রথম আত্মপ্রকাশ। **প্রকাশ সন**: সম্ভবত ১৯৫৮ সালের কোনো সময়ে। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত**: শতভিষা। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: প্রেমেন্দ্র মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গাঙ্গুলীর 'একা এবং কয়েকজন' খুব পড়তাম, মনে আছে, উদ্বুদ্ধ করেছিল কিনা জানি না। **প্রিয় বিদেশী কবি**: অনেকেই আমার প্রিয় কবি। বেশী ভালো লাগে বোদলেয়র, রিলকে, ব্লেক, শেলীকে। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: কবির ভূমিকা তাঁর কবিতা, সংস্কৃতি তাঁর কবিতার দ্বারা উপকৃত হলেও হতে পারে, সচেতনভাবে সংস্কৃতির উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে কবি কলম ধরেন না। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: কবিতার ক্ষেত্রে আমার প্রভাব প্রতিপত্তি তেমন নেই বলেই শুনেছি। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত**: সব কবিতাতেই আমার প্রকাশ, কোনো একটি বিশেষ কবিতার নাম করা খুবই কঠিন। 'জেনে গেছি বলে' অন্যতম প্রিয় কবিতা। আমার সব কবিতাই কলকাতায় রচিত, এটিও তাই। সময় ১৯৬৮, প্রকাশিত হয়েছে 'উত্তরসূরী'তে। **বাংলাসাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: গবেষণার বিষয়। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: গণৎকার বলতে পারেন। আমি গণৎকার নই।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: দর্পণে অনেক মুখ (১৯৬০), শবযাত্রা (১৯৬২), হেমন্তের সনেট (১৯৬৩), আগুনের বাসিন্দা (১৯৬৬), ইবলিশের আত্মদর্শন (১৯৬৯), অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সংক্রান্ত (১৯৭০)।

সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশ কাল: কবিপত্র (১৯৫৭)।

জেনে গেছি বলে

জেনে গেছি বলে কোনো দুঃখ নেই
দুঃখরোগ কবে সেরে গেছে
ঢেউয়ের চূড়ায় আমি ভাসমান ভুশুণ্ডী প্রবীণ
শেষতম অভিজ্ঞতা আমাদের ন্যুব্জদেহে
অস্থি ও মজ্জায় নার্ভতন্ত্রে মিশে আছে
উজ্জ্বল শতক কিংবা সুবর্ণ যুগের দূর বাতিঘর টাওয়ারের চূড়া
অবচেতনার স্তরে ফেলে রেখে কিরকম প্রবীণ হয়েছি
আজকের মানুষের প্রবীণতা
সময়েরই শেষ পরিণাম

জেনে গেছি বলে হ্রদ নিস্তরঙ্গ
আকাশের প্রতিশব্দ নিখিল শূন্যতা
জন্মের মুহূর্ত হতে পুড়ে যায় সর্বভুক সূর্যের শরীর
বিবর্ণ পুঁথির শব্দে অর্থহীন প্রতিশ্রুতি স্থির হয়ে আছে
আমাদের রক্তে কোনো
সেরকম প্রতিশ্রুতি নেই
আমাদের রক্তে নেই লোহিতকণিকা
মেরুদণ্ডে করোটিতে পাজরে বুকের হাড়ে কীটের সংসার
দিনেদিনে বাড়ে আর
বাগানের শিশুবৃক্ষ ক্রমশ হলুদ হয়ে যায়
কোথাও বসন্ত নেই
জেনে বাসা ভেঙে দিয়ে পাখিরা পালায়

জেনে গেলে বেড়ে যায় বয়সের ভার
অতিকায় অভিজ্ঞতা আমাদের নিয়ে চলে সমাপ্তিরেখার
খুব কাছাকাছি
ক্রমে ফুসফুসে তুষার ঢল
সমাধিভূমির রাত্রি ভারি হয়ে নামে
লাথি মেরে ভেঙে দিই লালনীল কাঁচের জানালা
যাদুদণ্ড ছুঁড়ে দিয়ে নির্বোধ শিশুর হাতে
বুকে কান পাতি
নদীর কোমল জল জলের গভীর উৎস উৎসের জলদ
খাঁ খাঁ করে
হু হু হাওয়া সমস্ত বৃক্ষের মাথা থেতলে ছুটে যায়
হস্তিনা পেছনে ফেলে ধৃতরাষ্ট্র চলে যায়
জেনে গেছে বলে

গণেশ বসু

প্রথম জীবনে অনেক বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েও নিয়মিত কাব্যচর্চা থেকে বিরত হননি গণেশ বসু। প্রথম জীবনে গভীর আন্তরিকতায় প্রেমভাবনা, পরবর্তী সময়ে অন্ধকার যন্ত্রণার বিক্ষত সংলাপ তার কাব্যাশ্রয়ী। অতি অল্পসময়ের মধ্যে তাঁর কবিতার পালাবদল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় যাঁদের ষাট বলে চিহ্নিত করা হয় গণেশ তাঁদের প্রথম সারির একজন।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: চাঁদসী, বরিশাল, পূর্ববাংলা। ১৯৪১। পি-৩৮৮, বাশদ্রোণী পার্ক, বাশদ্রোণী—২৪ পরগণা। **জীবিকা:** সাংবাদিকতা।

প্রথম প্রকাশিত কবিতা: মনে নেই। **প্রকাশ সন**: মনে নেই। সম্ভবত ১৯৫৩-৫৪'য় বেরোয়। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত**: দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ বিদ্যায়তনের মুখপত্রে। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: ঠিক কারো নাম বলতে পারবো না। অনেকের কবিতাই অনুপ্রাণিত করেছে হয়তো, সঙ্গে আশৈশব বন্ধু অনিল দে-র ভূমিকাও স্মরণীয়। সত্যিকথা বলতে অনেকটা চ্যালেঞ্জবোধ থেকেই কবিতা লিখতে সুরু করি। সে চ্যালেঞ্জ আসে আশপাশের বন্ধুদের থেকেই। আজো চলছে সেই চ্যালেঞ্জ, তবে অন্যদের সঙ্গে। **প্রিয় বিদেশী কবি**: সবচেয়ে কে প্রিয় বলতে পারবো না। প্রশ্নটাই গোলমেলে নয় কি? তবে প্রায় সব নিগ্রো কবিই প্রিয়, বিশেষ করে ল্যাংস্টন হিউজ। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা**: সামাজিক অগ্রগতির মাপকাঠি হল সংস্কৃতি। স্বাভাবিকভাবেই সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা আদৌ অনুল্লেখ্য হতে পারে না। মহৎ কবি মাত্রেই হলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। ঘুরিয়ে বলা যায় কবি হলেন এক শ্রেণীর গেরিলা যোদ্ধা। রণকৌশল তাঁর নিজের। মূল সেনাবাহিনী যেন রাজনীতিক ফ্রন্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রামী জনগণ। কবি সেই লড়াইয়ের আসল কথাটা জানেন জনগণের শরিক হয়েই, প্রয়োগ করেন অন্যভাবে। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: কবিতা হঠাৎ আবেগের ফেনায়িত উচ্ছ্বাস নয়। কবি-ব্যক্তিত্ব তাতে সক্রিয়। সমাজ তাই কাব্যে প্রতিফলিত। সামাজিক ঘাত প্রতিঘাত ও তার সারাৎসার কাব্যের উপকরণ। সোজাভাবে বলা যায়, কবিতা হচ্ছে রোজকার ঘটনার সবচেয়ে সক্রিয় এবং সম্ভবত অব্যর্থ শিল্প আঙ্গিক। ফলে যথার্থ কবিতায় বর্তমান শতকের ক্ষোভ-ক্রোধ-জিজ্ঞাসাকে যেমন, তেমনি আগামী দিনের প্রশ্নকে, সম্ভাবনাকেও মূর্ত হতে দেখা যায়। কবিতা হচ্ছে বিশ্বজনীন শিল্পেরই নান্দনিক ফসল। রৌদ্র হাতিয়ার। সুতরাং প্রভাব কত বা ব্যাপক হবে তা সহজেই অনুমেয়। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত**: একটি বিশেষ কবিতাকে 'প্রিয়' তিলক কেটে দেওয়া সম্ভব নয়। তবু সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে দু-একটি কবিতার নাম উল্লেখ করছি। এর জন্যে সম্পাদক মার্জনা করবেন আশা করি। 'সমুদ্রমহিষ'। সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬। বাঁশদ্রোণী। 'সীমান্ত'। **বাংলাসাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: আধুনিক (?) কবিতা বাংলাসাহিত্যে একই সঙ্গে সুয়োরানী আর দুয়োরানী। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ**: সমাজ, সভ্যতা, মানুষ থাকলে কবিতাও থাকবে।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: বনানী কবিতাগুচ্ছ (১৯৬৪), নিজের মুখোমুখি (১৯৬৭)। সমুদ্র মহিষ (১৯৬৯), রক্তের ভেতরে রৌদ্র (১৯৬৯), অধিকার রক্তের কবিতার (১৯৭০)।

সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা: সীমান্ত (১৯৭০) যুগ্মসম্পাদক।
সম্পাদিত সংকলন: এক বছরের কবিতা (১৯৬৬), লেনিনের যুগ|লেনিনকে নিবেদিত (১৯৬৯) যুগ্মভাবে।

সমুদ্রমহিষ

মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে শিরাফোলা সমুদ্রমহিষ
আমার ভেতর বুকে ফসফরাস,
রক্তে টান প্রবলতা, বিস্ফোরণ ঘটে যায় যেন
আকাশ পাতাল জুড়ে, চুল ছেঁড়ে, বাহুর পারদে
ভয়ংকর অস্থিরতা, বিধ্বস্ত চোয়াল।

তখন নিজেকে বড়ো অপরাধ, ছত্রীসেনা নেমে পড়ে কোন
পর্দার আড়ালে বুঝি সুবিধাদানের
ভূমিকায়, পরস্পর বিপ্রতীপ কোণে
সবচেনা মুখে তাই ধ্বংসের স্যাবার
ছুটে চলে, কেউ খোঁজে কংকালের কঠিন বিবর
বিমিশ্র হৃদয়ে শুধু অসহায় আর্তনাদে, আর
ঊর্ণাজাল উত্তরে দক্ষিণে

এখন রক্তের মধ্যে শ্বাস ফেলে দুরন্ত মহিষ।

রুদ্রেন্দু সরকার

"পেশা সাংবাদিকতা হলেও রুদ্রেন্দু সরকার মূলত কবি। তিনি কম লেখেন অথচ যখনই লেখেন তখন তাঁর কবিতায় বর্তমান সমাজের ছবি ভাবনার গভীরে গিয়ে প্রবেশ করে। এক সুস্থিরতা, যুক্তিনিষ্ঠ মন, অনবরুদ্ধ আবেগ তাঁর কবিতা চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশের বৈপ্লবিক পরিবর্তন তাঁর কবিতার মূল উপজীব্য। মানুষের বাঁচার ইচ্ছাকে যে রোম্যান্টিকতা জোরালো করে তোলে, চারপাশের জীবনের ঊর্ধ্বে যখন উত্তীর্ণ করে দেয়, কলুর বলদের মতো ঘাড়ে চাপা জোয়ালের বিরুদ্ধে যখন রুখে দাঁড়ানোর ইচ্ছা হয়, যাকে বলা যায় এ্যাক্টিভ রোম্যান্টিকতা, গোর্কি যার অন্য নাম দিয়েছিলেন বিপ্লবী রোম্যান্টিকতা, রুদ্রেন্দু সেই জাতের রোম্যান্টিকতায় বিশ্বাসী। তাই তাঁর কাব্যে ঋজু বক্তব্যে সোচ্চার হয় শ্রমজীবী মানুষের গান।"

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: ১০, শশীভূষণ চ্যাটার্জী লেন, গাণ্ডেরিয়া, ঢাকা। সন ১৩৪৯, ৬ই আশ্বিন, বুধবার। নর্থ স্টেশন রোড, আগরপাড়া, ২৪ পরগণা। **জীবিকা:** ফ্রী-ল্যান্স সাংবাদিকতা ও পুস্তক প্রকাশনা। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** দেয়াল পত্রিকা ও স্কুল ম্যাগাজিন বাদ দিলে প্রথম প্রকাশিত কবিতা "সাগর তীর্থ"। **প্রকাশ সন:** ১৯৬২। **কবিতাটি কোন্ পত্রিকাতে মুদ্রিত:**

"দৈনিক লোকসেবক" পত্রিকার রবিবারের পাতায়। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: বাল্যে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, গোলাম মোস্তাফা। পরে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্র, সুভাষ, সুকান্ত, দিনেশ সমর সেন প্রভৃতিরা এবং আরো অনেকেই। **প্রিয় বিদেশী কবি**: রোমান্টিক যুগের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স, কোলরিজ, ব্রাউনিং প্রভৃতি অনেকেই। পরবর্তী জীবনে রবার্ট ফ্রষ্ট, পাস্তেরনাক, মায়াকভস্কি, লাটিন আমেরিকার চিলির কবি নেরুদা প্রভৃতিরা। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি—কবে, কোথায় রচিত, কোথায় প্রকাশিত**: সবচেয়ে প্রিয় কবিতাটি এখনো লিখে উঠতে পারিনি। মোটামুটি প্রিয় যেটি সেটা এখনো ছাপা হয়নি। যা ছাপা হয়েছে তার মধ্যে "আলেকজান্ডার বিক্রী করে দাঁতের মাজন" কবিতাটি মন্দ লাগে না। আমার এক স্কুলের সহপাঠী বন্ধু ক্লাসে সব সময়ে ফার্স্ট হতো, সবকিছুতেই ও ছিল ক্লাসের সেরা। ওকে একদিন ট্রেনের কামরায় দাঁতের মাজন বিক্রী করতে দেখি এবং আমার কলেজের বন্ধুদের কয়েকজন এখনো কয়েকটি কারখানায় খুব সামান্য কাজ করছে অথচ ওদের স্বপ্ন কল্পনা ছিল অনেক। এই সমস্ত চিন্তা থেকেই ১৯৭০-এ আগড়পাড়ায় রাত্রিতে শুয়ে এই 'আলেকজান্ডার বিক্রী করে দাঁতের মাজন কবিতাটি লিখি। এটি "অমৃত" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ৩১শে জুলাই ১৯৭০-এ।

সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা: প্রথম সারিতে।

মানুষের মনোজগৎ গড়ে ওঠে সমাজের অভ্যন্তরে যে পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্বসমন্বয় প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে ও প্রকৃতির সাথে সামগ্রিকভাবে সমাজ-মনের যে প্রতিনিয়ত সংঘাত চলেছে তারই উপর ভিত্তি করে। মনোজগতের এই ক্রমবিকাশের ধারায় মননশীলতার সামগ্রিক এবং সুন্দরতম প্রকাশই হচ্ছে সংস্কৃতি। সাহিত্য, শিল্প, কাব্য এ সবই সংস্কৃতির বাহন। আবার এই সংস্কৃতি হচ্ছে একটা বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার superstructure, অর্থাৎ উপর কাঠামো "Art and Literature are the superstructure built on a definite economic basis of the society". তাই সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হলে তারsuperstructure ও স্বাভাবিক ভাবেই ক্রমে ক্রমে পাল্টে যায়—অর্থাৎ সংস্কৃতিও নতুন মোড় নেয়। তবে এই পরিবর্তনগুলো ঠিক যান্ত্রিক নিয়মে হয় না, হয় একটা স্বাভাবিক process এর মধ্য দিয়ে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা সবকিছুর সাথেই দেশের সংস্কৃতি related জড়িত। সংস্কৃতি কোন কল্পনাপ্রসূত স্বর্গলোক থেকে আমদানী করা সামগ্রী নয়। যারা সংস্কৃতিকে স্থানকালের ঊর্ধ্বে শাশ্বত বলে মনে করেন

তাঁদেরকে স্রেফ প্লেটনিক অর্থাৎ কাল্পনিক ভাববাদী অজ্ঞ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

আবার সংস্কৃতি যেহেতু সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার superstructure সেই জন্য অনেক প্রগতিবাদী মনে করেন, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। কিন্তু আমি মনে করি কোন ব্যবস্থারই পরিবর্তন সম্ভব নয় যদি সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরা ঠিক ঠিক ভাবে সমাজব্যবস্থা উপলব্ধি করে উন্নততর সমাজ বিকাশের পথ নির্দেশ না করেন। কবি একজন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এখানে তাঁর কর্তব্য ও ভূমিকা তাই রাজনৈতিক কর্মীর মতই; বেশী ছাড়া কম নয়।

ইতিহাসের সমস্ত বিপ্লব অনুধাবন করলে দেখতে পাওয়া যায়—কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিকদের চিন্তা এবং ভূমিকা তৎকালে সমাজ প্রগতির পরিপূরক হয়ে সমস্ত বিপ্লবকে কিভাবে নেতৃত্ব দিয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুলের ভূমিকাও সমাজ অগ্রগতিতে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে কম নেতৃত্ব দেয়নি। কিন্তু পরবর্তী যুগে কিছু কবি ও সাহিত্যিক শতচেষ্টা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল যে সংস্কৃতির ঝাণ্ডাটা প্রাণপণ চেষ্টা করে খাড়া করেছিলেন তা আশানুরূপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হননি।

এদেশে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে দেশব্যাপী যে নবজাগরণের জোয়ার এসেছিল —যে মানবতাবাদী বিপ্লব সুরু হয়েছিল তা উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোষমুখী সংস্কারপন্থী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছিল, যার ফলে আমরা তার সুফল লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। ভারতবর্ষে মানবতাবাদী বিপ্লব অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। সেই মানবতাবাদী বিপ্লব সম্পূর্ণ করার জন্যে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীর ভূমিকার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে লেনিনের একটা কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে "Cultural revolution precedes technical revolution". তথাকথিত সমাজতন্ত্রীরা ও সাম্যবাদের ধ্বজাধারীরা এই সাংস্কৃতিক দিকটার কথা একবারও ভেবে দেখেননি। সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে মানুষের মননশীলতায় তাঁরা কতটা বিপ্লবী-চিন্তা ধরাতে পেরেছেন সেটাও ভেবে দেখেননি। সাধারণ মানুষকে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, বর্ণবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষের হাত থেকে আজ কতটা মুক্ত করা গেছে? আমার বক্তব্য রাজনৈতিক কর্মীদের উদ্দেশ্যে নয়, আমার বক্তব্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী সকলের উদ্দেশ্যে। তাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে সমাজ চিন্তা, দুঃখ জ্বালাযন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির আকৃতি যেন ভাষায় রূপ

পায়—যেন সংগ্রামের ইশারা পায়। কবি যদি যথার্থভাবে তাঁর লেখার মাধ্যমে জনসাধারণকে সকল প্রকার শোষণের হাত থেকে মুক্তি-সংগ্রামের প্রেরণা জোগাতে পারেন, উৎসাহ জোগাতে পারেন, পথনির্দেশ করতে পারেন— If he feels the burn of the mass struggle তবেই সে তাঁর যথার্থ ভূমিকা পালন করেছেন বলে মনে করবো। পাঠক তাঁকে জনগণের কবি বলে মনে করবে। নইলে তাঁর একমাত্র আশ্রয় হবে ড্রয়িংরুমের ফুলদানিতে সাজানো ছিন্নমূল একগুচ্ছ রজনীগন্ধার মত চার দেয়ালের খপ্পরে—কিছু ইন্টেলেকচুয়েলদের চায়ের টেবিলই হবে তাঁর একমাত্র আস্তানা। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব**: উপরের অংশেই এই প্রশ্নের আলোচনা করেছি। তবে এর উপসংহারে বলা যায় সমাজ, মানুষ, মানুষের জীবন সম্পর্কে কবির উপলব্ধি স্বচ্ছ এবং গভীর হলে কবির কবিতাও হবে 'concrete and precise' তাহলে তা স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যাবে সংগ্রামী মানুষের জীবনের সহযাত্রী, নিত্যনতুন মানবজীবনের ক্রমবিকাশে মননশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ইঞ্জিন।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান: এখানে আধুনিক কবিতা বলতে সাম্প্রতিক কবিতা বোঝায় না। নতুন নতুন কিছু শব্দ ব্যবহার করলেই কবিতা আধুনিক হয় না, বা আগে কেউ যা লেখেনি তাই লিখলাম অমনি কবিতা আধুনিক হয়ে গেল, তা-ও না। নতুন শব্দ, নতুন কিছু ভাব, বা নতুন একটা কিছু লিখলে, সেটা নতুন একটা কিছু হয় বটে তবে আধুনিক হয় না।

অলঙ্কার শাস্ত্রের বাঁধা ছক অতিক্রম করে বাংলা কবিতা নতুনভাবে মোড় নেবার সময় থেকেই বাংলা কবিতায় কতকগুলো নতুন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কবিতার জন্মদশা থেকে যে ভাববাদী কল্পনা এবং রোমান্টিসিজম মানবতাবাদী ভাবধারার দিকে এগিয়ে চলছিল—এক সময়ে দেখা গেল personification of social thinking এর ফলে কবিতা অনেকটা realistic হয়ে উঠছে—ভাববাদী জগৎ ছেড়ে বস্তুবাদী জগতে প্রবেশ করছে– কবিতা সংগ্রামী মানুষের সহযাত্রী হয়ে যাচ্ছে। আধুনিক সমাজচিন্তার মত কবিতার ক্ষেত্রেও তখন আধুনিকতা এল। এই যুগের যুগযন্ত্রণা, দুঃখ, জ্বালা কবিতার মধ্যে উঁকি দিতে লাগল। পূর্বের মত কবিতা কেবল মনোজগতের বিলাসের সামগ্রীই রইল না। কবিতা হয়ে উঠল মানুষের দুঃখ, বেদনা, জ্বালা, যন্ত্রণা ও সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি—কবিতা হয়ে উঠল আধুনিক। সামাজিক বিপ্লবের বিভিন্ন স্তরে সংগ্রামী মানুষের সহযাত্রী কবিতা সব সময়ই আধুনিক।

কিছুকাল থেকে শুনতে পাচ্ছি তাকেই আধুনিক কবিতা বলা হয় যার প্রকাশ ঘটেছিল রবীন্দ্রযুগের শেষপ্রান্তে, ধনতান্ত্রিক ইউরোপের মৃত্যুমুখী

সংস্কৃতির হাত ধরে যে এসে ভীড় করেছিল বাংলা কাব্যে। কিন্তু সমাজবিবর্তনের ধারায় ধনতন্ত্র আজ আধুনিক নয়। আজ তার অন্তিমদশা। আধুনিকতা হল আজ সেই মানসিকতা যা সমাজতন্ত্রকে স্বীকার ক'রে প্রকাশ করে সমাজতান্ত্রিক চেতনা এবং ধনতন্ত্রের অনিবার্য মৃত্যু।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে এই আধুনিক কবিতার স্থান নির্ণয় করা এক দুরূহ কাজ। কারণ সাহিত্যের সব শাখাই স্ব স্ব শ্রেষ্ঠত্বের দাবী ছাড়বে না। এখন বিচারের মাপকাঠি কি হবে সেটাই আলোচনার বিষয়। বিচারের মাপকাঠি যদি জনপ্রিয়তাকে (পাঠকের কাছে) ধরা যায় তবে নিঃসন্দেহে বলব—বর্তমান আধুনিক কবিতার স্থান সাহিত্যের সব শাখারই নীচে। খুব দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয় অবসর সময়ে পাঠকেরা তৃতীয় শ্রেণীর গোয়েন্দা গল্পও পড়ে থাকেন তথাপি আধুনিক কবিতা পড়েন না। আধুনিক কবিতার বই বিক্রি হয় না যে তা নয়। বিক্রি হয়, তবে যিনি উপহারের জন্য বই কেনেন এবং যিনি উপহার হিসাবে বই পান উভয়ের কেউ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বইটি একবার ভুলেও পড়ে দেখেন না। বইটির স্থান হয় শো-কেসে সাজানো বইয়ের মধ্যে। দু-চারটে আধুনিক কবির নাম আর তাঁর বই-এর নামটুকু করতে পারলেই মোটামুটিভাবে ইন্টেলেকচুয়েল আলোচনায় অংশগ্রহণ করা যায়। একজন কবিতাপ্রিয় পাঠক হিসাবে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই যা দেখেছি যা দেখছি তাই লিখলুম।

অথচ আধুনিক কবিরাই হাল আমলের দেশবিদেশের সাহিত্যের খবরাখবর রাখেন সবচেয়ে বেশী। বিশ্বসাহিত্যের দরবারে একমাত্র এদেশের আধুনিক কবিরাই তাঁদের লেখা নিয়ে বুক ফুলিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার প্রতিনিধিদের উষ্ণীষ সেখানে পৌঁছুতে পারে না। অন্যান্য দেশের সাহিত্যের যে মান সেই তুলনায় বাংলা সাহিত্যের আর সব শাখার মান অত্যন্ত নীচে। কিছু ছোটগল্প ও কিছু একাঙ্ক নাটক বাদ দিলে সাহিত্যের আর সব শাখার standard এখনো আন্তর্জাতিক সাহিত্য বিচারে আলোচনা হবার উপযুক্ত নয়।

এখন আধুনিক বাংলা কবিতা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উন্নত কবিতা সাহিত্যের তুলনায় সমমানের হয়েও তার নিজের দেশে কেন আদৃত নয় সেটাই ভাবার বিষয়।

আমার মনে হয় আধুনিক কবিরা দেশের বর্তমান তীব্র শ্রেণীসংগ্রামকে অস্বীকার করে অথবা ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পেরে জনগণের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে চলবার চেষ্টা করছেন; কেবল

নিজেদের ব্যক্তিগত জ্বালা, যন্ত্রণা, হতাশার ব্যথাতেই ভুগছেন। ফলে তাঁর কর্ম ও তার সাথে সাথে চিন্তাগুলোও হয়ে পড়ছে self-centred । লেখার মধ্যেও ফুটে উঠছে তাঁর চিন্তারই চিত্রকল্প। প্রাচীন ধর্মীয় বোধ মন থেকে অনেক আগেই চলে গিয়েছে। মানবতাবাদী ভাবধারার যুগও এটা নয়। ফলে মানবতা-বাদী ভাবধারা মনকে ধরে রাখতে পারছে না। কবি নতুন যুগের পদধ্বনি শুনতে পেয়েও নতুন সংস্কৃতির রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না। পুরানো ধ্যানধারণা চলে গেল অথচ নতুন সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা আসছে না। মনোজগতে এই যে vacuum সৃষ্টি হল, এরই পরিপ্রেক্ষিতে এলোপাথারি টুকরো টুকরো চিন্তা মনোজগৎ দিয়েই কবিতার মধ্যে ঢুকে পড়ল—কবিতা হয়ে উঠতে লাগল দুর্বোধ্য এবং খুব চিন্তা করে বুদ্ধি খাটিয়ে বোঝার জিনিস। পরিশ্রান্ত পাঠকেরাও তাই দিন দিন দূরে সরে যেতে লাগল।

সংগ্রামী জনসাধারণ নিজেরা শোষণের ফলস্বরূপ ব্যথাবেদনায় জর্জরিত হলেও সংগ্রামবিমুখ নয়। তাঁরা চাইছেন সংগ্রামী হাতিয়ার। কবিতার মধ্যে সেই রকম মনের সামগ্রী না পাওয়ায় অথবা ভাব ও ভাষার অত্যন্ত দুর্বোধ্যতার দরুন —যাই হোক, সংগ্রামী জনসাধারণ তা গ্রহণ করতে পারছেন না। এখনকার কবিতা তাই তাঁদের কাছে গ্রহণীয় হচ্ছে না।

কবিরা যদি বাস্তব স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজকে দেখতেন, যদি মানুষের মনের গভীরে অনুপ্রবেশ করতে পারতেন, তবে তাঁদের প্রকাশও হতো concrete and precise, সহজ ও প্রাঞ্জল। "Every realisation has its manifestation". Realisation ও হচ্ছে না তাই ঠিকমত manifestation ও দেখতে পাচ্ছি না। পাঠকরা স্বাভাবিকভাবেই কবিদের গ্রহণ করতে পারছেন না। কবিও যার ফলে তাঁর একান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধেই জনসাধারণের কাছ থেকে ক্রমে ক্রমে সরে গিয়ে হয়ে পড়ছেন egocentric এবং self-centred । কেবল কফি হাউসে এবং ড্রইংরুমে নিজেদের একটা ইন্টেলেকচুয়েল পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তার মধ্যেই আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন। অথচ এরই পাশাপাশি দেখা যায় আর এক দেশের কবিরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে রাইফেল চালাচ্ছেন। প্রতিটি সংগ্রামী মানুষের সুখদুঃখের অংশীদার হয়ে নতুনভাবে জীবনকে উপলব্ধি করছেন—তাঁরা শস্যক্ষেত্রে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে একই জীবনকে দেখছেন—তাঁরা জীবনদ্রষ্টা তাই রসস্রষ্টা।

আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ: আধুনিক কবিরা যদি ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের কাছ থেকে সরে যেতে থাকেন, যদি তাঁদের জীবন-যন্ত্রণাকে উপলব্ধি না করে, শ্রেণীসংগ্রামকে তত্ত্বকথা মনে করে, রাজনীতি মনে করে, মুখ ফিরিয়ে চলে যান

—If they do not feel the burn of the mass struggle তবে বলব আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকার।

এমনিতেই বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধ্যান ধারণা কল্পনারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। চিন্তার অনেক কুয়াসাই এখন আর কুয়াসা নয়। আমরা সাহিত্য পড়ি কেন, পড়তে আনন্দ পাই তাই পড়ি। আমরা আমাদের নায়িকাকে যেভাবে কল্পনা করি বাস্তবে আমরা তাকে সেইভাবে পাই না। আমার নায়িকা এইভাবে রাগ করবে—এইভাবে অভিমান করবে, আবার এইভাবে অভিমান ভেঙে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে,,এইভাবে,,এই ভাষায় কথা বলবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় আমার বাস্তব নায়িকা আমার কল্পনার ধারকাছ দিয়েও মাড়ায় না—আমার কল্পনার নায়িকার পুরো antithesis। তাই আমার কল্পনার নায়িকাকে খুঁজতে হয় অন্যত্র। পড়তে হয় বিরহের কাব্য, বিচ্ছেদের উপন্যাস, ট্রাজেডির নাটক। হয়তো তার মধ্যেই কোথাও খুঁজে পাই আমাদের কল্পনার নায়িকাকে।

কিন্তু সামাজিক বহু স্তর অতিক্রম করে মানুষ যখন একদিন এক নতুন সমাজব্যবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়বে প্রকৃত আন্তর্জাতিকতায়—State যখন wither away হয়ে যাবে—সুন্দর কল্পনাময় জীবন যখন বাস্তবে নেমে আসবে—প্রকৃতির সমস্ত রহস্য যখন তার আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসবে—কল্পনার নায়িকা যখন বাস্তবের নায়িকা হয়ে দেখা দেবে—সমস্ত দুঃখের যেদিন অবসান হবে—সেদিন এখনকার এই উপন্যাস, সাহিত্য, কবিতা আমাদের কতখানি আনন্দ দিতে পারবে, বলতে পারেন? মানুষ সেদিন স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যের জগৎ ছেড়ে বাস্তব জীবনের প্রতি বেশী আগ্রহ বোধ করবে। তখন সব রকম কল্পনার রাজত্ব ছেড়ে সব মানুষই নেমে পড়বে বিজ্ঞানের চর্চায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মহা-প্রকৃতিকে বাস্তবে কতখানি উপভোগ করা যায় সেটাই হবে সেদিনের সব মানুষের প্রচেষ্টা। এখনকার এই ফর্মের সাহিত্য আর তখন থাকবে না। সাহিত্যও হয়ে যাবে তখন বিজ্ঞানধর্মী। মানুষের সমস্ত perceptual knowledge তখন conceptual knowledge-এ transfer হয়ে গিয়ে সাহিত্য হয়ে যাবে concrete and precise।

সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশ সন: উদয়ন (১৯৬৮), (যুগ্মভাবে)।
সম্পাদিত সংকলন ও প্রকাশ কাল: নেহরু সংকলন—অনির্বাণ (১৯৬৫)।

আলেকজান্ডার বিক্রী করে দাঁতের মাজন

থাক সমস্ত আকাশ নীল হয়ে,
রামধনুর বর্ণচ্ছটা তোমাদের জন্যে তোলা থাক।
চিন্তা, স্বপ্ন, কল্পনায় আমার ভাতের হাঁড়ি বিষ হয়ে গেছে

আর তুমি রংমশালের আলোয় আমার চোখ ধাঁধিও না।
কত ঘাস আনন্দের আতিশয্যে নুয়ে পড়ে আছে।
কতদিন হলো বেদুইন তোমার ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পাই না।
জানিনা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে ভালোবাসা পথের বাঁকে।
ন্যুব্জ হয়ে পয়সা চাইছে প্রতি জনে জনে।

হে রাজকন্যা, তুমি রাজার মেয়ে হাই তুলছো কেন।
ফিরিঙ্গি মেয়ের মত তোমার নরম বুক উঁচু হয়ে থাক।
হিংচে শাকের পৃথিবীটা একবার প্রাণভরে দেখে নাও।
কান পেতে শোন—এখানে দাঁড়কাক প্রতিদিন ডাকে।
মেরিয়া থেরেসা কিম্বা ক্যাথারিন ওদের কথাই তুমি জানো।
তুমি জানোনা ফ্রেডারিক এ যুগের কারখানার কুলী।
নেপোলিয়ন ট্রাক চালায় খুব জোরে—আর আলেকজান্ডার
বিক্রি করে দাঁতের মাজন ট্রেনের প্রতিটি কামরায়।

শান্তনু দাস

শান্তনু যেমন তীব্র রোমান্টিক বেদনায় কবিতা লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন দুঃখকে অস্বীকার করার চাপা কৌতুকময় কবিতা, কখনো তার রচনা বিদ্রূপে শানিত।......শান্তনুর ছন্দের হাত তার চেয়ে বেশী বয়েসী অনেক কবির থেকে দক্ষ। ছন্দ না শিখে ছন্দভাঙার অপপ্রয়াস করেননি। তিন জাতের কবিতায় শান্তনু দাস দক্ষতা দেখিয়েছেন। [দেশ]

পাঁচের দশকে বাংলা কবিতার ঝোঁক ছিল বহিরংগবিলাস আর স্মার্টনেসের দিকে, সামাজিক ব্যাপারে তাদের আগ্রহ ছিল ম্রিয়মান, যোগাযোগের প্রধান সূত্র হয়ে উঠেছিল নারীসংগ লিপ্সা। ঢক্কানিনাদ কানে তালা ধরিয়ে দেবার মতো...এই পটভূমিকায় কবিতা লিখে শান্তনু দাস গত ছ-সাত বছরে যা করেছেন বাংলা কবিতায় তা এক রকম অসাধ্যসাধনই বলতে হয়...[অমৃত]

জন্মসাল, জন্মস্থান, বর্তমান ঠিকানা: ঢাকা, রমনা (মামার বাড়ি)। ৭ই জানুয়ারী ১৯৪২। ৪/১, আফতাব মস্ক্ লেন, আলিপুর, কলকাতা-২৭। **জীবিকা**: কিছুদিন হল একটা সরকারী কাজ পেয়ে গেছি। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা**: ছাপার অক্ষরে প্রথম বেরোয় চেতলা বয়েজ স্কুলের বার্ষিক মুখপত্র 'চৈতালী'তে। বাংলার প্রধান শিক্ষক পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রকে খুব ভালবাসতেন, উনিই ঠিকঠাক করে ছেপে দিয়েছিলেন। কিন্তু এতো পত্রিকা নয়, প্রথম সাধারণ পত্রিকায় যে লেখাটি ছাপা হয়, তার নাম 'স্টেডিয়াম চাই'। অদ্ভুতভাবে এ কবিতাটি লেখা হয়েছিল। তখন আশুতোষ কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি। আগের দিন ময়দানে চ্যারিটি খেলায় পাশের গাছে বাদুড়ের মতো ঝুলে থাকা দর্শকদের মধ্যে হঠাৎ টুপ করে খসে পড়ে যায় একটি ছেলে, মারাত্মক জখম হয়, পরে হয়তো মারাই যায়—খুব বেদনাহত হই। তখনই মনে হয় একটা স্টেডিয়াম আজ কালের মধ্যে তৈরী না করলেই নয়। একটা কবিতা লিখে ফেলি। কবিতাটি কলেজের প্রিয় অধ্যাপক-কবি অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়কে পড়িয়ে শোনালে উনি খুব প্রশংসা করেন। বাড়ি ফেরার সময় হাজরা মোড়ের একটা স্টল থেকে খেলা-বিষয়ক একটা পত্রিকার ঠিকানা সংগ্রহ করে কবিতাটি পোস্ট করি। **প্রকাশ সন**: ১৯৫৮। **কবিতাটি কোন্ পত্রিকায় মুদ্রিত**: খুব সম্ভবত সাপ্তাহিক 'খেলার মাঠ'-এ। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল**: প্রথম পর্যায়ে মহাভারত, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথে। পরে সুধীরলাল চক্রবর্তীর গানগুলো আমাকে ভীষণ তোলপাড় করত। গান আর তার কথা। কিন্তু কবিতা যখন মক্সো করি তখন আমার সামনে মহীরুহের মতো দাঁড়িয়েছিলেন দিনেশ দাস। গোটা 'ভুখ মিছিল' মুখস্ত করে ফেলেছিলাম, তারপর যা লিখি তাই দেখি কপি। এই প্রভাব এড়াবার জন্যে আমাকে দু'বছর কবিতা লেখা বন্ধ করে দিতে হয়েছিল, অথচ ব্যক্তিগত জীবনে ইনি আমার কবিতা লেখার প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। তখন আমার বাড়ি থেকে কিছুদূরে থাকতেন দুর্গাদাস সরকার—বাড়িতে এলে প্রায়ই লুকিয়ে-চুরিয়ে আমি ওঁকে কবিতা দেখাতাম। পিতৃবন্ধু মণীন্দ্র রায়ের কাছে এ ব্যাপারে ঋণী। পরবর্তী সময়ে আমার বিচারে পঞ্চাশের শ্রেষ্ঠ কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতায় তাঁর শব্দচয়ন, জীবনবোধ, স্মার্টনেস, আমাকে অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করে। **প্রিয় বিদেশী কবি**: যে যাই বলুন কীট্সের প্রেমের কবিতার পর আমার ভালো লাগে এলিয়ট, কারণ তরুণ সমাজের হতাশা অন্ধকার যন্ত্রণা বিষাদকে এভাবে খুব কম কবিই প্রতিবিম্বিত করেছেন। তবে যুগ পাল্টায়, বয়সও বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে পাল্টায় মানসিকতা, তখনো নতুন করে কারোকে ভালো লাগে—সে কথা আলোচনা করতে গেলে তালিকা দীর্ঘ হবে। **সাংস্কৃতিক**

অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা: সাহিত্যের আবেদন সার্বজনীন। যে কোন দেশের কবিতাই আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিতে মুখ্য ভূমিকা নিতে পারে, বাংলা কবিতাও হয়তো পারতো। এক্ষেত্রে 'হয়তো' কথাটাকে প্রয়োগ করছি এই কারণে যে একজন বিদেশী কবির কবিতা পড়ে আমরা যদি উদ্বুদ্ধ হই, তবে এখানকার কবিতায় অপর দেশ উদ্বুদ্ধ হবে না কেন? তেমনি কবিতা হলে তো গোটা দেশের ভিত নড়িয়ে দিতে পারে। এই 'কেন' একটি মাত্র উত্তর—আমাদের ভাষা সার্ব-জনীন নয়, সুতরাং বিষয়টাকে সংকীর্ণ গণ্ডীতে টেনে নিয়ে এসে যদি বলি আমাদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবিতার কি রকম ভূমিকা হওয়া উচিত। তাহলে বলবো মুখ্য। সাহিত্য জীবনের দর্পণ, জীবনে যদি পরিবর্তন আসে তাহলে তার আদল সাহিত্যেও অবশ্যম্ভাবি ভাবেই আসবে, আসা উচিত—কবি যখন এই সমাজের সুখদুঃখের একজন শরিক তখন তাঁর অমোঘ নির্দেশ ছন্দের সম্মোহনী যাদু অসাধারণ থেকে সাধারণ মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে পোঁছোতে পারে, ভেঙে-পড়া সমাজের বুকে কবি তুলতে পারেন ইমারৎ, আবার নিরন্ধ্র শ্মশানে মহাতান্ত্রিকের মতো অন্ধকারে শবসাধনায় মগ্ন হতে পারেন। কবিই তো সেই দুর্দম সৈনিক, যিনি দুহাতে রাইফেল-উঁচিয়ে ট্রিগারে আঙুল টিপে তামাম সমাজকে মার্চপাস্ট করাতে পারেন, একমাত্র সৎ কবিই তো পারেন এই বিজ্ঞান, যান্ত্রিকতা, রাজনীতির বুকে সম্রাটের মতো পরোয়ানা জারি করতে, কবিই পারেন সূচীভেদ্য অন্ধকারে যুগের হাতে আলোর বাতিদান ধরিয়ে দিতে। **কবিতায় তার প্রভাব**: কবিতায় তার প্রভাব তো থাকবেই। আমার বিশ্বাস আন্তরিক সৎ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ কবিতায় তার স্পষ্ট প্রতিফলন থাকবে যেমন প্রকৃতির রূপ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঋতুবদলের পালাগান শুনি, মনের ক্যানভাস বিচিত্র রঙে রাঙিয়ে যায়, যেমন করে কল্পনা, অনুভূতি দিয়ে প্রকৃতির রূপৈশ্বর্যকে কবি ছন্দোবন্ধ করেন ঠিক তেমনিভাবেই কবির কল্পনা, জীবনদর্শন যন্ত্রণায় বাঙ্ময় হয়ে বাস্তবের কঠিন অ্যাসফল্টে আছড়ে-পড়া জীবনগুলোর সুখ দুঃখ এবং জীবনসংগ্রামের শরিক হন কাব্যে সোচ্চারিত হয়ে ওঠেন, কারণ কবিও তো এই সমাজেরই একজন তিনিও আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো প্রেম ভালবাসা সুখ দুঃখ অনুভব করেন, দাবীর মিছিলে কণ্ঠ মেলান, পা আদ্যপান্ত জীবনসংগ্রামের তিনি যখন অন্যতম শরিক, তখন কবিতাই হবে হাতিয়ার, রঙিন বাগান থেকে সরে এসে কবি তখন রক্তাক্ত আখরে লিখে যান জীবনের কথকথা।

আজকের আফ্রিকার দিকে তাকিয়ে দেখুন। কবিদের কি চেহারা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আফ্রিকায় নব জীবনের জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যখন তার আত্মমর্যাদা, প্রতিষ্ঠা, সম্মানবোধের নতুন মূল্যায়ন কষ্টিপাথরে যাচাই

করে নিতে শিখলো, যখন জানলো রক্তের রঙ এক হলেও সাদা আর কালো চামড়া ফারাক বিস্তর—এ ব্যবধান মিশে যায় না। তখনই কালো চামড়ার কবি তার মহান চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বলেন—Give me black souls,/let them be black. . . . তখনই রাজনৈতিক, জীবনবোধ প্রতিবাদের ভাষার সঙ্গে কবিকণ্ঠ একাকার হয়ে যায়। তখন একইসঙ্গে মুক্তির বিউগিল বাজে কবিতায় আর সংগ্রামে। দেখতে পাই ভিয়েৎনামে। একহাতে রাইফেল নিয়ে অন্য হাতে কলম ধরেছেন হো চি মিন, নাম কাও। দেখতে পাই পাশাপাশি আরেক বাংলার কবি-বন্ধুরা রক্তক্ষয়ী ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সোচ্চারিত হয়ে উঠেছেন কবিতায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুকুন্দদাস, ডি এল রায়, রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত থেকে পরবর্তী পালাবদলে সাহিত্যের খেলকুদ। এই তো প্রভাব, সংস্কৃতির অগ্রগতিতে কবিতার প্রভাব, যেখানে জীবন, মর্যাদাবোধ, সংগ্রামের সঙ্গে সোচ্চারিত হয় কবিতা। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি**: কালরাত্রি। **কবে কোথায় কবিতাটি রচিত—কোথায় প্রকাশিত**: কোনো এক অনিন্দ্র রাত, সারারাত ঘুম আসছে না জীবনের মূল্যবোধ সম্বন্ধে যখন ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়ছি, তখনই এই কবিতাটি লিখি রাত তিনটেয়, এই ক'লকাতায় বসে। ভোরবেলায় উঠে ছুটে যাই আমার এক প্রিয় কবির কাছে। নামকরণ তাঁরই। কবিতাটি দু সপ্তাহের মধ্যে 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়ে যায়। **বাংলাসাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান**: অনেক সমালোচক এই 'আধুনিক' কথাটার অনেক হরেকরেকম্বা মানে করতে পারেন। করুন, কিন্তু আধুনিক কবিতার স্থান কোথায়, এই ছোট্ট কথাটা একটা বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো পাঠকদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একটু ঠাণ্ডা মাথায় দেখলে একটু ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়। এ রচনাটি যখন একান্তই ব্যক্তিগত, তখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি বাংলাদেশের শতকরা নব্বুইভাগ লেখকের সঙ্গে বিভিন্ন আলোচনা এবং তাঁদের পুরনো পৃষ্ঠা উল্টে দেখেছি, তাঁরা প্রথম জীবনে কেউ কেউ কবিতা-প্রেমিক ছিলেন, কেউ কেউ কবি হিসেবেই জীবন শুরু করে পরে গদ্যে এসেছেন, কেউ কেউ আবার কবিতা লিখতে এসে ব্যর্থ হয়ে কথাশিল্পী হয়েছেন। পরবর্তী জীবনে কিন্তু তাঁরা আলটিমেট কবিতা-প্রেমিক। তাই যখন দেখি আধুনিক সাহিত্যের দোর্দণ্ড দিকপাল সাহিত্যিকেরা পরবর্তী সময়ে আবার কবিতা লেখার চেষ্টা করে নব্য তুর্কী পাঠকদের কাছে নাজেহাল হচ্ছেন, যখন দেখি সম্পাদক কুইনাইন গেলার মতো তাদের কবিতা গিলছেন এবং তাঁরা ধারে না কেটে ক্রমাগত ভারে কাটছেন, তখন অখুশি হইনে এই কারণে, যে তাঁদের অবচেতন মনে নিয়তই কবিসত্তা কাজ করে যাচ্ছে। কখনো কখনো তাদের উপন্যাস গল্পে কোন অংশ আলাদাভাবে কবিতা

হয়ে উঠছে সুতরাং দেখা যাচ্ছে—মহম্মদ পর্বতের কাছে না এলে পর্বতকেই মহম্মদের কাছে যেতে হয়। তাই সম্রাটের মতো কবিতা এখনো শীর্ষদেশে। সে রাজার মতো পরোয়ানা লটকে দিতে পারে। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** ভবিষ্যৎ এখন একমাত্র কবিতার। তামাম সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন,—বাংলাদেশে সিনেমা আর যৌন-পত্রিকার নাগপাশে কথাশিল্পীরা জড়িয়ে পড়ছেন কিছুমাত্রায়। স্বাভাবিক। কারণ এই বাজারে কিছু কাটাতে হলে যৌন-সুড়সুড়ি একটু দিতে হবে, মালমশলাও পাঞ্চ করতে হচ্ছে, একটু কমপ্রোমাইজ করতেই হয়। কিন্তু দেখুন কবিতা—দিনকে দিন কাব্য-পাঠক বাড়ছে, নদী ক্রমশই কল্লোলিনী হয়ে উঠছে। আমার তো মনে হয়, এমন এক দিন আসবে—যখন ক্রমশঃ জাবর-কাটা উপন্যাসগুলো হয়ে আসবে ছোট। ছোট গল্প হয়ে উঠবে কেবলমাত্র জীবন-জিজ্ঞাসা। থিসিসে বিজ্ঞানের ছাত্র জুড়ে দেবেন কবিতার উপমা। নাট্যকার সংলাপে জুড়বেন কবিতার লাইন। তখন উপন্যাস রম্যরচনা ছোটগল্প নাটক থেকে—সিনেমা, তেল, দাদ আর জুতোর বিজ্ঞাপনেও লাগানো হবে কবিতার লাইন।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: দীর্ঘশ্বাস মঞ্চে স্মৃতিময় (১৯৬৮)
সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা: গঙ্গোত্রী (সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ১৯৬৪/৬৫)। সচিত্র শ্রীমতী—কার্যকরী সম্পাদক (৬ বছর)। অপ্সরা—সম্পাদক (১৯৬৯) গঙ্গোত্রী নবপর্যায় (১৯৭০)—সম্পাদক।

কালরাত্রি

কালকে যা ভাল লাগে
লোৌড লর্ড বেহেস্তের রাজা
আজকে সকালে তা দিনের বেশ্যার মতো
বিপর্যস্ত ম্লান মনে হয়ঃ

আসলে কি ভাল লাগে,
আসলে কি ভালবাসা বলে
এতগুলো মাইল-স্টোন ভেঙে এসে বোঝাই গেল না,
যে-কোন বিশ্বাস আজ রামনাথ বিশ্বাসের মতো
ঘুরে ঘুরে কোথায় উধাওঃ

একই সঙ্গে মৃত্যু, প্রেম লম্পটের মতো মুখ ঘষে,
কখন দুজনে শালা বেজম্মা দোসর হয়ে ঘোরে,

চুমু খায়
থুতু লাগে ঠোঁটেঃ
যেন চামড়া খুলে বানিয়ে ঢোলক, আদিম উলঙ্গ নৃত্যে রাজা,
যেন দিন থেকে প্রতিদিন একই বাজনা ঘুরে ফিরে বাজে,
যেন উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।

সাতাশটা মাইল-স্টোন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে দেখি
ধূসর আকাশ মোড়া সন্ন্যাসী রাস্তায় আমি একা,
দু হাতে আমাকে নিংড়ে প্রতিদিন ঠেলে দিচ্ছে
কালরাত্রি
অথর্ব সময়॥

ওপার বাংলা

জসীম উদ্দীন

পল্লীসাহিত্যের কথা উঠলেই যাঁর নাম আগে আসে তিনি কবি জসীমউদ্দিন। লোক-কবি হিসেবে কবির অবদান স্মরণীয়। তিনি যখন প্রথম আমাদের সোজনবাদিয়ার ঘাট, হলদে পাখির ছা, কাজল্যাদীঘির কালো জল আর বউ-টুবাণীর মেঠো পাঁচালী শোনালেন তখন আমরা বাঙলা কবিতার আসরে একজন প্রকৃত নতুন কবির সন্ধান পেয়ে খুশি হলুম, মুগ্ধ হলুম। ওপার বাংলার সংগে সুর মিলিয়ে একথা আমরাও বলি জসীমউদ্দিনের কবিতা সুন্দর কাঁথার মতো ক'রে বোনা।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: তাম্বুলখানা, ফরিদপুর। ১৯০৪। ১লা জানুয়ারী (সম্ভবত)। ১০, কবি জসীমউদ্দীন রোড, ঢাকা-১৪। **জীবিকা:** অবসরভোগী সরকারী অফিসার। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** মনে পড়ছে না।

প্রকাশ সন: এ মুহূর্তে তাও মনে পড়ছে না। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:** 'ইসলাম দর্শনে'। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** হ্যাঁ, নবীন সেনের। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, চণ্ডীদাস এবং অবশেষে রবীন্দ্রনাথ আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। **প্রিয় বিদেশী কবি:** ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী ও কীট্‌স। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা** [X] **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব** [X] **প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:** 'মুসাফির'। সম্ভবত 'ভারতবর্ষ'। ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে। **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান** [X] **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ** [X]

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: ষোলটি। এক পয়সার বাঁশি (১৯৪৮), ধান ক্ষেত (১৯৫৩), নকসীকাঁথার মাঠ (১৯২৯), মাটির কান্না (১৯৫১), রঙিলা নায়ের মাঝি (১৯৪৭), রাখালী (১৯৩০), রূপবতী (১৯৪৬), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৪১), হাসু। ইত্যাদি।

মুসাফির

চলে মুসাফির গাহি,
এ জীবনে তার ব্যথা আছে শুধু ব্যথার দোসর নাহি।
নয়ন ভরিয়া আছে আঁখিজল, কেহ নাই মুছাবার,
হৃদয় ভরিয়া কথার কাকলি, কেহ নাই শুনিবার।
চলে মুসাফির নির্জন পথে, দুপুরের উঁচু বেলা,
মাথার উপরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া করিছে আগুন-খেলা!
দুধারে উধাও বৈশাখ-মাঠ রৌদ্রেরে বুকে চাপি,
ফাটলে ফাটলে চৌচির হয়ে করিতেছে দাপাদাপি।
নাচে উলঙ্গ দমকা বাতাস ধূলার বসন ছিঁড়ে,
ফুঁ দিয়ে ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালায় মাঠের ঢেলারে ঘিরে।

দূর পানে চাহি হাঁকে মুসাফির, আয়, আয়, আয়, আয়,
কম্পন জাগে খর দুপুরের আগুনের হল্‌কায়।
তারি তালে তালে দুলে দুলে উঠে দুধারের স্তব্ধতা,
হেলে নীলাকাশ দিগন্তে বেড়ি বাঁকা বনরেখা-লতা।
চলে মুসাফির দূরে দুরাশার জনহীন পথ পাড়ি,
বুকে করাঘাত হানিয়া সে যেন কি ব্যথা দেখাবে ফাড়ি।
নামে দিগন্তে দুপুরের বেলা, আসে এলোকেশী রাতি,
গলায় তাহার শত তারকার মুণ্ডমালার বাতি।

মেঘের খাঁড়ায় রবিরে বধিয়া নাচে সে ভয়ংকরী,
দূরে পশ্চিমে নিহত দিনের ছিন্নমুণ্ড ধরি।
রুধির লেখায় দিগন্ত ছায় লোল সে বসনা মেলি,
হাসে দিগন্তে মত্ত ডাকিনী করিয়া রক্ত-কেলি।
চলেছে পথিক—চলেছে সে তার ভয়ংকরের পথে,
বেদনা তাহার সাথে সাথে চলে সুরের ইন্দ্ররথে।
ঘরে ঘরে জ্বলে সন্ধ্যার দীপ, মন্দিরে বাজে শাঁখ,
গাঁয়ের ভগ্ন মসজিদে বসি ডাকে দুটো দাঁড়কাক।
কবরে বসিয়া মাথা কুটে কাঁদে কার বিরহিণী মাতা,
চলেছে পথিক আপনার মনে বকিয়া বকিয়া যা-তা।

চলেছে পথিক—চলেছে পথিক—কতদূরে—কতদূর,
আর কতদূরে গেলে পরে সে যে পাবে দেখা বন্ধুর।
কেউ কি তাহার আশাপথ চাহি গণেছে বরষ মাস?
ধুঁয়ার ছলায় কাঁদিয়া কি কেউ ভিজায়েছে বেশবাস?
কেউ কি তাহারে দেখায়েছে দীপ কোনো গেঁয়ো ঘর হতে,
মাথার কেশেতে পাঠায়েছে লেখা গংকিণী নদীসোঁতে?

চলেছে পথিক চলেছে সে তার ললাটের লেখা পড়ি,
সীমালেখাহীন পথ-মায়াবীর অঞ্চলখানি ধরি।
ঘরে ঘরে ওঠে মৃদু কোলাহল, বঁধুরা বধূরে গলে,
বাহুর লতায় বাহুরে বাঁধিয়া প্রণয়-দোলায় দোলে।
বাঁশী বাজে দূরে সুখ-রজনীর মদিরা-সুবাস ঢালি,
দীঘির মুকুরে হেরে মুখ রাত চাঁদের প্রদীপ জ্বালি!
নতুন বধূর বক্ষে জড়ায়ে কচি শিশু বাহু তুলি,
হাসিয়া হাসিয়া ছড়াইছে যেন মণি-মানিকের ধূলি।
চলেছে পথিক—রহিয়া রহিয়া করিছে আর্তনাদ—
ও যেন ধরার সকল সুখের জীবন্ত প্রতিবাদ।
রে পথিক! বল্, কারে তুই চাস, যে তোরে এমন করে,
কাঁদাইল হায়, কেমন করিয়া রহিল সে আজ ঘরে?
কোন ছায়া-পথ নীহারিকা পারে, দেখেছিলি তুই কারে,
কোন সে কথার মানিক পাইয়া বিকাইলি আপনারে।
কার গেহ ছায়ে শুনেছিলি তুই চুড়ির রিণিকি-ঝিনি,
কে তোর ঘাটেতে এসেছিল ঘট বুড়াইতে একাকিনী!

চলে মুসাফির আপনার রাহে কোন দিকে নাহি চায়,
দূরে বনপথে থাকিয়া থাকিয়া রাত-জাগা পাখি গায়।
গগনের পথে চাঁদেরে বেড়িয়া ডাকে পিউ, পিউ কাঁহা,
সে মৌন চাঁদ আজো হাসিতেছে, বলিল না, উহু আহা।
বউ কথা কও—বউ কথা কও—কতকাল—কতকাল,
রে উদাস, বল্ আর কতকাল পাতিবি সুরের জাল!
সে নিঠুর আজো কহিল না কথা, রহস্য-যবনিকা
খুলিয়া আজিও পরাল না কারো ললাটে প্রণয়-টীকা।
চলেছে পথিক চলেছে সে তার দূর দুরাশার পারে,
কোনো পথবাঁকে পিছু ডাকে আজ ফিরাল না কেউ তারে।
চলেছে পথিক চলেছে সে যেন মৃত্যুর মত ধীরে,
যেন জীবন্ত হাহাকার আজি কাঁদিছে তাহারে ঘিরে।
চারিদিক হতে গ্রাসিয়াছে তারে নিদারুণ আন্ধার,
স্তব্ধতা যেন জমাট বেঁধেছে ক্রন্দন শুনি তার।

শামসুর রাহমান
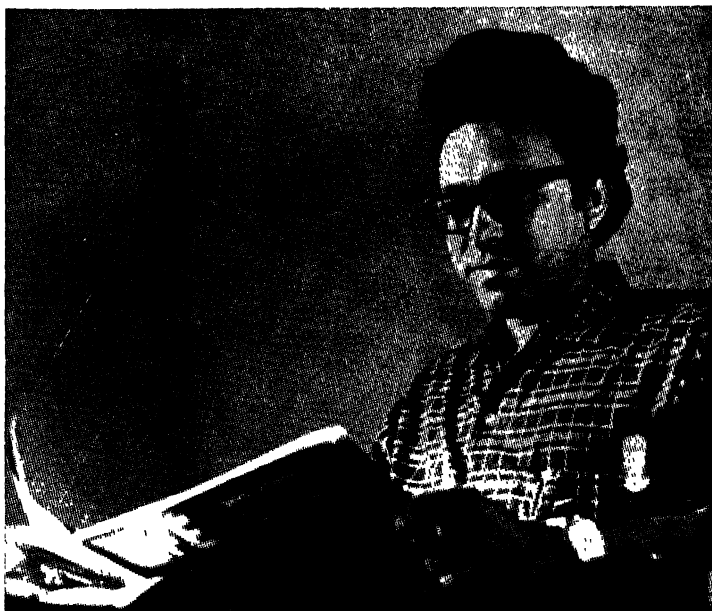
পূর্ববাংলায় বর্তমানে যে ক'জন কবি দেশের বাইরে খ্যাতনামা, শামসুর রাহমান তাঁদের মধ্যে জনপ্রিয় একজন। আন্তর্জাতিক কাব্যচেতনা যন্ত্রণায় পরিশীলিত এই কবির কবিতার মূল উপজীব্য বিষয়—একদিকে আধুনিক মনন চিত্রকল্প, বর্তমান হতাশাবিধৃত সাম্প্রতিক কাল, অপরদিকে দেশের মাটির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ তাঁকে ওপার বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তরুণ কবির মর্যাদা দিয়েছে।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: ঢাকা। ১৯২৯। ৩০, সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা-১। **জীবিকা:** সাংবাদিকতা। ঢাকার একটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** প্রথম প্রকাশিত কবিতার শিরোনাম 'ঊনিশ শো ঊনপঞ্চাশ।' **প্রকাশ সন:** ১৯৪৯ সাল। **কবিতাটি কোন্ পত্রিকায় মুদ্রিত:** অধুনালুপ্ত 'সোনার বাংলা' সাপ্তাহিক পত্রিকায়। **প্রথম**

জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল: প্রথম জীবনে জীবনানন্দ দাশে নিমজ্জিত হয়েছিলাম, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুও প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। **প্রিয় বিদেশী কবি:** এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া মুশকিল। অনেক বিদেশী কবিই আমার প্রিয়। বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, রিল্‌কে, উইলিয়ম বাটলার ইয়েট্‌স, পল এলুয়ার, অডেন প্রমুখের কাব্যপাঠে আমি প্রচুর আনন্দ পাই। তবে ইয়েটস্‌-এর প্রতিই আমার পক্ষপাত সবচেয়ে বেশী। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** যেহেতু সাহিত্য সংস্কৃতির প্রধানতম অংগ হিসেবে চিহ্নিত, তাই সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সংগে কবির ভূমিকা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বর্তমানে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির প্রভাবে সংস্কৃতির অংগনে নানা পরিবর্তন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনকে ধারণ করবে যে-কবির রচনা তাঁকে হতেই হবে জাগর চৈতন্যের অধিকারী। বুঝি তাই লুই ম্যাকনীস বলেন, আধুনিক কবি হবেন, "able-bodied, fond of talking, a reader of newspapers, capable of pity and laughter, informed in economics, appreciative of women, involved in personal relationship, actively interested in politics, susceptible to physical impressions." ম্যাকনীস্‌-বর্ণিত কবির পক্ষেই সম্ভব নিজস্ব অবদানে নব্য সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করা, সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পক্ষে সহায়ক দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও প্রকাশিত:** 'কখনো আমার মাকে'। ১৯৬৬ সালে, ঢাকায়। 'কবিকণ্ঠ' নামক কবিতা-পত্রে। **বাংলাসাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** উপেক্ষা ও তিরস্কার শিরোধার্য ক'রে আধুনিক কবিতা এখন বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক বাংলা কবিতা বিষয়ে আমরা সত্যই গর্ব অনুভব করতে পারি। আমি মনে করি, আধুনিক বাংলা কবিতা পাশ্চাত্যের যে-কোনো দেশের কবিতার সমতুল্য। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, যোগ্য অনুবাদের অভাবে আমাদের কবিতার পরিচয় বহির্বিশ্বে স্পষ্ট নয়। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** কবিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মাঝে-মধ্যে প্রশ্ন ওঠে। কবিতার মৃত্যু অনিবার্য, এমন আশংকাও কোনো কোনো বিদগ্ধজনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। মার্শাল ম্যাকলুহান তো মুদ্রিত শব্দাবলীর প্রতাপ সম্পর্কেই সন্দিহান। ভিস্যুয়াল মিডিয়ার কাছে মুদ্রিত শব্দাবলীর পরাক্রম খর্ব হতে বাধ্য বলে তিনি মনে করেন। জর্জ স্টেইনারও মার্শাল ম্যাকলুহানের পদাংক অনুসরণ করে তাঁর কোনো কোনো প্রবন্ধে ভাষার সংকটের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন অসাধারণ মনস্বিতায়। তিনি তাঁর 'ল্যাঙ্গোয়েজ এ্যান্ড সাইলেন্স' গ্রন্থের ভূমিকায় জানাচ্ছেন যে, ইতিমধ্যেই হ্যান্স ম্যাগনাস এনজেন্সবার্গার, মার্টিন ওয়ালসার এবং পিটার

হ্যামের মতো বিশিষ্ট জর্মন সাহিত্যিক কবিতা, নাটক ইত্যাদি লেখা বন্ধ করার কথা ঘোষণা করেছেন। বিজ্ঞান ও টেকনোলজির প্রসারকে কেউ কেউ কবিতার পরিপন্থী বলে মনে করেন। সার্বভৌম বিজ্ঞানের দাপটে কবিতার প্রয়োজন ফুরোবে, এ-কথা স্বীকার করি না। বিজ্ঞান ও কবিতা ভিন্ন ভিন্ন পথে কাজ করে। শারীর শাস্ত্রীদের কাছে অশ্রুকণা শুধুমাত্র গ্রন্থিরস, কিন্তু কবির কাছে শোকাতুর মায়ের অশ্রুমালা গ্রন্থিরস নয়, একটি বেদনার্ত হৃদয়ের কান্না। বস্তুত কবিতা মানুষের মানবত্ব সংরক্ষণে অনলস। এই বিরূপ বিশ্বে কবিতার প্রয়োজন তাই এত বেশী। আমি নির্দ্বিধায় বলবো, কবিতাই মানুষের রক্ষাকবচ। আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি আশাবাদী, দেশ-বিদেশে আধুনিক কবিতা ইতিমধ্যে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে। পাঠকগোষ্ঠী আধুনিক কবিতার প্রতি আগের মতো অতটা বিমুখ নন আর। সংরক্ষণ ও আবিষ্কারের দ্বৈত পথে আধুনিক কবিতা সমৃদ্ধতর হ'তে থাকবে ব'লে আমার বিশ্বাস। কিন্তু এই যাত্রা যদি ছক-বাঁধা পথে অব্যাহত থাকে, তবে আধুনিক কবিতা তার সম্ভাবনাকেই ক্ষুণ্ণ করবে। মনে রাখতে হবে, যে-কোনো ছকই কাব্যের অগ্রগতির জাতশত্রু।

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ও প্রকাশ সন: প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৬০), রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩), বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৬), নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৬৮), নিজ বাসভূমে (১৯৭০)।
সম্পাদিত পত্র: কবিকণ্ঠ।

কখনো আমার মাকে

কখনো আমার মাকে কোনো গান গাইতে শুনিনি।
সেই কবে শিশু রাতে ঘুম পাড়ানিয়া গান গেয়ে
আমাকে কখনো ঘুম পাড়াতেন কিনা আজ মনেই পড়ে না।

যখন শরীরে তাঁর বসন্তের সম্ভার আসেনি,
যখন ছিলেন তিনি ঝড়ে আম-কুড়িয়ে-বেড়ানো
বয়সের কাছাকাছি হয়তো তখনো কোনো গান
লতিয়ে ওঠেনি কণ্ঠে মীড়ে মীড়ে দুপুরে সন্ধ্যায়,
পাছে গুরুজনদের কানে যায়। এবং স্বামীর

সংসারে এসেও মা আমার সারাক্ষণ
ছিলেন নিশ্চুপ বড়ো, বড়ো বেশী নেপথ্যচারিণী। যতদূর,

জানা আছে, টপ্‌পা কি খেয়াল তাঁকে করেনি দখল
কোনোদিন। মাছ কোটা কিংবা হলুদ বাটার ফাঁকে
অথবা বিকেলবেলা নিকিয়ে উঠোন,
ধুয়ে মুছে বাসন-কোসন,
সেলাইয়ের কলে ঝুঁকে, আলনায় ঝুলিয়ে কাপড়,
ছেঁড়া শার্টে রিফু কর্মে মেতে
আমাকে খেলার মাঠে পাঠিয়ে আদরে
অবসরে চুল বাঁধবার ছলে কোনো গান গেয়েছেন কিনা
এতকাল কাছাকাছি আছি তবু জানতে পারিনি।

যেন তিনি সব গান দুখজাগানিয়া কোনো কাঠের সিন্দুকে
রেখেছেন বন্ধ ক'রে, আজীবন, এখন তাদের
গ্রন্থিল শরীর থেকে কালেভদ্রে সুখ নয়, শুধু
ন্যাপথলিনের তীব্র ঘ্রাণ ভেসে আসে।

কায়সুল হক

'যেহেতু মানুষকে ভালবাসি, ভালবাসি এই পৃথিবী, আর ভালবাসি নিজেকে।' এই বিশ্বাস-বোধের উপর কায়সুল হক কবিতা লিখতে সুরু করেছেন। সমস্ত মানুষের সুখ-দুঃখ থেকে নিজের সুখ-দুঃখকে আলাদা করে নয় একসঙ্গে বেদনার কথা সহজাত জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন এবং এই চেতনার মধ্য দিয়েই মানুষ মানুষের হৃদয়ের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ে। যেখানে অনুভব ধ্বনি হয়ে ওঠে সেখানেই কায়সুল হকের কবিতা।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় ২৯শে মার্চ, ১৯৩৩। সাহিত্য ভবন, রংপুর, পূর্ব বাংলা। **জীবিকা:** লেখা ও সাহিত্য-পত্র-সম্পাদনা। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা:** 'আজ'। **প্রকাশ সন:** ১৯৫০। **কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত:** দৈনিক আজাদ-এর বিশেষ সংখ্যায়। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** শ্রীবুদ্ধদেব বসুর কবিতা; জীবনানন্দ দাশের কবিতা। **প্রিয় বিদেশী কবি:** টি. এস. এলিয়ট। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** যেহেতু, কবিতা হৃদয় ও মননের যুগ্ম শিল্পধ্যান; অর্থাৎ 'বুদ্ধির

সঙ্গে বোধির সমন্বয় সাধন'ই কবিতার কাজ। আর তাই কবিতাকে আমি মানব-মনের শ্রেষ্ঠ ফসল হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই। কবিতা পাঠকের মূল্যচেতনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং 'সংস্কৃতি' যদি হয় মানবমনের উৎকর্ষতার পরিচায়ক তাহলে কবির ভূমিকা সেখানে মুখ্য। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব:** কবির ভূমিকা যেক্ষেত্রে স্বীকৃত। সেক্ষেত্রে তার রচনায় তার প্রভাবও অবশ্যই পড়বে। সাংস্কৃতিক অগ্রগতির বিভিন্ন উপকরণ তাই স্বাভাবিকভাবেই কবিতায় এসেছে। আধুনিক বাংলা কবিতায় সচেতন মনের প্রকাশ ঘটেছে বলেই কবিতা অধিকতর প্রাণবান হয়েছে। **স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:** 'কাহিনীর কুহকে আমি' ১৯৫৪-এর কোনো একসময়ে রচিত। রংপুরে **বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** আধুনিক কবিতা বাংলা সাহিত্যকে পৃথিবীর আর আর ভাষার বিশেষ করে য়ুরোপীয় সাহিত্যের সমমর্যাদা পেতে সহায়ক হয়েছে সর্বাধিক। বিদেশে বাঙালীর গর্ব করার মতন যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা আধুনিক বাংলা কবিতা। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে তার স্থান যে বিশিষ্টতাপূর্ণ সে সম্পর্কে কোনো তর্কের অবকাশ নেই বলেই মনে করি। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** ভাষার গভীর চর্চা ছাড়া, প্রতিপদে ভাষার পুন-র্নির্মাণ ছাড়া কাব্য অসম্ভব। তার জন্যে ভাষার নির্ধারিত সীমা, ব্যাকরণের নিয়ম, বাক্যের কানুন বারবার ভাঙতে হয়। কবিদের পক্ষে এই-ই তো মুক্তির পথে দীর্ঘ উত্তরণ।" ফরাসী কবি লুই আরাগঁ-র উক্তি অনুযায়ী বাঙালী আধুনিক কবিরা নিষ্ঠাবান কবি। তাদের প্রচেষ্টায় ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলা কবিতা। তাই আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি আশাবাদী।

সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশ কাল: 'সবার পত্রিকা' (অধুনালুপ্ত) পাক্ষিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্র ঢাকা থেকে মুদ্রিত, প্রকাশিত। ফাল্গুন—১৩৬৪ বঙ্গাব্দ। 'কালান্তর' দ্বিমাসিক সাহিত্যপত্র। রংপুর শহর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ থেকে। সম্পাদিত সংকলন ও প্রকাশ সন: 'অধুনা'—দুই বাংলার প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্পের সংকলন ১৩৬২ বঙ্গাব্দে রংপুর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কাহিনীর কুহকে আমি

কাহিনীটা শেষ করে তারা উঠে গেল।

স্বরাট আকাশ আলো ক'রে গোল চাঁদ
শহরের ঘেঁষাঘেঁষি
সমস্ত বাড়ির মাথা ডিঙিয়ে কখন
উপরে এসেছে উঠে।

টবে রাখা রজনীগন্ধার ঝাড়ে
আলোর সাঁতার দেখে
একরত্তি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দৃষ্টিটা
চালান করে দিলাম উন্মুক্ত উপরের দিকে।

ছাতা-পড়া পুরোনো কথারা
ভিড় ক'রে আসে স্মৃতির সেতুবন্ধ হ'য়ে:
আচমকা শুনি তার অতি চেনা স্বর
মধ্যরাতে এই জ্যোৎস্নার ভেতর!
আর এই আলোর রহস্যে আমিও
যেন অন্য আর এক লোক হ'য়ে যাই!
(বন্ধুদের শেষ করা কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ কঠিন হলো।)
স্মৃতির নানা অলিগলি এবং বন্ধুরতা উজিয়ে
আমি আর এক কাহিনীর মধ্যে চলে গেলাম।

সেই কিশোরকালের চৌকাঠ পেরিয়ে
প্রথম যেদিন ফাল্গুনের আরক্ত প্রহরে
রক্তগোলাপ হাতে যে যুবতী
আমার ভয়-ভয় ভালোবাসাকে
মুঞ্জরিত করেছিলো
তার নিবিড় সান্নিধ্যে!
জ্যোৎস্নার বকযন্ত্রে পরিশ্রুত এই চরাচরে
আর মধ্যরাতের সুপ্তির মগ্নতায়
দেখি তার কথা
আজ আমার স্নায়ুর শিকড়ে শিকড়ে
হয়ে গেছে কাহিনীর আশ্চর্য কুহক॥

আল মাহমুদ

পূর্ববাংলার যে কজন তরুণতর কবি ইতিমধ্যেই দু দেশে পরিচিতি লাভ করেছে আল আহমুদ তাঁদের একজন। গ্রামবাংলার প্রকৃতিপ্রেম তাঁর কাছে অনিবার্যভাবে ধরা দিয়েছে। তীব্র বেদনায় তিনি কখনো সোচ্চার কখনো বা দেশ ও সমাজের বিবর্তন তাঁর কবিতার অংগাংগীভাবে জড়িয়ে আছে। ছন্দে দখল, বক্তব্যে, গঠনরীতিতে সাবলীলতা তাঁর কবিতার প্রাণ। ব্যক্তিগত আনন্দ বেদনা থেকে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীকে আল মাহমুদ প্রতীকের ব্যঞ্জনায় ভূষিত করেছেন।

জন্মস্থান, জন্মসাল, বর্তমান ঠিকানা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা। ১৯৩৬। ২, বসু-বাজার লেন, ঢাকা-১। **জীবিকা**: সাংবাদিকতা (সাব-এডিটর: দৈনিক ইত্তেফাক)। **প্রথম প্রকাশিত কবিতা**: রচনাটির নাম এখন স্মরণ করতে পারছি না। অধুনা-লুপ্ত 'সত্যযুগ' পত্রিকার ছোটদের মজলিশে ছাপা হয়েছিল। ছেপেছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ (বেতালভট্ট)। **প্রকাশ সন**: তাও মনে নেই। **কবিতাটি কোন্**

পত্রিকায় মুদ্রিত: 'সত্যযুগ'। **প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল:** হ্যাঁ, জীবনানন্দ দাশের। **প্রিয় বিদেশী কবি:** ফেদেরিকো গার্থিয়া লোর্কা। আর একজনের উচ্চারণ করতে বললে রাইনের মারিয়া রিল্‌কের নাম বলতাম। **সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা:** পুরোহিতের। **কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব** [X] **প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায়, রচিত ও কোথায় প্রকাশিত:** 'পালক ভাঙার প্রতিবাদে'। ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রাম শহরের গুর্খা ডাঃ লেনে অবস্থিত ইকবাল ম্যানসনের ত্রিতলের একটি কামরায় বসে লিখেছিলাম। প্রথম ছাপা হয়েছিল মাসিক 'সমকালে'। **বাংলাসাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান:** এই প্রশ্নটির জবাব দিতে চাই না। **আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ:** আধুনিক কবিতা সমস্ত শিল্পেরই সমালোচক হয়ে উঠবে। পরিণামে অন্যান্য শিল্পীরা হবেন কবির অনুকারক। কে জানে ধর্ম উঠে গিয়ে কবিতাই তার স্থান দখল করে কিনা!

মোট প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: 'লোক লোকান্তর' ও 'কালের কলস'।
সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা: কিছুকাল সাপ্তাহিক 'কাফেলা' সম্পাদনা করেছিলাম।

পালক ভাঙার প্রতিবাদ

আমি যেন সেই পাখি, স্বজন পীড়নে যারা
কালো পতাকার মতো হাহাকার করে ওঠে, কা-কা
আর্তনাদে ভরে দেয় ঘরবাড়ী; পালক ভাঙার
উপায়বিহীন প্রতিবাদে
আকাশ কাঁপিয়ে কাঁদে।
ছত্রখান হয়ে উড়ে উড়ে
ঘুরে ঘুরে প্যাখসাটে
পিষ্টপ্রায় সঙ্গীর দশায়।

এমন রোদন ধ্বনি কেন আজ বেজে ওঠে?
এইতো সেদিনও
বোস্তামীর পুকুরের ঘোলাময়লা জলের কাছিম
হওয়ার সাধনা ছিল। দীর্ঘ লোল আয়ুর আশায়
লুফে নিতো নিক্ষিপ্ত খাদ্য। টকটকে লাল
মাংসের মণ্ডের মত লোভ এসে ছিটকে পড়তো
থকথকে সিঁড়িতে সারাদিন।

আজ যেন ভেঙে গেলো যাদুর খোলস, খুলে গেলো যেন
আমার কঠিন প্রাণ। রহস্যের ময়লা কালো জলে
অজস্র সফেদ ফিটকিরি ইতস্ততঃ ছুড়ে দিয়ে কেউ
সহসা ধরিয়ে দিলো কম্পমান পানির পাতালে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে যাওয়া নির্বোধের মুখচ্ছবিখানি।

এমুখ আমার নয়, এমুখ আমার নয়, বলে—
যতবার কেঁপে উঠি, দেখি,
আমার স্বজন হয়ে আমার স্বদেশ এসে
দাঁড়িয়েছে পাশে। নির্ভয়ে, আশ্বাসে
জিয়ল মাছের ভরা বিশাল ভাণ্ডের মত নড়ে উঠে বুক।

ব্যাকুল মুখের সারি ক্ষমার সুরভি নিয়ে আজ
হঠাৎ ফোটালো এক রক্তবর্ণ শতমুখী ফুল।
কাতারে কে ডাকে নাম ধরে?
আদেশের গম্ভীর নিনাদে
আমার নামের ধ্বনি আমারই শরীর ঘিরে ঘিরে
ঝিঁঝিঁর শব্দের মত ঢুকে গেলো গ্রামের ভিতর।

মনে হলো, ডাক দিলে জড়ো হয়ে যাবে সব নদীর মানুষ
অসংখ্য নাওয়ের বাদাম মুহূর্তে গুটিয়ে ফেলে রেখে
জমা হয়ে যাবে এই চরের ওপর।
খেতের আড়াল থেকে কালো
মানুষের ধারা এসে বলে দেবে সরোষে আমাকে
কীভাবে এগোবে তারা নগরের প্রথম তোরণে।